তাপসীর সমালোচনা

"আলো ও ছায়া" রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় বি, এ, লিখিয়াছেন—"আপনি তাপসী লিখিয়া একটি মহা উপকার সাধন করিয়াছেন। * * যে কয়েকটি তাপসীর পুণ্যকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন উপন্যাস-বর্ণিত অনেক চরিত্র হইতে বৈচিত্র্যে কোন অংশে ন্যূন নহে। আপনার ভাষা সরল এবং সুখপাঠ্য।"

সঞ্জীবনী—"তাপসী পাঠ করিলে হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়। * * এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া নরনারী উন্নত জীবন লাভের জন্য ব্যাকুল হউন।" ৬ই বৈশাখ, ১৩২৪।

ভারতবর্ষ—"তাপসী. ইহাতে দশটি ধর্ম্মশীলা নারীর জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। * * জীবনচরিত লিখিতে হইলে লেখকের যে প্রকার ভক্তিমান হওয়া কর্ত্তব্য, অমৃত বাবুতে তাহার অভাব নাই; সুতরাং এই গ্রন্থখানি যে অতি সুন্দর হইয়াছে, তাহা না বলিলেও চলে। * * যে কয়েকটি দেবীচরিত্র তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের মহিলাবৃন্দের অনুকরণ যোগ্য। এই গ্রন্থখানি বালিকাবিদ্যালয়ের অবশ্য পাঠ্য হওয়া কর্ত্তব্য।" জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪।

প্রবাসী—"* * এই বইখানি সকল সম্প্রদায়ের লোকের, বিশেষতঃ মহিলাদের পাঠের যোগ্য। ইহাতে তাঁহারা আধ্যাত্মিকসাধনের অনেক উপদেশ, নিদর্শন ও সাহায্য পাইবেন।" শ্রাবণ, ১৩২৩।

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ—"তাপসী পড়িয়া বিশেষ উপকৃত হইয়াছি। আপনি এই শ্রেণীর বই লিখিয়া সমাজের ও দেশের বিশেষ হিতসাধন করিতেছেন।"

BENGALI.—"* * They are not mere record of the lives of these saints but they also present an account of their philosophy, religious beliefs and practices. The book is thus at once interesting and instructive. The representative selection of the subjects of these biographical studies is judicious and shows the liberal spirit and non-sectarian outlook of the author. We have much pleasure in recommending this book to the notice of our readers as we sincerely believe that it is well worth a perusal. The book is illustrated and contains portraits of some of the subjects of the biographical studies.

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের তাপসীগ্রন্থে স্বদেশের ও বিদেশের দশটি ধর্ম্মশীলা নারীর জীবনচরিত মুদ্রিত হইয়াছিল ; এই সংস্করণে ষোলটি জীবন-চরিত মুদ্রিত হইল। ইহার মধ্যে কয়েকটি প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলার জীবন অতিশয় উন্নত, তাঁহারা যথার্থই যেন দেবী। তাঁহাদের জীবন-চরিত পাঠ করিলে উত্তমরূপেই অনুভব করা যায় যে, পৃথিবীতে ধর্ম্মই দুর্ল্লভ সামগ্রী, ঈশ্বরের জন্যই মানবের জন্ম, তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিতে পারিলেই এ জীবন সার্থক ; তাঁহার করুণায় একটুকু প্রেম লাভ করিতে পারিলেই হৃদয় মধুময় হয় এবং সেই প্রভুর সেবক হইয়া লোকের সেবা করিতে সমর্থ হইলেই, বিমল আনন্দে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠে। আমার আশা আছে, হয় ত এই তপস্বিনীদিগের জীবন-চরিতের দ্বারা পুরুষ ও নারী সকলেরই কিঞ্চিৎ উপকার হইবে। তবে কোন যশস্বী সুলেখক যদি এই সকল বরণীয়া নারীর জীবনের অপূর্ব্ব কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহা হইলেই গ্রন্থখানি উপাদেয় হইত এবং পাঠকেরাও পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

এই গ্রন্থ রচনা করিবার সময়ে অনেক বন্ধুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সেন এম, এ, শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ দাস বি, এ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদয়াল রায় বি, এ, শ্রীযুক্ত শিবেশচন্দ্র বসু বি, এ, পরলোকগত সুজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এম, এস, সি, শ্রীমতী শরৎবালা সেন প্রভৃতি কয়েকখানি ইংরাজী গ্রন্থের নানা স্থান হইতে অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই আমি বহিখানি রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছি।

বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন এম, এ, মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়াই মীরাবাইয়ের জীবনচরিত কিয়দংশ রচনা করিয়াছি। আমার স্নেহের পাত্র পরলোকগত অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী বি, এ, এই পুস্তকের নাম "তাপসী" রাখিয়াছিলেন।

"অশোক চরিত", "তাপসমালা", "রাজতপস্বিনী" "অঘোর-প্রকাশ" "ম্যাডাম গেয়োঁ", "এলিজাবেথ", "সেণ্ট ক্যাথেরিণ," "সেণ্ট টেরেসা," সেণ্ট ক্যাথেরিণের চিঠিপত্র, রেভারেণ্ড এলবান বাটলার প্রণীত সেণ্টদিগের জীবনচরিত, কুমারী কবের আত্মচরিত প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচনা করিয়াছি। এজন্য ঐ সকল গ্রন্থের লেখকদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১১ই জুলাই, ১৯২৬
২১০।৬ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রী অমৃতলাল গুপ্ত

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়

শ্রীচরণকমলেষু

আপনি পিতার মত নির্ম্মল মধুর
কত দিয়াছেন স্নেহ! অজ্ঞানতা দূর
কতই ত করেছেন জ্ঞানশিক্ষা দিয়ে।
আপনিই আপনার আশ্রমেতে নিয়ে,
ভেবেছেন সুখ দুঃখ কত কথা মোর।
জীবনের পথে শুধু সংগ্রাম কঠোর;
তবু আপনার স্নেহ-আশীর্ব্বাদ পেয়ে,
চলেছি লক্ষ্যের দিকে উৎসাহেতে ধেয়ে।
হয় ত মিটিবে আশা; অতৃপ্ত এ প্রাণ
একদিন অমৃতের পাইবে সন্ধান।
আজি শুধু ভাবিতেছি আপনার ঋণ
কিরূপে করিব পরিশোধ? আমি দীন
ক্ষুদ্র আমি হায়! বড় সঙ্কুচিত হয়ে
যোলটি কুসুম ভরা ডালাখানি লয়ে
দাঁড়ানু পায়ের কাছে। তুচ্ছ উপহার
তুলিয়া কি লইবেন করে আপনার?

১লা বৈশাখ, ১৩২৩
কলিকাতা

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী
শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত

সূচী



তপস্বিনী এলিজাবেথ

তাপসী

—:)*(:—

মীরাবাই

১

মীরাবাইয়ের নাম কে না শুনিয়াছে? তিনি এ দেশের বরণীয়া নারী। এ দেশে ভক্তিমতী রমণীর নাম করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে মীরাবাইয়ের নামই উচ্চারিত হইয়া থাকে। আমরা বাল্যকাল হইতেই তাঁহার ভক্তির কাহিনী শুনিয়া আসিতেছি। বৈষ্ণবেরা মীরাবাইয়ের প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিয়া ভক্তিরসে আপ্লুত হন, শিখেরা তাঁহার রসপূর্ণ গাথা ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যে সযত্নে রক্ষা করিয়া থাকেন। এ দেশের শত শত ভক্তের হৃদয়ের ভক্তি মীরাবাইয়ের উদ্দেশে অর্পিত হইয়া থাকে।

এই ভক্তিপরায়ণা নারীর জীবনের ঘটনা স্মরণ করিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। মীরাবাই রাজকন্যা এবং রাজার গৃহেরই বধূ ছিলেন। তাঁহার স্বামী তাঁহাকে রত্নমণিভূষণে সুশোভিতা করিয়া রাজপুরীর সুরম্য

হর্ম্যতলে ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেই রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই পুণ্যশীলা নারী পার্থিব ধনরত্ন তুচ্ছ মনে করিয়া সুদুর্লভ ভক্তি লাভ করিবার জন্য, ভক্তবৎসলের চরণে নারীজীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রেমে মধুময় হইয়া গেল, অন্তর হইতে গীতধ্বনি উত্থিত হইল; তিনি আপনার নারীজন্ম সার্থক মনে করিলেন।

মীরাবাই ১৫৫৫ হইতে ১৫৬০ সংবতের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রত্তন সিংহ, রাঠোরবংশে তাঁহার জন্ম; তিনি মেরতাদেশে রাজত্ব করিতেন। মীরা তাঁহার অতিশয় আদরের কন্যা ছিলেন। মীরার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ লাবণ্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মীরার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে সৌন্দর্য্যের প্রতিমা বলিয়া মনে হইত। বালিকা মীরা স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন সেই ধর্ম্মভাব বিকশিত হইতে লাগিল; বালিকার সুপবিত্র হৃদয় ভক্তির জন্য তৃষিত হইয়া উঠিল। মীরার পিতা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার কন্যা একটি উজ্জ্বল রত্ন; তাঁহার মুখে স্বর্গের মাধুরী, ললাটে আধ্যাত্মিক জ্যোতি, অন্তরে ধর্ম্মস্পৃহা, প্রকৃতির মধ্যে কবিত্ব, কণ্ঠে সুস্বর;—অল্প বয়সেই তাঁহার ভিতর নানা শক্তির বিকাশ লক্ষিত হইল। এই রত্নটিকে যত্ন করিলে ইহার সৌন্দর্য্যে রাজপুরী যে আলোকিত হইবে, সে বিষয়ে পিতার আর কোন সংশয় রহিল না। তাই তিনি কন্যাকে সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃতা করিবার জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন।

মীরাবাই পিতৃগৃহে বাস করিয়া উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করিলেন। তাঁহার কবিত্বশক্তির বিকাশ হইল, তিনি সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। মীরা স্বয়ং সঙ্গীত রচনা করিয়া মধুরকণ্ঠে গান করিতেন। তাঁহার ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত নরনারীর অন্তরে ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দিত।

এই সময়ে মোহিনী প্রতিমা মীরাবাইকে রাণা ভোজরাজ * দর্শন করিলেন। মীরার রূপমাধুরী নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মন মুগ্ধ হইয়া গেল। রাণা মীরার সঙ্গীত শুনিবার ইচ্ছা করায়, মীরা সুমধুর কণ্ঠে গান করিতে লাগিলেন। রাণার প্রাণ সেই সঙ্গীতের স্রোতে মিশিয়া আকাশে ভাসিয়া ভাসিয়া যেন কোন্ স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মীরার পিতৃরাজ্য হইতে স্বরাজ্যে চলিয়া যাইবার সময়ে প্রীতির চিহ্নস্বরূপ আপনার হস্তের অঙ্গুরীটি খুলিয়া মীরাকে অর্পণ করিলেন। কিছুদিন পরে মীরার সঙ্গেই রাণা ভোজের পরিণয়ের প্রস্তাব উপস্থিত হইল। মীরার পিতা রাণাকেই সুপাত্র মনে করিয়া তাঁহার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশেষে রাণার সঙ্গে মীরার পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল।

রাণা ভোজ চিতোরের রাজপুত্র। তিনি সাহসী, বীর এবং সাহিত্যানুরাগী মানুষ ছিলেন। তাঁহার কাছে উৎসাহ পাইয়া মীরাবাই সুমধুর সঙ্গীত রচনা করিতেন। এই রাজকুমারের অন্তরে ধর্ম্মভাব ও ভক্তি ছিল কি না ঠিক্ বলিতে পারি না; কিন্তু তিনি মীরাবাইয়ের ভক্তি-পরিপ্লুত হৃদয়ের প্রেম লাভ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। সেই জন্য রাণা শক্তির উপাসক হইয়াও মীরার বৈষ্ণবধর্ম্মের বিরোধী হন নাই; বরঞ্চ তিনি মীরার আরাধ্য দেবতা রণ্ছোড়দেবের জন্য অন্তঃপুরে একটি সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

মীরাবাই রণ্ছোড়দেবের অর্চ্চনাতেই অনেক সময় অতিবাহিত করিতেন। তাহা ছাড়া তিনি ভক্তিসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভাবোচ্ছাসে

---

* মীরাবাইয়ের স্বামী ইতিহাসে অনেক স্থানে কুম্ভরাণা বলিয়া পরিচিত হইলেও ভক্তসম্প্রদায় তাঁহাকে রাণা ভোজরাজ বলিয়া অভিহিত করেন। মীরা ও তাঁহার ভক্তদের সঙ্গীতে তিনি ভোজরাজ নামেই অভিহিত। অতএব আমরা ভোজরাজ নামেই তাঁহার উল্লেখ করিব।

আত্মহারা হইয়া যাইতেন। মীরার এই ভক্তি-রসাত্মক সঙ্গীতের জন্য রাজান্তঃপুরে বিস্তর বৈষ্ণবের সমাগম হইত। মীরা তাঁহাদের সঙ্গে ভক্তিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও মীরার স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় প্রেম ছিল। তিনি তাঁহার হৃদয়ের অমৃত রস স্বামীর প্রাণে ঢালিয়া দিতেন। রাণার হৃদয় মধুময় হইয়া যাইত। রাণা প্রথম জীবনে পত্নীর প্রেম পাইয়া এবং তাঁহার সহিত কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যথার্থই পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন।

২

মীরাবাইয়ের প্রাণ দিনের পরে দিন শ্রীহরির প্রেমের জন্য উতলা হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি ভক্তির একটি অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিবার নিমিত্ত সাধন করিতে লাগিলেন। মীরার সাধনের প্রধান অবলম্বনই তাঁহার স্বরচিত ভক্তিরসমধুর সঙ্গীত। তিনি কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলিয়া যখন সেই গানগুলি গাহিতেন তখন তাঁহার আত্মা সঙ্গীতের সঙ্গে মিশিয়া যেন কোন্ রহস্যলোকে গমন করিত, সেখানে তাঁহার চিরবাঞ্ছিত প্রেমের দেবতার আভাস পাইয়া, হৃদয় প্রেমে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিত। ঐ সময়ে মীরাবাই আপনার সঙ্গীতে আপনিই পাগলিনী হইতেন। বৈষ্ণব গ্রন্থকার লিখিয়াছেন মীরার প্রেমসঙ্গীত শুনিয়া প্রেমের দেবতা স্বয়ং ভগবানেরই চিত্ত বিগলিত হইয়া যাইত।—

"গানশক্তি অসম্ভব অমৃতনিন্দিত।
যাতে দ্রবীভূত হৈল শ্রীকৃষ্ণের চিত॥" *

* ভক্তমাল।

মীরাবাইয়ের রচিত এই সঙ্গীতগুলি পাঠ করিলে তাঁহার ধর্ম্মসাধনের অনেক নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এ সংসারে যাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের রহস্যময় পথে যাত্রা করিতে চাহেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সম্মুখে সুখের সহস্র প্রলোভন মোহিনী মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়ায় এবং হৃদয়ের উপর মায়াকুহক বিস্তার করিতে চায়; পাপ ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অন্তরের পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। ভক্তিমতী ও শক্তিশালিনী মীরাবাই মনে স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকেও সাধনের প্রথমাবস্থায় আপনার হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। সংসারের প্রলোভন তাঁহারও মনে ধাঁধা লাগাইয়া অন্তরের বৈরাগ্য ও ধর্ম্মভাব হরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তিনিও পাপের মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আকুল হইয়া উঠিয়াছেন। মীরবাই এই সংগ্রামের অবস্থায় যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন, তাহার একটী সঙ্গীত এই :—

"মীরা কী প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝুঁঠে ধন্ধোছে মেরা ফন্দা ছুড়াও॥
লুটেহি লেতেহৈঁ বিবেক কা ডেরা,
বুধি বল যদপি করূঁ বহুতেরা।
হায় রাম নঁহি কছু বস মেরা,
মরতীহুঁ বিবশ প্রভু ধাও ধাও ধাও।
মীরা কী প্রভু সাঁচী দাসী বনাও॥
ধর্ম্মোপদেশ নিত নিত শুনতীহুঁ
মন কুচাল সে ভি ডরতীহুঁ,
সদা সাধুসেবা করতীহুঁ,
সুমিরণ ধ্যানমে চিত ধরতীহুঁ

মুক্তিমার্গ দাসী কো দেখাও।
মীরাকী প্রভু সাঁচী দাসী বনাও॥"

অর্থ—প্রভু, মীরাকে তোমার সত্য দাসী কর। মিথ্যা ধাঁধা হইতে আমার বাঁধন খুলিয়া দাও। তাহারা আমার বিবেকের ঘর লুটিয়া লইতেছে। হায় রাম, আমি ত কিছুই করিতে পারিতেছি না। আমার কিছুই শক্তি নাই। আমি শক্তিহীনা হইয়া মরিয়া যাইতেছি। হে প্রভু, তুমি এস, তুমি এস। ধর্ম্মের উপদেশ নিত্য নিত্য শ্রবণ করি। আমি পাপকে ভয় করিয়া মনকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছি। আমি সর্ব্বদা সাধুর সেবা করি। আমি হরির স্মরণে ধ্যানে চিত্তকে নিযুক্ত রাখি। তুমি তোমার দাসীকে মুক্তির পথ দেখাও।

এই সঙ্গীতের পদগুলি আবৃত্তি করিতে করিতে মীরাবাইয়ের প্রথম জীবনের একখানি ছবি চোখের সম্মুখে যেন জীবন্ত হইয়া উঠে। মীরবাই এখনো তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া ভক্তির উচ্চতম অবস্থায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই; তিনি তাঁহার দাসী হইবার জন্য এবং মুক্তির পথ পাইবার নিমিত্ত ব্যাকুল প্রাণে প্রার্থনা করিতেছেন। এই সময়ে তাঁহার অন্তরে কি সংগ্রাম! মায়া, মোহ তাঁহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে, মীরা কিছুতেই তাহাদের কুহকজাল ছিন্ন করিতে পারিতেছেন না। তিনি হৃদয়ের উপর আপনার বুদ্ধি বল প্রয়োগ করিতেছেন; কিন্তু হায়, কিছুতেই ত কিছু হইতেছে না। মীরা এখন আপনাকে দুর্ব্বলা নারী মনে করিয়া কাতরপ্রাণে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছেন এবং "হে প্রভু, তুমি এস, তুমি এস" বলিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে ডাকিতেছেন।

তাহার পরে স্বয়ং ঈশ্বরই মীরার প্রাণে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে আধ্যাত্মিক শক্তি দান করিলেন। তিনি সেই শক্তিতে শক্তিশালিনী

হইয়া বাসনার উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন; ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি তাঁহার সম্পূর্ণ বশীভূত হইল এবং অন্তরে ভক্তির উৎস খুলিয়া গেল। তাঁহার জীবনের এই উন্নত অবস্থার বিষয় বর্ণনা করিতে গিয়া ভক্তমাল রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"একান্ত শ্রীকৃষ্ণভক্ত অনন্ত মানস।
প্রেমভক্তি চমৎকৃত কৃষ্ণ যাতে বশ॥
অন্য কথা অন্য চেষ্টা অন্য সঙ্গহীন।
কাম-ক্রোধ-লোভ-আদি আপনা-অধীন॥"

মীরার প্রতি তাঁহার স্বামীর যে ভালবাসা, তাহা এখনো অক্ষুন্ন রহিয়াছে। রাণার হৃদয়ে সন্দেহের রেখাপাতও হয় নাই। মীরা যে রাজপরিবারের চিরন্তন রীতি লঙ্ঘন করিয়া পূজা, অর্চ্চনা ও সাধন ভজন করিতেছেন, রাণা তাঁহার সেই কার্য্যের উপরে হস্তার্পণ করেন নাই। কিন্তু রাজমাতা বধূকে আর প্রশ্রয় দিতে পারিলেন না। তিনি শক্তির উপাসনা করেন; বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রতি তাঁহার অন্তরের একটুকু শ্রদ্ধা নাই। আমরা যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন শাক্ত ও শৈবসম্প্রদায়ের সহিত বৈষ্ণবদিগের ঘোর বিবাদ হইত। কাজেই রাণার জননী স্নেহের অনুরোধেও বধূর ধর্ম্মের প্রতি উদার ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেন না। বধূ যে পুরুষ বৈষ্ণবদিগকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন এবং তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া গান গাহিতেন, শাশুড়ীর পক্ষে তাহা একেবারেই অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি কুপিতা হইয়া মীরাবাইকে বলিতেন—

"তুমি আমাদের বধূ হইয়াও রাজপরিবারের চির-প্রচলিত ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, নূতন এক বৈষ্ণবধর্ম্ম লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছ। তুমি অন্তঃপুরে কতকগুলি বৈষ্ণবকে আহ্বান করিয়া এবং তাহাদের সঙ্গে

মিশিয়া উচ্চকণ্ঠে গান করিয়া থাক; এইরূপ অন্যায়াচরণ করিতে তোমার কি একটুকু লজ্জা ও সঙ্কোচ হয় না? কত লোক নির্লজ্জা নারী বলিয়া, তোমার যে নিন্দা করে, তাহা কি শুনিতে পাও না?"

মীরাবাই নয়নজলে সিক্ত হইয়া শাশুড়ীকে বলিতেন—"জননি, মানুষের নিন্দা কুৎসা সকলই আমার কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু কি করিব? আমার দেবতাই আমাকে কুলধর্ম্মের বাহিরে লইয়া গিয়াছেন। এ জীবন এখন তাঁহারই, তিনিই হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছেন; আমার সর্ব্বস্বই শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছি। আমি ত এখন আমার দেবতার দাসী মাত্র; তিনি যে পথে চালাইবেন, সেই পথেই চলিব। আমি আমার প্রভুর প্রেম ভিন্ন আর ত কিছুই চাহি না। আপনি তিরস্কার করিলে আমি আর কি করিতে পারি? আমি ত আমার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও জীবন ধারণ করিতে পারি না।"

বধূর কথা শুনিয়া শাশুড়ী ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিতেন। মীরার প্রতি লাঞ্ছনা গঞ্জনার কিছুই ত্রুটি হইত না। শুধু তাহাই নহে; শাশুড়ী বধূকে শাসন করিবার জন্য পুত্রকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন।

৩

একটি ঘটনায় রাজান্তঃপুরে বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল; মীরাবাই ঘোর সঙ্কটের মধ্যে পতিত হইলেন। এই ঘটনাসম্বন্ধে লেখকদিগের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। ভক্তমাল গ্রন্থের লেখক বলেন—

"বাইজীর গানশক্তি আকবর সাহ।
পাতসা শুনিতে মনে করিলা উৎসাহ॥
তান সেন সঙ্গে করি বৈষ্ণবের বেশে।
বাইজীর গৃহে গেলা হইয়া উল্লাসে॥
বৈষ্ণব জানিয়া বাই সমাদর কৈল।
গান শুনিবারে তবে পাতসা কহিল॥
ঠাকুরের আগে বাই গাইতে লাগিলা।
গান শুনি তানসেন আপনা নিন্দিলা॥
পাতসা শুনিয়া তবে চমৎকার হৈল।
প্রেমাবেশে দুইজনা অধৈর্য্য হইল॥"

রাজান্তঃপুরে সাধ্বী মীরার নিকট সকল বৈষ্ণবই গমন করিতেন এবং তাঁহার ভক্তিসঙ্গীত শুনিয়া কৃতার্থ হইতেন। সে হিসাবে সম্রাট আকবর ও সুগায়ক তানসেন বৈষ্ণব সাজিয়া রাণীর নিকটে গমন করিতে পারেন। কিন্তু কোন কোন লেখক মনে করেন, ইটি কল্পিত গল্প মাত্র। সম্রাট আকবর এবং তানসেন চিতোরের রাজান্তঃপুরে প্রবেশ করেন নাই, মন্দার-রাজকুমারই বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আমরা "ভারতীয় বিদুষী" শীর্ষক গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া শেষোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করিতেছি।

মীরবাই ধর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত, সংসারে অনাসক্ত; তাঁহার স্বামীর প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা পালন করিবারই বা অবসর কোথায়? কাজেই রাণা, মীরাকে লইয়া অধিক দিন সুখী হইতে পারিলেন না। তিনি মীরার ইচ্ছানুসারেই পুনর্ব্বার বিবাহ করিবার সংকল্প করিলেন।

কিছুদিন পরেই ঝালবার-রাজকুমারীর রূপলাবণ্যের কথা রাণার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টা

করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকন্যা মন্দার-রাজকুমারের প্রেমে আকৃষ্ট; তিনি তাঁহাকেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন। রাণার যে কি দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল, তাহা কে বলিবে? তিনি সমস্ত কথা শুনিতে পাইয়া, রাজকুমারীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিলেন। কিন্তু তাহাতে রমণীর মনোহরণ করিবার বিশেষ কোন সুবিধা হইল না।

এ দিকে মন্দার-রাজকুমার বৈষ্ণবের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে মীরার নিকট গমন করিলেন। মীরা বৈষ্ণব দেখিলেই যত্ন ও।সমাদরপূর্ব্বক তাঁহাকে খাওয়াইতেন এবং তাঁহার সহিত হরিগুণগান করিতেন। ছদ্মবেশী রাজকুমারের প্রতিও মীরার যত্ন আদরের কিছুমাত্র ত্রুটি হইল না। রাজকুমার সেই সুবিধা পাইয়া কৌশলে ধর্ম্মশীলা মীরাকে একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়া, বন্দিনী ঝালবার-রাজকুমারীর সহিত একটিবার দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল; রাণা রাজকুমারকে অন্তঃপুরের মধ্যে ধরিয়া ফেলিলেন।

এই ঘটনায় চারিদিকে একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। নিন্দুকেরা কথাটা অতিরঞ্জিত করিয়া সাধ্বী মীরার নামে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। রাণা ক্রোধে আত্মবিস্মৃত হইয়া ধর্ম্মশীলা পত্নীর প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন; তাঁহার আদেশে মীরাকে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। মীরাবাই স্বামীর আজ্ঞা মস্তক পাতিয়া লইয়া রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। তিনি রাজকন্যা এবং রাজার ঘরের বধূ; তবুও আজ দুঃখিনী রমণীর ন্যায় একাকিনী অপরিচিত রাজপথে চলিতে লাগিলেন।

পরনিন্দার জন্য যাহাদের রসনা নৃত্য করিয়া উঠে, তাহারা মীরার নামে কুৎসা রটনা করিত বটে; কিন্তু রাজ্যের বিস্তর পুরুষ ও নারী

মীরাবাইকে দেবী মনে করিয়া ভক্তি করিতেন। মীরা রাজপুরী ত্যাগ করায়, তাঁহারা বিলাপ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মীরার অভাবে স্বয়ং রাণারও রাজপ্রাসাদ শূন্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া স্ত্রীর প্রতি যতই কঠোর ব্যবহার করুন না কেন, মীরার উপরে তাঁহার যে আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সেজন্য তিনি মীরাকে ফিরাইয়া আনিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট কয়েক জন লোক পাঠাইয়া দিলেন। মীরার স্বামীর প্রতি যে ভালবাসা, তাহা একটুকু হ্রাস হয় নাই। তিনি স্বামীর আজ্ঞায় রাজপুরী ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুরোধেই রাজান্তঃপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু প্রেমের দেবতা স্বয়ং ঈশ্বরই মীরাকে প্রেমে পাগলিনী করিবার জন্য ধনৈশ্বর্য্য হইতে দূরে লইয়া যাইতে চাহেন, তাঁহাকে আর কে রাজ-প্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিবে? অল্প দিনের মধ্যেই আবার আর একটি ব্যাপার উপস্থিত হইল। একজন সম্ভ্রান্ত লোক * মীরার ভক্তিসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে একখানি মূল্যবান্ আভরণ উপহার প্রদান করিলেন। আভরণখানির দাম যতই বেশী হউক না কেন, উহা ধর্ম্মশীলা মীরার নিকট অতি তুচ্ছ সামগ্রী। তবু সম্ভ্রান্ত লোকটি যে রকম শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে উহা অর্পণ করিয়াছেন, তিনি তেমনই ভক্তির সহিত সেই অলঙ্কারখানি তাঁহার প্রাণের দেবতা রণ্ছোড়দেবের অঙ্গে পরাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজান্তঃপুরের সকলই কিছু অদ্ভুত রকমের। সেখানে তিলই অনেক সময়ে তাল হইয়া উঠে। মীরা বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া যাহারা তাঁহার বিরোধী, সেই সকল নিন্দুকের রসনায় সহজ ব্যাপারটি বিকৃত হইয়া দাঁড়াইল; আবার

* ভক্তচরিতাবলীতে আছে আকবর এই মণিহার দিয়াছিলেন।

মীরার নামে কুৎসা রটনা হইতে লাগিল। রাণা কুপিত হইয়া মীরার মুখ দেখিতেও চাহিলেন না। তিনি মীরাকে বলিয়া পাঠাইলেন, মীরা যেন প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া এই কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে।

মীরার হৃদয় শুভ্র শতদলের মত সুপবিত্র, অথচ তাঁহার উপরেই স্বামীর অবিশ্বাস! এই জন্য এবার যে মীরাকে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিতে হইল, আর কেহই তাঁহাকে সেখানে রাজলক্ষ্মীরূপে দেখিতে পাইল না।

মীরার গৃহত্যাগ-বিষয়ে নানা রকম কথা প্রচলিত আছে। এজন্য এখানে স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থ হইতে কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিতেছি:—

"তাঁহার স্বামী-গৃহ-গমনের কিঞ্চিৎকাল পরেই নিজ শ্বশ্রূর সহিত ধর্ম্মবিষয়ে উৎকট বিবাদ উপস্থিত হয়। রাণা ও তাঁহার অন্যান্য পরিবারেরা শাক্ত-উপাসক ছিলেন, কিন্তু রাণী পরম বৈষ্ণবী হইলেন; ইহাতে রাজমাতা তাঁহাকে বৈষ্ণবধর্ম্মে বিরত ও শক্তি-উপাসনায় প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত বিস্তর উপদেশ দিলেন; কিন্তু বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা মীরা কোনক্রমেই তাহা স্বীকার করিলেন না। এ-প্রযুক্ত রাণা তাঁহাকে গৃহ হইতে বিবাসিত করিয়া দিলেন।"

৪

মীরাবাই অধিকাংশ সময় তাঁহার আরাধ্য দেবতার মহা ভাবের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন এবং গাহিতেন—

"মীরাকী প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।"

এ কথা সত্য বটে; কিন্তু তবুও তাঁহার মনোবৃন্তে যে প্রীতির কুসুম

প্রস্ফুটিত হইত, তিনি সেই পুষ্প দ্বারা শুধুই তাঁহার আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করেন নাই; সেই ফুল স্বামীকেও অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহার সৌরভে ও সুষমায় রাণার অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত। সাধ্বী মীরা যথার্থই স্বামীকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।* নচেৎ তিনি কিসের আকর্ষণে এতদিন রাজপ্রাসাদের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে বাস করিয়াছিলেন? জানি না এখন সেই স্বামীকে ত্যাগ করিয়া রাজপুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে তাঁহার কি রকম ক্লেশ হইতেছিল। কিন্তু তাঁহার রাজপুরী হইতে চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোনই উপায় ছিল না। তাই মীরা রাজপথে বাহির হইয়া তাঁহার প্রাণের দেবতা শ্রীহরির রসমাধুর্য্যপূর্ণ মূর্ত্তিখানি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করিলেন।

মীরাবাই যখন বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বন্ধনমুক্ত, তাঁহার আত্মা স্বাধীন, তাঁহার জীবনের পথ বিঘ্নশূন্য; এইবার তিনি তাঁহার প্রেমের দেবতার চরণে আপনার নারীজীবন সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করিবার জন্য উন্মনা হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার মর্ম্মস্থান হইতে যে সকল সঙ্গীত বাহির হইত, "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থ হইতে তাহার একটি সঙ্গীতের কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ উদ্ধৃত করিতেছি—

"আমি আপনার রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, প্রেম সমুদায়ই বিসর্জ্জন দিয়াছি। তোমার দাসী মীরা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে তুমি তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ কর।

"তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর;

---

* রূপে গুণে, পাতিব্রত্যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে কিছুতেই তদানীন্তন রাজকুলে মীরাবাইয়ের সদৃশী রমণী পরিদৃষ্ট হইত না। শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রাজস্থান সপ্তম অঃ।

তোমা বিনা আমাকে দয়া করে এমন আর কেহ নাই; অতএব আমাকে ক্ষমা কর। ক্ষুধা, ক্লান্তি, উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতায় যেন আমার শরীর ভগ্ন না হয়। হে মীরার পতি, মীরাকে গ্রহণ কর। তোমার সহিত যেন আর কদাপি বিয়োগ না হয়।"

মীরাবাইয়ের এই সঙ্গীতের মধ্যে তাঁহার অন্তরের ভক্তি, বেদনা ও ব্যাকুলতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। স্বামীকে ত্যাগ করিয়া আসায়, প্রাণের মধ্যে যে একটি ব্যথা ছিল, তাহাও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে; নিন্দুকের অযথা কুৎসা শুনিয়া তাঁহার স্বামী যে তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন এবং সেজন্য তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছেন ও রাজপুরী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছেন, সেই নিদারুণ দুঃখও তাঁহার মর্ম্মস্থানে লুকায়িত আছে। তাই অন্তর্যামী দেবতাকে বলিতেছেন—

"তুমি যদি আমাকে নির্দ্দোষ জানিয়া থাক, তবে গ্রহণ কর; তুমি বিনা আমাকে দয়া করে, এমন আর কেহ নাই।"

শত শত বৎসর পূর্ব্বের একটি সাধ্বী নারীর বেদনার কাহিনী সঙ্গীতের এই কথাগুলির মধ্যে কেমন জীবন্ত হইয়া আছে!

মীরাবাই ক্রমশই ভক্তির উচ্চ হইতে উচ্চতম অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। প্রেমে তাঁহার হৃদয় প্লাবিত হইতে লাগিল। নদী যেমন আপনাকে সাগরে ঢালিয়া দেয়; তেমনি যেন মীরাবাই আপনাকে আরাধ্য দেবতার প্রেমের মধ্যেই ঢালিয়া দিলেন। তিনি শ্রীহরিকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া মধুর ভাবের সাধন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবদিগের ভক্তিসাধনের মধ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি অবস্থা আছে। বৈষ্ণব-সাধকরা বলেন, মধুরভাবেই ভক্তির চরমোৎকর্ষ; তখন ভক্ত ঈশ্বরকেই স্বামিরূপে বরণ করিয়া তাঁহার

চরণে হৃদয়ের প্রেম—শুধু হৃদয়ের প্রেম বলি কেন—আপনার দেহমন সর্ব্বস্বই অর্পণ করেন। এ বিষয়ে পতিপত্নীর প্রেমের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। সাধ্বীনারীর একনিষ্ঠ প্রেম; তিনি স্বামীকেই সর্ব্বস্ব মনে করিয়া একমাত্র তাঁহারই চিন্তা করেন, তাঁহাকেই হৃদয়মন অর্পণ করেন, এবং তাঁহার প্রেমেই কৃতার্থ হন। তেমনি যথার্থ ভক্তের প্রেম একনিষ্ঠ হইবে; তিনি ঈশ্বরের চরণে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া, নিরন্তর তাঁহারই প্রেমমধুরমূর্ত্তি ধ্যান করিবেন এবং ঈশ্বরের প্রেমেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিবেন।

মীরাবাই মধুরভাবের সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিলেন, আপনার নারীজীবনের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও প্রেম প্রভৃতি যাহা কিছু সুন্দর, মহৎ ও পবিত্র—সমস্তই শ্রীহরির পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

এই সময়ে এবং ইহার পূর্ব্বে ও পরে, প্রেমোন্মাদিনী মীরা যে সকল গান গাহিয়া নিজে ভক্তিতে আত্মহারা হইয়া যাইতেন এবং শত শত নরনারীর অন্তরে প্রেমের রসধারা উচ্ছলিত করিতেন, তাহার দুই-একটি সঙ্গীত সম্পূর্ণ এবং কয়েকটি গানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকেরা মীরার সঙ্গীত আবৃত্তি করিয়া তাঁহার অন্তরের প্রেম একটুকু অনুভব করিতে পারিবেন।

মীরা নিরন্তর তাঁহার প্রেমের দেবতার অনুপম রূপরাশি নিরীক্ষণ করিতে চাহিতেন এবং তাঁহার নিত্যসঙ্গ লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। কিন্তু মনোবাসনা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি অধীর হইয়া গাহিতেছেন—

"জৈসে জল কে শুষ্ক হুএ তে মীন ন জিয়ে বিচারে।
কিরপা কীজো দর্শন দীজো মীরাঁর প্রাণ-দুলারে।"

অর্থ—জল হইতে বঞ্চিত শুষ্ক মীন বেচারা বাঁচে কেমন করিয়া ? প্রভু, কৃপা কর, দর্শন দাও, তুমি যে মীরার প্রাণবল্লভ, দুর্লভ ধন।

মীরা যতদিন তাঁহার সর্ব্বস্ব ভগবানের চরণে অর্পণ করেন নাই, ততদিন তাঁহার বিরহে বারিবিহীন মীনের মত হৃদয়ের যাতনায় ছট-ফট করিয়াছেন। তাহার পরে মীরা যখন শ্রীহরির প্রেমে রাজ্য-সুখ, ধন, জন সকলই ত্যাগ করিলেন; তখন তাঁহার জীবনদেবতার প্রেমের উপরে একটা দাবি জন্মিল। তাই তিনি জোরের সহিত বলিতে'ছন, "প্রভু, দেখা দিবে না কেন? আমি যে তোমার জন্য সব ত্যাগ করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে কি বলিয়া ত্যাগ করিবে?"—

"তুম্হার কারণ সব সুখ ছোড়্যা অব মোহি ক্যোঁ তারসাবো।
অব ছোঁড়্যা নহি বনৈ প্রভুজী চরণন পাস বুলাবো॥"

অর্থ—প্রভু তোমার জন্য সব সুখ ত্যাগ করিলাম, আর কেন আমাকে তৃষিত রাখ? আর কেন আমাকে ছাড়িয়া থাক? এখন তোমার চরণপ্রান্তে আমাকে ডাকিয়া লও।

ভক্তের এমন দাবি কোন্ দিন প্রেমের দেবতা উপেক্ষা করিতে পারিয়াছেন? তাই তিনি সঙ্গীতে, সৌন্দর্য্যে, রসে বিশ্বভুবন পূর্ণ করিয়া মীরার নিকট প্রকাশিত হইতেছেন। মীরা নিখিল চরাচরে, তাঁহার প্রাণের দেবতার আগমনী-সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। যেন জগতের সকল শোভায়, সকল সঙ্গীতে, সকল আনন্দের মধ্যে মীরার প্রিয়তমের চরণধ্বনিই বাজিতে লাগিল—

"সুনি মৈঁ হরি আব্‌নকী আবাজ।
দাদুর মোর পাপীহা বোলৈ কোঈল মধুরে সাজ॥
গরজে বদরবা মোরবা বোলৈ দামিন ছোড়ী লাজ।
শুনি পিয়া আব্‌নকী আবাজ॥"

অর্থ—আমি হরির আগমনের শব্দ শুনিতেছি। তাঁহার পদধ্বনি বাজিতেছে। দর্দ্দুর ডাকিতেছে, পাপিয়া গান করিতেছে, কোকিল মধুর উৎসব করিতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে, আজ দামিনী লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে। আজ জীবননাথের পদধ্বনি শুনিতেছি।

অতঃপর মীরার বৃন্দাবন আর স্থানবিশেষে আবদ্ধ ছিল না। তিনি সর্ব্বত্রই ভগবানকে দর্শন করিতেন, তাই তাঁহার সকল স্থানেই বৃন্দাবন। এজন্য মীরা গাহিলেন—

"তেরে ভুবন বৃন্দাবন মেঁ সাঁবলিয়া কে সুর বাজৈ।"

অর্থ—তোমার ভুবন বৃন্দাবনে হে রসময় শ্যামল, তোমার সুর বাজিতেছে।

মীরার অন্য একটি সঙ্গীতের কয়েকটি পদ এই—

"হে সখি, যাহারা পতিব্রতা নারী, তাহাদের যে সৌভাগ্য, সেও ক্ষণস্থায়ী—আসে আর যায়। আমি এক অবিনাশী পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিবই করিব; যাঁহাকে কাল বিনাশ করিতে পারিবে না। অন্য লোকেরা পেয়ালা পেয়ালা সুরা পান করিয়া মাতিয়া উঠে। আমি সুরা পান না করিয়াই মাতিয়া যাই। আমি যে পেয়ালা পান করি, সে হরির প্রেম। সেই প্রেমেই দিবানিশি ভরপূর থাকি।"

মীরাবাই এই সঙ্গীতের মধ্যে ভাষার কোন আবরণ রাখেন নাই, স্পষ্টই বলিতেছেন, তিনি দিবানিশি শ্রীহরির প্রেমেই ভরপূর থাকেন। মীরা আর একটি সঙ্গীতের ভিতরে বলিয়াছেন—

"তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহী কোঈ।"

এখন এক হরি ভিন্ন মীরার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু আপনার কেহই নাই। এই সকল সঙ্গীতের পদ আবৃত্তি করিয়া পরিষ্কার

বুঝিতে পারা যায় যে, মীরাবাই যথার্থই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ভক্তির সর্ব্বোচ্চ অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে বিস্তর লোক মীরাবাইকে মূর্ত্তিমতী দেবী মনে করিয়া তাঁহার নিকট ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে বৈষ্ণবধর্ম্মের মধ্যেই মীরাবাইয়ের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গঠিত হইল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যে চিতোরের রাজপরিবার হইতে তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই চিতোরে অদ্যাপি রণ্ছোড়দেবের সহিত মীরাবাইয়ের পূজা হইয়া থাকে।

৫

মীরাবাই বৃন্দাবন হইতে দ্বারকাতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। সেখানেও শত শত পুরুষ ও রমণী তাঁহার প্রেমসঙ্গীতে মুগ্ধ এবং তাঁহার ভক্তিপূর্ণ জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল। মীরাবাই ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। এই ভক্তিমতী ও দয়াবতী নারী সর্ব্বত্রই দান ও ধ্যান এই দুই কার্য্যে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

মীরাবাই বৃন্দাবনে বাস করিবার সময়ে, একটিবার ভক্ত রূপ গোস্বামীকে দর্শন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু—

"গোসাঞি কহেন মুই করি বনে বাস।
নাহি করি স্ত্রীলোকের সহিত সম্ভাষ॥"*

মীরাবাই স্ত্রীলোক বলিয়া রূপগোস্বামী তাঁহার সহিত দেখা

* ভক্তমাল।

করিতে চাহিলেন না বটে; কিন্তু গোস্বামীর কথার উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—

"বৃন্দাবনে ত একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই পুরুষ। তবে কেন রূপগোস্বামী আপনাকে পুরুষ মনে করিয়া অহঙ্কার করিতেছেন?"

এ কথার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, বৈষ্ণবসাধকেরা আপনাদিগকে প্রকৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণকেই পুরুষ ভাবিয়া—অর্থাৎ আপনাদিগকে নারী এবং ঈশ্বরকেই পুরুষ মনে করিয়া সাধনা করিতেন। সুতরাং সে হিসাবে যিনি যথার্থ সাধক, তিনি আপনাকে পুরুষ মনে করিয়া অহঙ্কৃত হইয়া নারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারেন না।

রূপগোস্বামী মীরাবাইয়ের কথা শুনিয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন। তাহার পরে ভক্তিমতী মীরার সহিত ঈশ্বরানুরক্ত গোস্বামী মহাশয়ের দেখা-শুনা ও আলাপ-পরিচয় হইল। মীরাবাই ভক্তকে দর্শন করিয়া প্রেমোচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা হইয়া উঠিলেন; তাঁহার অনুপম নারীমূর্ত্তির ভিতর নানা ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। রূপগোস্বামী বুঝিতে পারিলেন, মীরাবাই সামান্যা স্ত্রীলোক নহেন; তাই তিনি মনের আনন্দে তাঁহার সহিত ভক্তিবিষয়ে শাস্ত্রালোচনা করিতে লাগিলেন।

মীরাবাইয়ের খ্যাতি যখন সর্ব্বত্র রটিত হইল, তখন রাণা আপনার ভুল বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন। তিনি আর রাজগৌরবে গর্ব্বিত হইয়া চিতোরে সুস্থিরচিত্তে বাস করিতে পারিলেন না। রাণা বৃন্দাবনে গমন করিয়া মীরাকে কহিলেন—"আমাকে মার্জ্জনা কর। আবার চিতোরে ফিরিয়া চল। সেখানে শত শত নরনারী তোমাকে দেবী মনে করিয়া তোমার চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।"

হিন্দুনারী কোন দিনই হৃদয় হইতে স্বামীর স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে পারেন না। মীরাবাইও তাহা পারেন নাই। তাই তিনি স্বামীর

অনুরোধে একবার চিতোরে গমন করিলেন। কিন্তু রাণা যে পুনর্ব্বার তাঁহাকে পত্নীরূপে রাজান্তঃপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহার সুপবিত্র প্রীতি লাভ করিবেন, সে আশা আর কোথায়?

যে রমণী হরিপ্রেমে একেবারেই পাগলিনী, তিনি আর কতদিন রাজপুরীর রত্নমণির মধ্যে বাস করিতে পারেন? মীরাবাই ছুটিয়া বৃন্দাবন গমন করিলেন এবং অসীমসুন্দর শ্রীহরির প্রেমের মধ্যে ডুবিয়া গেলেন। এখন শ্রীহরিই তাঁহার সর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাই মীরা-বাইয়ের মনোবীণায় এই প্রেমসঙ্গীতই বাজিয়া উঠিতে লাগিল—

"মেরে গিরিধর গোপাল দুসরো ন কোঈ।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা নহীঁ কোঈ।"

কিন্তু হায়, যে মীরাবাই সাধনের দ্বারা বাসনার উপর জয়লাভ করিলেন, সংসারের উপর জয়লাভ করিলেন; তিনি কালের উপর জয়লাভ করিতে পারিলেন না। (১৬২০ হইতে ১৬৩০ সংবতের মধ্যে) মৃত্যু আসিয়া তাঁহার মনোবীণার ঝঙ্কার থামাইয়া দিল, তাঁহার কণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইল; তিনি জীবনলীলা সাঙ্গ করিয়া শ্রীহরির অসীম প্রেমের মধ্যে অনন্ত কালের জন্য ডুবিয়া গেলেন। আর তাঁহার প্রেমোজ্জ্বল দিব্যমূর্ত্তি কেহই দেখিতে পাইল না, তাঁহার কণ্ঠের সুস্বর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না; শিষ্যদের ক্রন্দনধ্বনি তাঁহাকে পরলোক হইতে ফিরাইতে পারিল না। কিন্তু এখনো সেই প্রেমময়ী নারীর পুণ্যস্মৃতি শত শত ভক্তের হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া আছে। তাঁহারা মীরাবাইয়ের সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে ভক্তিপথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন।

আমরা সর্ব্বশেষে শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে মীরাবাইসম্বন্ধীয় গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি—

"রূপে, গুণে, পাতিব্রত্যে, ধর্ম্মানুষ্ঠানে, কিছুতেই তদানীন্তন রাজকুলে মীরার সদৃশী রমণী পরিদৃষ্ট হইত না। ধর্ম্মের প্রতি রাজমহিষীর বিলক্ষণ অনুরাগ ছিল। বৃন্দাবন হইতে দ্বারকাপুরী পর্য্যন্ত যতগুলি তীর্থ আছে, তৎসমস্ত তীর্থেই তিনি গমন, সমস্ত তীর্থেই দেবদর্শন এবং সমস্ত তীর্থেই দীনদুঃখীকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ধর্ম্মগর্ব্বিনী রসময়ী কবিতাগুলি পাঠ করিলে তাঁহার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।"

রাজকুমারী সংঘমিত্রা

—:০:—

১

প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কন্যা ধনসম্পদ তুচ্ছ মনে করিয়া ধর্ম্মকেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন এবং ধর্ম্ম প্রচারের জন্য আপনার জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। এখন এ কথা স্মরণ করিলেও হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। আজ সেই ভারতের গৌরবময় যুগের প্রাতঃস্মরণীয়া রাজকন্যার জীবনচরিত রচনা করিতে বসিয়া লেখনী সার্থক মনে হইতেছে।

এই রাজকুমারী সম্রাট অশোকের কন্যা সংঘমিত্রা। তাঁহার জন্মস্থান উজ্জয়িনী। তিনি ও তাঁহার ভাই মহেন্দ্র উজ্জয়িনীর শ্রেষ্ঠী-কন্যা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দুই ভাই-ভগিনী শৈশবকালে উজ্জয়িনী নগরীতেই বাস করিতেন। তাহার পরে ২৬৮ খ্রীষ্টপূর্ব্বাব্দে অশোক মগধ সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া পুত্র ও কন্যাকে রাজধানী পাটুলি-পুত্র নগরে লইয়া আসিলেন। এখন যেখানে পাটনা সহর, তাহার নিকটেই পাটলীপুত্র নগর শোভা পাইত। তখন এই নগরের জাঁকজমক ও সুখ সমৃদ্ধির কোনই অভাব ছিল না, নানা শ্রেণীর বিস্তর লোক এখানে বাস করিত, বিচিত্র রাজপ্রাসাদ, পুষ্পোদ্যান, ধনীদিগের সৌধরাজি ও দ্রব্যসম্ভারপূর্ণ বিপণিশ্রেণী দর্শকদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিত। এই নগরের পুরুষ ও রমণীগণ দুই ভাই-ভগিনীর রূপলাবণ্য ও

অনুপম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সম্রাট অশোক পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রার মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য উৎকৃষ্ট শিক্ষা দিবার সুব্যবস্থা করিলেন।

এই স্থানে জগৎবিখ্যাত সম্রাট অশোকের জীবনচরিতবিষয়ে গুটি-কয়েক কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। অশোক রাজপুত্র হইলেও তাঁহার চেহারা অতিশয় কুৎসিত ছিল। এজন্য তাঁহার পিতা নৃপতি বিন্দুসার তাঁহাকে মোটেই পছন্দ করিতেন না। বোধ হয় পিতা ও বিমাতাদিগের অবজ্ঞা এবং তুচ্ছ তাচ্ছল্যের জন্য ধার্ম্মিক অশোকই এক সময়ে অতিশয় স্বার্থপর ও অধার্ম্মিক ছিলেন। তাঁহার রক্তপিপাসা ও নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি চণ্ডাশোক অর্থাৎ যমদূত বলিয়া অভিহিত হইতেন। কথিত আছে, তিনি যমরাজার অনুকরণ করিয়া একটি নরক-পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; অপরাধীদিগকে সেই ভীষণ পুরীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া, শাসন, পীড়ন, অবশেষে যন্ত্রণা প্রদান করিয়া হত্যা করিতেন। অথচ এই অশোকের মধ্যেই অসামান্য শক্তি ও নানা সদ্‌গুণ লক্ষিত হইত। রাজা বিন্দুসার পুত্রকে দূরে রাখিবার জন্যই তাঁহাকে উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অশোক এইখানে দেবী নাম্নী এক তরুণী রমণীর মনোহারিণী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। তাহার পরে পিতা বিন্দুসারের মৃত্যু হয়। তখন অশোক ভ্রাতা সুষীমের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করেন।

অশোক সম্রাট হওয়ার পরে ভীষণ সংগ্রাম করিয়া কলিঙ্গদেশ অর্থাৎ উড়িষ্যা অধিকার করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ নরহত্যা হয়। এই হত্যাকাণ্ড স্মরণ করিয়াই অশোকের পাষাণ প্রাণ দ্রবীভূত এবং অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইল। এই সময়ে অশোক পরের রাজ্য জয়

করিবার স্পৃহা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পরেই অশোকের জীবনে আধ্যাত্মিক শক্তির গূঢ় ক্রিয়া আরম্ভ হইল। একজন প্রভূত ক্ষমতাশালী বৌদ্ধসন্ন্যাসী অশোকের হৃদয়ের উপরে যেন শক্তি সঞ্চার করিলেন; দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবনের মহা পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের মহৎ আদর্শ গ্রহণ করিলেন। বিশ্বপ্রেমে তাঁহার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে মহাপুরুষ বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয় এক বিচিত্র ব্যাপার। মহাত্মা বুদ্ধ রাজার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ধনৈশ্বর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে বর্দ্ধিত হইলেন; অথচ জগতের নরনারীর দুঃখ ও অশান্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি রাজসিংহাসন পায়ে ঠেলিয়া, শান্তির উপায় আবিষ্কারের জন্য কঠোর তপস্যায় মগ্ন হইয়া গেলেন। তাহার পরে শান্তির উপায়স্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্ম লাভ করিয়া, মানবের দ্বারে দ্বারে সেই ধর্ম্ম লইয়া গমন করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের পরম তত্ত্ব যে নির্ব্বাণ, তাহা যে কি, ঠিক্ বুঝি ত পারি না, কেহ ভাল করিয়া বুঝাইতে পারেন না, কিন্তু সাগরে জলোচ্ছ্বাসের মত, বৌদ্ধসাধকদিগের অন্তরে যে মহাপ্রেমের উচ্ছ্বাস দেখা গিয়াছে, তাহা অতীব বিচিত্র, তাঁহারা যে প্রাণভরা প্রেম ও করুণা লইয়া মানব ও ইতর প্রাণী—সর্ব্বজীবের কাছেই উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়া যাই।

বৌদ্ধ প্রচারকগণ বিশ্বপ্রেম প্রচার করিয়া যাগযজ্ঞ ও পশুবধ নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, নিরীহ জীবের রক্তে ধরণীর স্নেহময় বক্ষে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন অঙ্কিত হইত, তাহা কিয়ৎপরিমাণে নিবারণ করিলেন। তাঁহারা বিশ্বজনীন্ ভ্রাতৃভাব ও উদারতা প্রচার করিয়া

নিম্নবর্ণের লোকদিগকে জাতিভেদের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দেশের চতুর্দ্দিকেই মৈত্রী, করুণা এবং "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" প্রেমের এই মহাবাণী প্রচারিত হইল। সংসারে প্রেমের আহ্বানের মত আর কি প্রাণ মাতানো ব্যাপার কিছু হইতে পারে? তাই বৌদ্ধ প্রচারক এবং ভক্ত বৈষ্ণবদিগের প্রেমের আহ্বানে শত সহস্র নরনারী ছুটিয়া গিয়া ঐ দুই ধর্ম্মের মধ্যেই ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল।

এইবার সম্রাট অশোক স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় ভারতবর্ষ করুণার প্লাবনে প্লাবিত হইল। তিনি দীনদুঃখী নর-নারী ও পশু-পক্ষীর দুঃখে বিচলিত হইয়া, সমস্ত প্রাণীর ক্লেশ নিবারণের জন্য রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। নয় কোটি ষাট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা শুধু তাঁহার দানের জন্যই খরচ হইয়া গেল। তিনি প্রাণী হিংসা অনেক পরিমাণে নিবারণ করিলেন এবং পশু-পক্ষীদিগের জন্য চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। অশোক লক্ষ লক্ষ লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির উন্নতি এবং মানুষের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধির জন্য কত রকম হিতানুষ্ঠানই যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও মন পৃথিবীর উপর হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। অনেক মনস্বী লেখকই স্বীকার করিয়াছেন যে, সম্রাট অশোকের রাজত্বের সময়েই ভারতবর্ষের যথার্থ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

২

রাজকুমারী সংঘমিত্রা ও রাজকুমার মহেন্দ্র এই দুজনকেই একটি বৃন্তের দুইটি সুন্দর পুষ্প বলিয়া মনে হইত। তাঁহাদের মুখশ্রী দেখিয়া নর-নারীর নয়ন মুগ্ধ হইয়া যাইত। দুই ভাইবোনের সুমিষ্ট

প্রকৃতি, দুজনের উপরেই পিতা অশোকের অত্যন্ত ভালবাসা; দুজনেই এক সঙ্গে নানা বিষয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলেন। সুশিক্ষায় দিনের পরে দিন সংঘমিত্রার চিত্তশতদল প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল; তিনি সুনির্ম্মল জ্ঞান লাভ করিলেন এবং তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভাবের স্ফূর্ত্তি হইল। এই সময়ে সংঘমিত্রার আঠার এবং মহেন্দ্রের কুড়ি বৎসর বয়স হইয়াছিল। সম্রাট অশোক সর্ব্বজনপ্রিয় ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত মহেন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বুদ্ধদেবের পবিত্র আত্মা দুই ভাই বোনকে ধর্ম্মপ্রচারের সুমহৎ ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। তৎকালের বৌদ্ধ-ধর্ম্মের একজন আচার্য্য সম্রাট অশোককে কহিলেন—

"রাজন্! যিনি ধর্ম্মার্থ পুত্র কিংবা কন্যা উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত অন্তরঙ্গ।"*

আচার্য্যের এই বাণী অশোকের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি স্নেহপূর্ণ নয়নে সংঘমিত্রা ও মহেন্দ্রের জ্যোতিঃপূর্ণ মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বলিলেন—"আমার প্রিয় পুত্র ও প্রিয় কন্যা, তোমরা কি ভিক্ষুধর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কর?"

দুই ভাই-ভগিনী পিতার মুখনিঃসৃত সুপবিত্র বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়াও সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইবেন এবং করুণাময় বুদ্ধদেবের দয়াধর্ম্ম প্রচারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবেন;—ধরাতলে ইহাপেক্ষা আর কি সুখের কথা হইতে পারে? দুই ভাইবোন পুলকে উৎফুল্ল হইয়া

---

* অশোক ১১শ অঃ।

পিতাকে কহিলেন—“পিতা, আপনি অনুমতি করিলেই আমরা এই মহৎ ব্রত গ্রহণ করিয়া মানবজন্ম সার্থক করিতে পারি।”

সম্রাট অশোক তৎক্ষণাৎ ভিক্ষুসঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—“আজ ভগবান তথাগতের পবিত্র ধর্ম্মের জন্য আমার প্রিয়তম পুত্র ও কন্যা উৎসর্গ করিলাম।” *

পরিশেষে মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী হইলেন। ধর্ম্মপালি ও আয়ুপালি নাম্নী দুইটি ধর্ম্মশীলা ভিক্ষুণী মহিলা সংঘমিত্রাকে উৎকৃষ্টরূপে ভিক্ষুণী-দিগের সাধনের নিগূঢ়তত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এখানে বলা প্রয়োজন, মহাত্মা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মের মধ্যে এক শ্রেণীর সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী ছিলেন, ইহাদিগকেই ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বলা হইত। তাঁহারা চিরদিন কঠোর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়া নিরন্তর ধর্ম্মসাধন ও জীবের কল্যাণ চিন্তা করিতেন।

সংঘমিত্রা ভিক্ষুণী হইয়া সর্ব্বপ্রকার সুখস্পৃহা বর্জ্জন করিলেন এবং বাসনার উপর জয়লাভ করিয়া ধর্ম্মসাধন করিতে লাগিলেন। কি রকম পদ্ধতি অনুসারে তিনি সাধন করিতেন, সে বিষয়েও সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা লিখিতেছি।

ভিক্ষুণীদিগকে সাধারণতঃ উপদেশ দেওয়া হইত—“তৃষ্ণা পরিহার করিবে। অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকিবে। বৃথা আমোদ-প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা ও ধর্ম্মসাধন করিবে। আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হইবে। অভিমান ত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হইবে এবং সকলের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করিয়া সন্তোষের সহিত

---

* অশোক।

জীবন যাপন করিবে। বৌদ্ধ-তপস্বিনীদিগকে শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় ব্রত পালন করিতে হইবে।" *

ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের সাধনবিষয়ে, শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বিষয়বাসনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ ভাবনা সাধন করিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা, ভাবনা এই পাঁচ প্রকার।"

"মৈত্রী—কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হউক, শক্রুরও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে মুক্ত হউক—এইরূপ শুভচিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে।

"করুণা—দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কি সে দুঃখ মোচন ও সুখবর্দ্ধন হয়, অহরহ এইরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা।

"মুদিত—ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হউক এই চিন্তা, মুদিত ভাবনা।

"অশুভ—শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরীচিকার ন্যায় অসত্য এবং মূত্র পূরিষে পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু, মানবজীবন জন্মমৃত্যুর অধীন, দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলে।

"উপেক্ষা—সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয়; বল দুর্ব্বলতা, দ্বেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা যৌবন, সুন্দর অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান, এই সাম্য ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয়।"

প্রতিদিন প্রভাতে ও সন্ধ্যাকালে এই সকল উচ্চতর বিষয় চিন্তা

* শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত বৌদ্ধধর্ম্ম।

করিতে করিতে মহা ভাবের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে পারিলে, নরনারীর মন যে অতিশয় উন্নত হয়, হৃদয় যে সম্প্রসারিত হয়, তাহা ত সহজেই অনুভব করিতে পারিতেছি। এই জন্যই বিস্তর মহিলা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ ও সাধন করিয়া অতি উন্নত জীবন লাভ করিয়াছিলেন। রাজকন্যা সংঘমিত্রা এখন এই সাধন অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মজীবনের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিলেন।

সংঘমিত্রার বড় ভাই মহেন্দ্র বত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সিংহল গমন করিলেন। সিংহলের রাজা তিষ্ঠ মহেন্দ্রের আধ্যাত্মিক জ্যোতিবিমণ্ডিত শান্তসুন্দর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। সিংহলের শত সহস্র নরনারী মহেন্দ্রের উপদেশ শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরে সিংহলের রাজকুমারী অনুলা পাঁচশত সখীসহ ভিক্ষুণী ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তখন মহেন্দ্রের মনে হইল, এই সকল রমণীদিগকে উত্তমরূপে ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং সিংহলের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিবার নিমিত্ত একজন সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা ভিক্ষুণীর অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই প্রিয়ভগিনী সংঘমিত্রাকে সিংহল পাঠাইবার জন্য, তিনি পিতার নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। রাজকুমারী সংঘমিত্রার এখন আর ধর্ম্ম ভিন্ন কোন পার্থিব সামগ্রীর প্রতিই মনের আসক্তি নাই। তাই তিনি যখন শুনিলেন, তাঁহাকে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সুদূর সিংহলে প্রিয়-ভ্রাতা মহেন্দ্রের নিকট গমন করিতে হইবে, তখন তাঁহার হৃদয় সহসা যেন আনন্দের সরোবর হইয়া দাঁড়াইল, সেই সরোবরে শান্তির শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। পুণ্যশীলা নারী উল্লসিত অন্তরে জনকজননী ও

আত্মীয় স্বজনের মায়াডোর ছিন্ন করিয়া, সিংহলে গমন করিবার জন্য সমুদ্রগামী অর্ণবপোতে আরোহণ করিলেন।

ইহার পূর্ব্বে আর কোন সৌভাগ্যবতী ভারত-রমণী ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য দূর বিদেশে যাত্রা করিয়াছেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই শুভদিনটি যে যথার্থই রমণীকুলের একটি স্মরণীয় দিন, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। বুঝি বা সে দিন ভারতের অর্ণবপোত এক গৌরবের পতাকা উড়াইয়া সাগরের নীল তরঙ্গের উপরে নব আনন্দে দুলিতে দুলিতে চলিতেছিল। হয় ত সে দিন সিন্ধুতটবাসিনী আর্য্যনারীগণ অর্ণবপোতের নিকটে দাঁড়াইয়া রাজকন্যার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন।

সংঘমিত্রা সিংহলে উপস্থিত হওয়ার পরে তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি, তপস্বিনী বেশ নিরীক্ষণ করিয়া এবং ধর্ম্ম ভাবের পরিচয় পাইয়া নরনারীর অন্তরে কি রকম ভক্তি ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোনই উপায় নাই। অশোকের জীবনচরিতে শুধু এই কয়েকটি কথাই পাঠ করা যায় যে, সংঘমিত্রা সিংহলে পৌঁছিয়া একটি ভিক্ষুণীসম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার ত্যাগমন্ত্রে পবিত্রীকৃত অত্যুন্নত জীবনের আরও কত কথা, কত কাহিনী জানিবার জন্য কৌতূহল উদ্দীপিত হইয়া উঠে, কিন্তু সে কৌতূহল চরিতার্থ হইবার উপায় নাই।

তবুও এই সন্ন্যাসিনী রাজকন্যার বিষয়ে যে অল্প কয়েকটি কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা চিন্তা করিতে করিতে কল্পনার মায়ামন্ত্রে মনের মধ্যে তাহার একটি মানসীমূর্ত্তি জীবন্ত হইয়া উঠে এবং সেই মূর্ত্তির সম্মুখে মস্তক নত হইয়া পড়ে। ভাবিয়া দেখিলে, ধর্ম্ম প্রচারের চেয়ে জীবনের গৌরবময় কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না।

নারী ধর্ম্মের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া সত্যের অমৃতময়ী বাণী মানুষকে শুনাইবেন—ইহার চেয়ে আর কি উচ্চতম কার্য্য আমরা কল্পনা করিতে পারি ? প্রায় ২১৭৫ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের সম্রাটের কন্যা সংঘমিত্রা এই প্রকার কার্য্যেরই গৌরব অনুভব করিয়াছিলেন এবং কোন রকম কষ্টের প্রতি দৃকপাত্ না করিয়া ধর্ম্মের জন্য আপনার মহামূল্য নারীজীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। যতদিন ভারতের ইতিহাস থাকিবে, ততদিনই আমাদিগকে এই ভারতরমণীর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া তাঁহার প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে হইবে। *

---

* মহাবংশগ্রন্থে পাঠ করা যায়, সংঘমিত্রা পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের উন্নতির জন্য বিস্তর পুণ্যকার্য্য করিয়া ৬৯ বৎসর বয়সের সময়ে পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। সিংহলের রাজা অত্যন্ত সমারোহের সহিত সংঘমিত্রার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

তপস্বিনী রাবেয়া

——:)*(:——

১

তুরস্কদেশের অন্তর্গত বাসোরা নামক নগরে একটি গরীব মুসলমান বাস করিতেন। রাবেয়া তাঁহারই চতুর্থ কন্যা। রাবেয়ার শৈশবকালেই মাতার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার পিতাই তাহাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অনুমান করি, এই পিতা, কন্যাকে উপাদেয় খাদ্য ও উত্তম বস্ত্রালঙ্কারের দ্বারা সুখী করিতে না পারিলেও তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের কোমল ও মধুর ভাবগুলি বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নচেৎ রাবেয়া যখন তরুণী নারী, তখন তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত না। কারণ তিনি একটু বড় হইয়াই আত্মীয়স্বজনের স্নেহবৃন্ত হইতে ঝরিয়া পড়িয়াছিলেন। লোকেরা তাহাকে ধূলা হইতে কুড়াইয়া লইয়া আপনাদের কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। তখন মানুষের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ও দুর্ব্যবহার ভিন্ন তাঁহার কোন রকম শিক্ষালাভ করিবার সুযোগ হয় নাই।

রাবেয়ার যখন বার কি তের বৎসর বয়স, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাহার পরেই বিপদ্ ঘনাইয়া আসিল। বাসোরা নগরে এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিল যে, মানুষ আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্য অন্তরের স্নেহ মমতা ও কোমলভাব বিসর্জ্জন দিতে লাগিল। তখন কে আপনার আত্মীয়স্বজনের বিপদের দিকে দৃষ্টি রাখিবে? তাই এক-

দুর্ব্বৃত্ত রাবেয়াকে অসহায় অবস্থায় পাইয়া অপহরণ করিল। তাঁহাকে বিক্রি করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করাই তাহার অভিপ্রায়। সেজন্য দুষ্ট লোকটি রাবেয়াকে লইয়া এক স্বার্থপর ধনীর কাছে উপস্থিত হইল। ধনী রাবেয়াকে ক্রয় করিলেন। বালিকার দুঃখের কাহিনী শুনিয়া ধনীর অন্তরে যে দয়ার সঞ্চার হইবে, তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি রাবেয়াকে দাসীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। দুঃখিনী বালিকার এই নিকৃষ্ট কার্য্যে হয় ত কোন রকম আপত্তি ছিল না; কিন্তু বিষয়ী মানুষটি রাবেয়ার উপরে অতিরিক্ত কাজের চাপ দিয়া জুলুম করিতে লাগিলেন। রাবেয়া ক্রীতদাসী হইলেও তিনি যে মানুষ, তাঁহার উপরে একটুকু স্নেহ প্রকাশ করা আবশ্যক, সে কথা ধনীর চিন্তা করিবার অবসর হয় নাই। তাই দৈবাৎ বালিকার কাজে একটু ভুল-চুক হইলে নিষ্ঠুর ধনী ক্রুদ্ধ হইয়া রাবেয়াকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করিতেন। রাবেয়ার এই দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে শুধু ঈশ্বরের কাছে গোপনে আপনার মর্ম্মবেদনা নিবেদন করিতেন। ঈশ্বরের কাছে অশ্রুপাত করা ভিন্ন বিপন্না বালিকা সান্ত্বনা লাভের আর কোন উপায়ই খুঁজিয়া পাইতেন না।

মানুষের দুঃখ সহিবারও একটি সীমা আছে। দুঃখ যখন সেই সীমাকে অতিক্রম করে, তখন আর মানুষ সুস্থির থাকিবে কেমন করিয়া? ধনীর হৃদয় যেন কঠিন পাথরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাই তাঁহার জুলুম ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। রাবেয়া আর সহিতে না পারিয়া, একদিন পলায়ন করিবার জন্য গৃহের বাহির হইলেন। ক্রীত-দাসী পলায়ন করিবার পরে ধরা পড়িলে, প্রভু যে কি রকম অভ্যর্থনার সহিত তাহাকে গ্রহণ করেন, হয় ত রাবেয়া তাহা উত্তমরূপেই জানিতেন। তাই তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী

দূর যাইবার সুবিধা হইল না। রাবেয়া হঠাৎ একটি জায়গায় আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। তাঁহার একখানি হাত একবারে ভাঙ্গিয়া গেল। তখন দুঃখ, যন্ত্রণায় ও ভয়ে রাবেয়ার মুখখানি ম্লান হইয়া গেল। তিনি চারিদিকে আঁধার দেখিতে লাগিলেন।

রাবেয়া এই বিপদের সময়ে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহার অন্তর হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইল—"করুণাময় পরমেশ্বর, আমি পিতৃহীনা জন্মদুঃখিনী ক্রীতদাসী। বন্দিনীর ন্যায় নিরন্তর দুঃখে দিন যাপন করিতেছি। আমি এতদিন যে হস্তখানির দ্বারা কার্য্য করিতাম, তাহাও ভগ্ন হইয়া গেল। তবে কি তুমি আমার উপর প্রসন্ন নহ? আজ আমাকে বল, তুমি আমায় প্রতি প্রসন্ন কি না?"

এই প্রার্থনার পরে রাবেয়ার অন্তর দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। তৎপরে এক স্বর্গীয় বাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি শুনিতে পাইলেন, স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে বলিতেছেন—"বৎসে, শোক করিও না, অচিরে তোমার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে। দেবগণ তোমাকে আদর করিবেন।"*

ঈশ্বরের এই বাণী শুনিয়া রাবেয়ার অন্তরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যদি ঈশ্বরই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহাকে করুণা বিতরণ করেন, তবে তিনি সকল কষ্ট পুষ্পের স্পর্শ মনে করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে সহ্য করিতে পারিবেন।

রাবেয়া ভাঙ্গা হাতখানির বেদনার কথা বিস্মৃত হইয়া, দৈববাণীর বিষয় ভাবিতে ভাবিতে পুনর্ব্বার প্রভুর গৃহেই ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে প্রভুর পরিচর্য্যা ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া যে অল্প

---

* তাপসমালা।

একটুকু অবসর পাইতেন, তিনি সেই সময়টুকু উপাসনা এবং ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া অতিবাহিত করিতেন।

রাবেয়ার কিছুদিন এইভাবে কাটিয়া গেল। তাহার পরে একদিন রাত্রে তিনি ব্যাকুলচিত্তে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রার্থনা যেন দেবাদিদেবের সিংহাসনতলে গিয়া পৌঁছিতে লাগিল। এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে রাবেয়ার প্রাণ পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে দিন ঠিক্ সেই সময়েই রাবেয়ার প্রভুর ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ প্রার্থনার সুমধুর শব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করায়, তিনি চমকিত হইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। কে নিশীথকালে এমন করুণ ও মধুরস্বরে প্রার্থনা করিতেছে, তাহা জানিবার নিমিত্ত লোকটি উৎসুকচিত্তে রাবেয়ার গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। রাবেয়াকেই প্রার্থনা করিতে দেখিয়া তাঁহার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি শুনিতে লাগিলেন, রাবেয়া ঈশ্বরকে বলিতেছেন—"প্রভু পমমেশ্বর, আমি এখন তোমারই আদেশ পালন করিতে চাহি। তোমার সেবায় ও তোমার চিন্তায় সমস্ত সময় অতিবাহিত করিতে পারিলেই জীবন সার্থক হয়। কিন্তু আমি পরাধীনা দাসী, আমার স্বাধীনতা কোথায়? আমি যাহা হইতে চাই, তাহা হইতে পারি না; যাহা করিব বলিয়া মনে করি, তাহা করিবারই বা সুযোগ কোথায়?"

রাবেয়ার প্রার্থনার মধ্যে যেন কি এক অজ্ঞাত শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই শক্তি গৃহস্বামীর পাষাণ মনের উপর আঘাত কবিল। তিনি আর সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না; ধীরে ধীরে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া দেখিতে পাইলেন, রাবেয়ার ভক্তিপরিপ্লুত মুখে ও স্বচ্ছ ললাটে দিব্যজ্যোতি বিভাশিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই স্বর্গীয় জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ যেন আলোকিত হইয়াছে। অল্প শিক্ষিত বিষয়ী মানুষটি এই

অভিনব দৃশ্য দর্শন করিয়া ভয়ে, বিস্ময়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইল, ইনি ত সামান্যা রমণী নহেন; স্বয়ং ঈশ্বরই ইঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন; অথচ আমি তুচ্ছ সংসারী মানুষ হইয়া এই পূজনীয়া রমণীকেই আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়াছি এবং ইঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিতেছি?

ধনী লোকটি ভয়ে ভয়ে রাবেয়াকে দাসীর কার্য্য হইতে মুক্তি প্রদান করিলেন। শুধু তাহাই নহে; রাবেয়ার প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি জন্মিল। তিনি বিনীতভাবে তাঁহাকে কহিলেন—"আমি এতদিন তোমাকে চিনিতে পারি নাই, এখন চিনিয়াছি। আর তোমাকে আমার সেবা করিতে হইবে না। তুমি আমার গৃহে বাস করিলে আমিই তোমার সেবা করিব।"

রাবেয়া কহিলেন—"প্রভু, আমার সেবার কোনই প্রয়োজন নাই। আপনি দয়া করিয়া আমাকে অন্য জায়গায় যাইবার স্বাধীনতা দান করিলে, আমি একটি নির্জ্জন স্থানে গমন করিয়া মনের আনন্দে তপস্যায় নিযুক্ত হইতে পারি।"

রাবেয়া স্বাধীনতা লাভ করিলেন। তাঁহার সমগ্র নারীপ্রকৃতি ঈশ্বরকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি সর্ব্বদা উপাসনা, ধর্ম্মালোচনা ও কোরাণ পাঠ করিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তাপস-মালার লেখক লিখিয়াছেন—"দিবারাত্রি ধর্ম্মপুস্তক কোরাণের আলোচনা ও উপাসনা, সাধনাতে রাবেয়ার বিশ্রাম ছিল না। তিনি কখন কখন মহর্ষি হোসেন বাসরীর সভাতে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালাপ করিতেন। কিয়ৎকাল এক নির্জ্জন অরণ্যপ্রদেশে বাস করিয়া যোগ অভ্যাস করেন। তৎপরে এক ভজনালয়ে যাইয়া স্থিতি করিয়াছিলেন।"

মুসলমানদিগের প্রধান তীর্থস্থান মক্কা। বিস্তর সাধক সেখানে বাস করিয়া ধর্ম্মসাধন করেন। মক্কায় যাইবার জন্য রাবেয়ার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহার সংসারের প্রতি একটুকু আসক্তি নাই, তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগস্থাপন করিয়া নিরন্তর তাঁহারই আবির্ভাবের মধ্যে বাস করিতে চাহেন।

রাবেয়া কিছুদিন পরেই তাঁহার চিরবাঞ্ছিত পবিত্র মক্কাতীর্থে গমন করিলেন। সেখানে তিনি ইচ্ছানুরূপ ধর্ম্মসাধন করিয়া ক্রমশঃই জীবনের উন্নত হইতে উন্নততর অবস্থা লাভ করিতে লাগিলেন। তাঁহার হৃদয় ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিরকুমারী থাকিয়া শুধুই সাধন এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের সেবা করিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প হইয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে মুসলমান সাধকগণ রাবেয়ার তপস্যা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার জীবনে ধর্ম্মের বিকাশ ও প্রেমের স্ফূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিলেন। তাপসমালার লেখক লিখিয়াছেন—"তাঁহার নামে সকলে মস্তক অবনত করিত, তাঁহার দর্শন ও উপদেশ বাক্য শ্রবণের জন্য তাঁহার নিকট বহু লোকের সমাগম হইত, সকলেই তাঁহার জীবনের প্রভাব দেখিয়া ও তাঁহার মুখনির্গত তেজোময় বাক্য শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইত। মহর্ষি হোসেন বলিয়াছেন যে, রাবেয়া শিক্ষা না পাইয়া কাহারও উপদেশ শ্রবণ না করিয়া মনুষ্য-সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় অন্তরে অলৌকিকরূপে ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করিতেন।"

তখনও রাবেয়ার বিবাহের বয়স চলিয়া যায় নাই। তিনি ইচ্ছা করিলেই, কোন ধার্ম্মিক ও সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন

হইতে পারে। এজন্য রাবেয়ার হিতৈষী সাধক হোসেন বসোরী তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন—"আপনার কি পরিণয়ের অভিলাষ আছে?"

রাবেয়া কহিলেন—"আমার শরীর ঈশ্বরকেই অর্পণ করিয়াছি। আমার এ দেহ তাঁহারই আজ্ঞার অধীন। আমার এ হস্ত তাঁহারই কার্য্যে রত। বিবাহের আর সম্ভাবনা কোথায়?"

রাবেয়া যে বাসনার উপর জয়লাভ করিয়া আমিত্বকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং ঈশ্বরের হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়াছেন;—সে বিষয়ে হোসেন বাসরীর আর কোন সংশয় রহিল না। তাই তিনি রাবেয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি জীবনের এইরূপ উচ্চ অবস্থা কিরূপে লাভ করিয়াছেন?"

রাবেয়া কহিলেন—"আমি যাহা কিছু পাইয়াছিলাম, সমস্তই হারাইয়া ঈশ্বরকে পাইয়াছি।"

একবার একটি লোক আসিয়া রাবেয়াকে প্রশ্ন করিল—"আপনি যে ঈশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাকে কি দেখিয়া থাকেন?"

রাবেয়া কহিলেন—"আমি ঈশ্বরকে না দেখিলে তাঁহার পূজা করিতাম না।"

তপস্বিনী নারীর এই সকল উক্তি পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ধর্ম্মের একটি অতি উন্নত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধনপরায়ণা রমণীর জীবন শুধু এই অবস্থার মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকে নাই। ঈশ্বর মানুষের আত্মাকে অমর করিয়া সম্মুখে অনন্ত উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। যে ভাগ্যবান্ পুরুষ ও সৌভাগ্যবতী নারী ঈশ্বরের অসীম করুণা লাভ করিয়া সাধনের অনন্তপথে যাত্রা করেন, কোথায় গিয়া যে তাঁহার উন্নতির শেষ হইবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তপস্বিনী রাবেয়া সংসারের আর সমস্ত কথাই বিস্মৃত হইয়া সাধনের

সেই অফুরন্ত পথেই চলিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁহার আত্মা নিগূঢ় যোগে যুক্ত হইতে লাগিল।

রাবেয়ার জীবনের যখন এইরূপ উন্নত অবস্থা, তখন সুফিয়ান নামক একজন সাধক তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তপস্বিনীকে কোন রকম সুমিষ্ট ফল অথবা কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন খাওয়াইতে তাঁহার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল। মনের বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য রাবেয়াকে প্রশ্ন করিলেন, "আর্য্যে, আপনার কি খাইতে ইচ্ছা হয়?"

রাবেয়া কহিলেন—"আমি ত ঈশ্বরের দাসী। দাসীর আবার নিজের ইচ্ছা কি? আমি যাহা ইচ্ছা করি, আমার প্রভুর ইচ্ছার বিরোধী হইলে তাহা অবৈধ।"

সুফিয়ান বলিয়াছেন—"এক দিবস রজনীতে আমি রাবেয়ার নিকটে ছিলাম। তিনি সমগ্র নিশা উপাসনায় যাপন করিলেন। আমিও এক প্রান্তে থাকিয়া উপাসনা করিলাম।"

এই সময়ে একদিন রাবেয়ার অসুখ করিয়াছিল। একটি লোক কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"আপনার অসুখের কারণ কি?"

রাবেয়া কহিলেন—"প্রাতঃকালে আমার মন স্বর্গের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল, সেজন্য আমার সখা আমাকে ভৎ‍র্সনা করিয়াছেন; এই রোগ সেই ভৎ‍র্সনার ফল।"

রাবেয়া শুধু যে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া বাস করিতেন, তাহা নয়। তাঁহার অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রেমিক হাফেজের মতই ঈশ্বরকে সখা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ভক্তসাধকের ন্যায় ঈশ্বরই তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব হইয়াছিল। তিনি প্রেমময়ের চরণে আপনার জীবন যৌবন সমস্তই অর্পণ

করিয়াছিলেন। তাই তপস্বিনী প্রার্থনা করিতেছেন—"তুমিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছুই চাহি না। হে ঈশ্বর, যদি নরকের ভয়ে তোমার পূজা করি, আমাকে নরকানলে দগ্ধ কর। যদি স্বর্গের লোভে তোমার সেবা করি, আমার পক্ষে তাহা অবৈধ কর। যদি শুদ্ধ তোমার জন্য তোমার পূজা করিয়া থাকি, তবে তোমার সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে দর্শন করিতে আমাকে বঞ্চিত করিও না।"

রমণীর কি চমৎকার নিষ্কাম প্রার্থনা! তাঁহার মন্‌টা যে পৃথিবীর ধূলা হইতে অনেক উপরে উঠিয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নাই।

অতঃপর তপস্বিনীর উন্নত জীবনের আলোকরশ্মি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহার কণ্ঠ হইতে ধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী বাহির হইতে লাগিল। তখন রাবেয়ার প্রেমোজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখিলেও নয়ন সার্থক হইত। তাই বিস্তর ধর্ম্মপিপাসু লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং তাঁহার উপদেশ শুনিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। রাবেয়ার কণ্ঠোচ্চারিত সত্যবাণী তাঁহাদের অন্তরে ধর্ম্মের একটি জীবন্ত ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিত।

রাবেয়া কঠোর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনার অন্ন বস্ত্রের চিন্তা মনেও স্থান দিতেন না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিতেন। ধনীরা তাঁহার ক্লেশ নিবারণের জন্য, টাকা লইয়া দ্বারের কাছে দণ্ডায়মান থাকিতেন, তিনি কিছুতেই অর্থ গ্রহণ করিতেন না। এ বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি।

একবার একটি ধনীলোক কিছু টাকা লইয়া রাবেয়ার কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি যে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীকে মুখ

স্ফুটিয়া কিছু বলিবেন, সে সাহস তাঁহার ছিল না। তাই তিনি সাধক হোসেন বসোরীকে ধরিয়া, আপনার মনের অভিলাষ রাবেয়াকে জানাইলেন। রাবেয়া যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে— "যাহার আত্মাতে প্রেমের উচ্ছ্বাস, তাহার যাহা কিছু আবশ্যক, প্রেমের দেবতা স্বয়ং ঈশ্বরই উহা অর্পণ করিবেন।"

রাবেয়া জীবনের শেষ অবস্থায় ধর্ম্মের অতি উন্নত স্তরে বাস করিতেন। ভক্তেরা বলিয়া থাকেন, সাধক সাধনের উচ্চতম অবস্থায় যখন অসীমসুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করেন; তখন তাঁহার হৃদয় ভূমানন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। তাহার তুলনায় এই পৃথিবীর সৌন্দর্য্য ও সুখ অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। তপস্বিনী রাবেয়া জীবনে ধর্ম্মের এইরূপ একটি স্পৃহণীয় অবস্থা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে এক দিনের একটি সুন্দর ঘটনা বর্ণনা করিতেছি।

একবার বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব হওয়ায় রাবেয়ার কুটীরের সম্মুখস্থ কুসুমিত তরু ও পুষ্পিতা লতা নিরুপম শোভায় শোভিত হইয়াছিল। একদিন জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শুভ্র আলোক পুষ্পস্তবক ও হরিদ্বর্ণ পত্রের উপর পড়ায়, উহার দৃশ্য অতিশয় মনোহর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই একটি রমণী রাবেয়াকে কহিলেন—"তপস্বিনি, একবার বাহিরে আসুন; আসিয়া দেখুন, কি রমণীয় শোভা!"

তৎকালে তপস্বিনী রাবেয়া ধ্যানস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে অসীমসুন্দরের আবির্ভাব হওয়ায়, প্রাণমন সৌন্দর্য্যে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই তিনি রমণীকে বলিলেন—"তুমি একবার আমার প্রাণের ভিতরে আসিয়া দেখ, ঈশ্বরের কি অতুলনীয় সৌন্দর্য্য!"

রাবেয়ার মৃত্যুবিষয়ে তাপসমালা গ্রন্থের মধ্যে কোন কথাই

পাঠ করা যায় না। কিন্তু পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "অদ্বৈতবাদ" গ্রন্থের একটি স্থানে লিখিয়াছেন—"খ্রীষ্টাব্দ ৮২০ সালে বা তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে আবু সৌদ আবুল বের কর্ত্তৃক সুফী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তপস্বিনী রাবেয়া, সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ববর্ত্তিনী। তিনি হিজিরা শকের ১৩৫ অব্দে পরলোক-বাসিনী হন।"

তপস্বিনী এলিজাবেথ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও বাগ্‌দান

এলিজাবেথ হাঙ্গারীর রাজকন্যা। তিনি ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার স্নেহময় পিতা আনৃক্রু হাঙ্গারীর রাজা হইয়া সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার পবিত্র চরিত্র ও সহিষ্ণুতা-গুণের জন্য সকলেই তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। রাণীর জীবন ধর্ম্মভূষণে ভূষিত ছিল এবং তাঁহার চরিত্রে নানা সদ্‌গুণ লক্ষিত হইত। এই রাণীর পিতৃকুলের একটি রমণী তপস্বিনী ছিলেন। তাঁহার জীবনকুসুমের সৌরভে রাণীর চিত্ত পবিত্র এবং মধুময় হইয়া উঠিয়াছিল। সেই তপস্বিনীর পুণ্যফলেই যেন এলিজাবেথ হৃদয়ে স্বর্গের মাধুরী লইয়া কোন্ এক পবিত্রতার দেশ হইতে পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

রাজকুমারীর জন্মবিষয়ে একটি বড় আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে। তিনি যে দিন জন্মগ্রহণ করেন, সেই দিন জর্ম্মানীর অন্তর্গত সাক্সনীর রাজসভায় একজন জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। সকলেই মনে করিতেন, এই পণ্ডিত অনেক রকম অদ্ভুত কথা বলিতে পারেন। তাই রাজ্যের বিস্তর লোক একটা আশ্চর্য্য নূতন কথা শুনিবার জন্য পণ্ডিতের কাছে উপস্থিত হইল।

পণ্ডিত গম্ভীরস্বরে কহিলেন—"আজ তোমাদিগকে একটি বড় সুখের সংবাদ শুনাইব। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতেছি, হাঙ্গারীতে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিতেছে। উহার আলোক সর্ব্বাগ্রে তোমাদের রাজপ্রাসাদে, তাহার পরে সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িবে। এখনই হাঙ্গারীর রাজার একটি সুলক্ষণা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির কথা দেশবিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িবে। তিনি আপনার ধর্ম্মজীবনের দ্বারা খ্রীষ্টীয় জগৎকে আলোক, আনন্দ, আশা ও সান্ত্বনা দান করিবেন।"

এই জ্যোতিষী পণ্ডিতের ভবিষ্যদ্বাণীর সময়ে এলিজাবেথ জন্মগ্রহণ করিলেন। তাই তাঁহার পিতা ও মাতার হৃদয় বিস্ময়ে ও পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহারা খুব ঘটা করিয়া কন্যার নামকরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমারীর নাম এলিজাবেথ রাখা হইল। রাণী ছোট মেয়েটিকেই অতিশয় যত্নের সহিত ধর্ম্মের সহজ কথাগুলি শিখাইতে লাগিলেন। অন্য ছেলে মেয়ে গল্প শুনিয়া যে রকম খুসী হয়, রাজকুমারী বাইবেলের সুমিষ্ট উপদেশ ও যিশুর জীবনের পবিত্র কাহিনী শুনিয়া সেই রকমই খুসী হইতেন। এই সময়েই তাঁহার সরল হৃদয়টুকু করুণায় ভরিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কাহারই দুঃখ সহিতে পারিতেন না। ভিখারীরা রাজকুমারীর কাছে আসিয়া করুণ-স্বরে তাঁহাদের দুঃখের কথা বলিত, আর বালিকার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া অশ্রুধারা ঝরিয়া যাইত। বালিকা অতি অল্প বয়সেই দুখানি হাত যোড় করিয়া আধ আধ স্বরে প্রার্থনা করিতেন। লোকেরা এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে ভাবিত, তবে কি সত্য সত্যই রাজকুমারী এলিজাবেথ একটি দেববালিকা?

আমরা সাক্সনীরাজ্যের উল্লেখ করিয়াছি। হারমেন সেই রাজ্যের

শক্তিশালী ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। হাঙ্গারীর রাজকুমারীর বিষয়ে সম্ভব ও অসম্ভব নানা কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি তাঁহাকে পুত্রবধূরূপে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। রাজকুমার লুই নির্ম্মল ও মধুর স্বভাবের জন্য রাজ্যের সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে এলিজাবেথের বিবাহ হইলে, মণি ও কাঞ্চনের যোগের ন্যায় বিবাহ-মিলনটি যে অতীব সুশোভন হইবে, সে বিষয়ে রাজার আর কোন সন্দেহ রহিল না। তাই তিনি নৃপতি আনড্রুর নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্য কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে হাঙ্গারীতে পাঠাইয়াদিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে কয়েকটি বড় ঘরের মেয়েকেও পাঠানো হইল। বিবাহ ঠিক হইলে, তাঁহারা রাজকুমারীকে সমাদরের সহিত সাক্সনীতে লইয়া আসিবেন। এই সময়ে বোধ হয় রাজপরিবারে বিবাহের এক অদ্ভুত রীতি প্রচলিত ছিল। রাজকুমার ও রাজকুমারীদের অল্প বয়সে বিবাহ ঠিক হইলে, প্রথম বাগ্‌দান হইত; তাহার পরে রাজকুমারী ভাবী শ্বশুরের পরিবারেই বাস করিতেন। যখন পাত্র ও পাত্রীর বিবাহের উপযুক্ত বয়স হইত, তখনই বিবাহ হইয়া যাইত।

রাজা হারমেনের প্রেরিত পুরুষ ও মহিলাগণ হাঙ্গারীরাজ্যে উপনীত হইয়া সেখানকার রাজা ও রাণীর নিকট বিবাহের প্রস্তাবটি উপস্থিত করিলেন। ইটি যে একটি উত্তম প্রস্তাব, সাক্সনীর রাজকুমারই যে এলিজাবেথের যোগ্য পাত্র, সে বিষয়ে রাজার দ্বিধা করিবার কোন কারণ রহিল না। কিন্তু হায়, স্নেহ-মুগ্ধ-পিতা কোন্ প্রাণে শিশু কন্যাকে মাতৃবক্ষচ্যুত করিয়া নিতান্ত অপরিচিত লোকের কাছে পাঠাইয়া দিবেন? স্নেহের প্রতিমা বালিকা যে তাঁহার হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তিনিই বা কন্যাকে

না দেখিয়া সুস্থির থাকিবেন কেমন করিয়া ? যে বীরের হৃদয় রণক্ষেত্রে শত্রুর শাণিত তরবারি দেখিয়াও বিচলিত হয় নাই, আজ কন্যাকে দূরে পাঠাইবার কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। কিন্তু বুদ্ধিমতী রাণী রাজাকে কহিলেন,—"এই প্রস্তাবটি কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করা যায় না। এলিজাবেথের বিবাহের জন্য এ রকম একটি রাজপরিবার আর কোথাও পাওয়া যাইবে না।"

রাণীর একান্ত অনুরোধেই রাজা বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। এই উপলক্ষে রাজপরিবারে কয়েক দিন ভোজ ও আনন্দোৎসব হইল। তাহার পরে রাজা রত্নমণি-ভূষণে সুসজ্জিতা কন্যাকে সাক্সনীর লর্ড ভেরিলার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কহিলেন—"আমি আমার জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রত্নটি আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি।"

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি লর্ড ভেরিলা মাথা নত করিয়া রাজকুমারীকে গ্রহণ করিলেন। তিনি ও তাঁহার সঙ্গের মহিলাদিগের অন্তরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা রাজকুমারীকে লইয়া আপনাদের রাজ্যে উপনীত হইলেন।

ক্ষুদ্র বালিকা এলিজাবেথকে রাজা হারমেন ও রাণী সোফিয়ার নিকট উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া সমাদরের সহিত রাজকুমারীকে গ্রহণ করিলেন। রাজা উৎফুল্লনয়নে সরলা বালিকার করুণ ও কচি মুখখানির দিকে চাহিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বালিকাকে কোলে লইয়া হৃদয়ের সমস্ত মমতা তাঁহার অন্তরে ঢালিয়া দিলেন। ইহার একদিন পরেই রাজ্যের বিস্তর মান্যগণ্য লোক রাজপ্রাসাদে সমবেত হইলেন। রাজকুমার লুইয়ের সঙ্গে এলিজাবেথের বিবাহের বাগ্দান ব্যাপারটি সম্পন্ন হইয়া গেল।

বৃন্তচ্যুত কুসুম যেরূপ বৃক্ষের স্নেহ হইতে বঞ্চিত হয়, বালিকা এলিজাবেথ পিতৃমাতৃ স্নেহ হইতে সেই রকমই বঞ্চিত হইলেন বটে; কিন্তু তিনি রাজা হারমেনের হৃদয়ের অনেকখানি অধিকার করিয়া বসিলেন। ধার্ম্মিক রাজা দিনের পরে দিন এই রাজকুমারীর সরলতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাস, ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ও দুঃখীর প্রতি দয়া দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে লাগিলেন। রাজা স্বয়ং এবং তাঁহার আত্মীয়া পোলাণ্ডের সাধিকা রাণী বালিকার অন্তরে ধর্ম্মভাব ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। এলিজাবেথ পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া আসার দুই বৎসর পরে, তাঁহার জননীর মৃত্যু হইল। সেই সাধ্বী নারী স্বামীকে ষড়যন্ত্রকারী শত্রুর হস্ত হইতে বাঁচাইতে গিয়া নিজেই আততায়ীর তরবারির আঘাত মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। জননীর মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া বালিকার মনটুকু একেবারে উদাস হইয়া গেল। এই সময় হইতেই তিনি ধর্ম্মের জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; সকলের চেয়ে ঈশ্বরকেই বেশি ভালবাসিবেন, ইহাই তাঁহার সংকল্প হইয়া দাঁড়াইল।

তখন বড় ঘরের সাতটি মেয়ে এলিজাবেথের সঙ্গিনী হইয়া তাঁহার সহিত খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদ করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এলিজাবেথ তাঁহাদের সঙ্গে কি আর খেলাধূলা করিবেন? তিনি ঐ সকল মেয়েদের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে গোরস্থানে উপস্থিত হইয়া বলিতেন—"যাঁহাদের দেহ এই কবরের মধ্যে প্রোথিত আছে, তাঁহারা ত আমাদের মতই ছিলেন। আমরাও তাঁহাদের ন্যায় পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইব। এস, এখানে নতজানু হইয়া প্রার্থনা করি।" এই কথার পরেই বালিকা প্রার্থনা করিতেন—"হে প্রভু, আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর।"

পূর্ব্বকালে খৃষ্টানগণ মহাত্মা যিশুর বারজন প্রেরিত শিষ্যের মধ্যে একজন সাধুকে জীবনের রক্ষক বলিয়া মনে করিতেন। এলিজাবেথ সাধু জনকে আপনার রক্ষক বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি সাধু জনের স্বর্গীয় আত্মার প্রিয়পাত্রী হইবার জন্য আপনার হৃদয়কে পবিত্র রাখিতে, অন্তর বিশ্বাসে ও প্রেমে পূর্ণ করিতে ও দয়াবতী হইতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন। মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন, "দয়াবানেরা ধন্য, কারণ তাহারাই ঈশ্বরের করুণা প্রাপ্ত হইবে।" যিশুর এই বাণী মায়ামন্ত্রের ন্যায় এলিজাবেথের হৃদয়ের উপর আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করিত। বালিকা মুর্ত্তিমতী দয়া হইয়া উঠিতেন। একদিন ত তিনিই রাজ্যের রাণী হইবেন; তবুও এলিজাবেথ রাজবাড়ী হইতে খাদ্যসংগ্রহ করিয়া নিঃসঙ্কোচে দরিদ্রদিগের কাছে যাইতেন এবং ক্ষুধার্ত্তদিগকে আহার করাইয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাণী

এলিজাবেথের বয়স এখনো অতি অল্প। কিন্তু তবুও তিনি জানিতেন, তাঁহার ঈশ্বর নিরন্তর প্রাণের কাছে থাকিয়াই তাঁহাকে ভালবাসিতেছেন, এবং করুণা বিতরণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া রাজা হারমেন আপনার প্রাণভরা ভালবাসায় এই পরের মেয়েটিকে ঘরের কন্যা করিয়া লইয়াছিলেন। এজন্য বালিকা একটি অপরিচিত রাজপরিবারে আসিয়াও আপনার মুখের হাসি ও মনের প্রসন্ন ভাব

রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নয় বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতেই পিতৃতুল্য রাজা হারমেনের মৃত্যু হইল। এই ঘটনায় বালিকার হৃদয় বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এখন স্বর্গীয় রাজার পত্নী রাণী সোফিয়া এলিজাবেথের ভার গ্রহণ করিলেন। বালিকা যে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া মাতিয়া উঠেন, তাহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। এলিজাবেথ ত আর কিছুদিন পরেই একটি রাজ্যের রাণী হইবেন; সেই জন্ত সোফিয়া তাঁহাকে স্থচতুরা হাস্তকৌতুকময়ী রত্ন-লঙ্কার-বিভূষিতা সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা রাজরাণীর মতই দেখিতে চাহিতেন।

এলিজাবেথ কিছুতেই রাজ-পরিবারের মহিলাদিগের মনের মত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বর তাঁহাকে ত রাণী হইবার জন্ত সংসারে পাঠান নাই; তিনি সাধন করিয়া ভক্তিলাভ করিবেন, তাঁহার প্রীতি ও করুণায় দুঃখীর দুঃখ দূর হইবে, শান্তিহারা নরনারীর হৃদয় জুড়াইয়া যাইবে, এই জন্তই তাঁহার জন্ম। অথচ তাঁহার প্রকৃতিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া পিটিয়া তাঁহাকে রাণী তৈয়ী করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। কিন্তু লোকের বৃথা চেষ্টা। এলিজাবেথ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়া ধর্ম্মকে আরো দৃঢ়তার সহিত বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড এলবান বাটলার সেণ্টদিগের জীবনচরিত গ্রন্থে লিখিয়াছেন, অসহায়া এলিজাবেথ বড়ই নির্য্যাতন সহ্য করিতেন। তখন রাজকুমার লুই শিক্ষার জন্ত বিদেশে বাস করিতেছিলেন; কেই বা বালিকার মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবে? কেই বা অত্যাচার নিবারণ করিবে? রাজকুমারী দুঃখ কষ্টের মধ্যে, ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর ভাবে আত্মাকে মিলিত করিতেন ও তাঁহার মধ্যে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাহা ছাড়া (১) শান্তভাব (২) বিনয় (৩) সহিষ্ণুতা (৪) মৈত্রী—

এই চারিটি তাঁহার সাধনের বিষয় ছিল। তিনি উহা লাভ করিবার জন্য নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন। এই সময়ে যে সকল ঘটনা ঘটিত, তাহার দুই একটির উল্লেখ করিতেছি।

একবার একটি খ্রীষ্টিয় পর্ব্ব উপস্থিত হইল। সে দিন রাণীর আদেশে এলিজাবেথ বসনভূষণে সুসজ্জিতা হইলেন। তাঁহার অঙ্গে স্বর্ণখচিত মূল্যবান পরিচ্ছদ ও মস্তকে মণিমুক্তা শোভিত মুকুট শোভা পাইতে লাগিল। তিনি ঠিক্ রাণীর মতই উপাসনামন্দিরে প্রবেশ করিলেন। তখন হঠাৎ খ্রীষ্টের মৃত্যুমুখ একখানি ছবির দিকে তাঁহার চোখ পড়িল। তিনি তৎক্ষণাৎ মুকুট খুলিয়া রাখিয়া মস্তক নত করিয়া, সজলনয়নে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুবিন্যস্ত সুদীর্ঘ কেশরাশি পৃষ্ঠে, ললাটে ও মুখের উপরে ছড়াইয়া পড়িল। রাণী সোফিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন—"তুমি কি মুকুটের ভার বহিতে পার না নাকি? অমন করিয়া খালিমাথায় চুলগুলি ছড়াইয়া দিয়া নুইয়া পড়িলে কেন? এই সব দেখিয়া লোকেরা যে কত নিন্দা করে, তাহা কি শুনিতে পাও না?"

এলিজাবেথ নম্রমুখে বিনীতভাবে কহিলেন—"আমাদের প্রভু যিশুর মাথায় কাঁটার মুকুট, আর আমি তাঁহারই সেই ছবির সাম্‌নে সোণার মুকুট পরিয়া উপাসনায় বসিব? তাহা হইলে কি প্রভুর অপমান করা হইবে না? আমি ত তাহা পারিব না, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।"

বালিকা এই কথা বলিয়াই খ্রীষ্টের মৃত্যুকালের যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। রাণীর কন্যা রাজকুমারী আগ্‌নেস এলিজাবেথের এই সকল কার্য্য মোটেই পছন্দ করিতেন না। তিনি একদিন বালিকার মুখের সাম্‌নেই বলিলেন—"তুমি আর

আমার ভায়ের স্ত্রী হইবার আশা করিও না। এই রাজবাড়ীর চাকরাণী হইলেই তোমাকে বেশ মানাইবে।”

কিন্তু রাজকন্তার এই সমস্ত কথা একেবারেই বাজে খরচ হইতে লাগিল। রাজকুমার লুই বিদেশে শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি বীর, ধীর, উদার ও নির্ভীক। অথচ তাঁহার মহৎ হৃদয় স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। রাজবাড়ীর মেয়েরা তাঁহার কাণের কাছে ক্রমাগত এলিজাবেথের নিন্দা আরম্ভ করিত, আর তাঁহার হৃদয় অসহায়া বালিকার দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িত। তিনি আপনমনে বলিয়া উঠিতেন—“আমার প্রাণের বালিকা, আমি যেমনটি চাই, তুমি ঠিক্ সেই রকম হইয়াই ফুটিয়া উঠিতেছ। তোমার জীবনকুসুমের সৌরভ একদিন আমার হৃদয়কে পুলকিত করিবে এবং রাজসিংহাসনের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে।”

রাজকুমার একদিন লর্ড ভেরিণার প্রশ্নোত্তরে বলিলেন—“ঐ যে গগনস্পর্শী পর্ব্বত, কেহ যদি উহাকে স্বর্ণমণ্ডিত ও মণিমাণিক্যে সুশোভিত করিয়া, আমাকে বলে, তুমি এলিজাবেথকে ত্যাগ করিয়া ঐ পর্ব্বতকে গ্রহণ কর; আমি সেই পর্ব্বতকে অতি তুচ্ছ সামগ্রী মনে করিয়া, একান্ত শ্রদ্ধার সহিত এলিজাবেথকেই গ্রহণ করিব? আমার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ধনরত্নের চেয়ে ধর্ম্মই অধিক মূল্যবান পদার্থ।” ইহার পরে রাজকুমার একদিন বহুমূল্য প্রস্তরখচিত একখানি কাচ এলিজাবেথের নিকট প্রেরণ করিলেন। ঐ কাচের একটি দিক খুলিলেই তন্মধ্যে যিশুর একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখা যাইত। রাজকুমার এলিজাবেথের ম্লান মুখখানি স্মরণ করিয়া সকল সময় দূরে থাকিতে পারিতেন না। এক একদিন প্রেমোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া বালিকার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেন এবং মনের প্রীতি মুখের ভাষায় মিশাইয়া

কহিতেন—"কিছু দিন অপেক্ষা কর, তোমার এ দুঃখ আর থাকিবে না।"

কে বলিবে, স্নেহবঞ্চিতা বালিকা এই অল্প কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া রাজকুমারের কতখানি প্রেম অনুভব করিতেন এবং তাহার কোমল হৃদয়ে কতটা প্রীতি ও পুলকের উদয় হইত?

১২১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমার লুইয়ের নাবালকত্ব চলিয়া গেল। ঐ সময়ে তাঁহার বয়স উনিশ বৎসর। ১২২০ খৃষ্টাব্দে ওয়ার্টবার্গ প্রাসাদের গির্জ্জায় খুব জাঁক জমকের সহিত লুই ও এলিজাবেথের বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন রাজকুমারের বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাট এবং সুন্দর মুখচ্ছবি দেখিয়া তাঁহাকে একজন তেজস্বী বীর ও সুপুরুষ বলিয়া মনে হইত। তাঁহার সাহস, বীরত্ব, বিনয় এবং হৃদয়ের মহত্ত্ব ও ধর্ম্মভাবের সহিত অনেক সদ্‌গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি পাপকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। পাছে বা কোনরূপ অপরাধ হয়, সেজন্য রাজকুমার কখনই বেশি কথা বলিতেন না।

অনেক দুঃখ নির্যাতনের পরে, এলিজাবেথ ধার্ম্মিক ও হৃদয়বান্ স্বামীর সহিত মিলিত হইলেন। সরলা বালিকা মনের আনন্দোচ্ছ্বাস আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট স্বামীর প্রেম এমন পূর্ণ, এমন পবিত্র, এমন প্রাণের সামগ্রী বলিয়া মনে হইল যে, এখন যেন পৃথিবীর কাছে বালিকার আর পাইবার এবং চাহিবার কিছুই নাই; একমাত্র স্বামীর প্রেমের মধ্য দিয়া, ঈশ্বর যেন তাঁহাকে সমস্ত পার্থিব ঐশ্বর্য্যই দান করিয়াছেন। লতা যেমন বৃক্ষকে আশ্রয় করে, তেমনি এলিজাবেথ স্বামীকে আশ্রয় করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। রাজকুমার লুই ধর্ম্মশীলা নারীর ভক্তি-কুসুম-সুরভিত সুপবিত্র হৃদয়টুকু অধিকার করিয়া এক অপার্থিব সুখ

সম্ভোগ করিতে লাগিলেন। সে সুখের কাছে রাজপ্রাসাদের রত্নমণি সকলই তাঁহার তুচ্ছ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। একটি শক্তিশালী ধার্ম্মিক যুবকের সহিত ভক্তিমতী ও প্রেমময়ী নারীর মিলন হইলে, তাঁহাদের দাম্পত্যজীবন যে এইরূপ আনন্দে ও অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পরেই রাজকুমার লুই এবং ধর্ম্মশীলা এলিজাবেথ রাজা ও রাণী হইলেন। তাঁহাদের চরণস্পর্শে স্বর্ণসিংহাসন যেন পবিত্র হইয়া গেল। এই সময়ে এলিজাবেথ সর্ব্বদাই স্বামীকে সুখী করিতে চেষ্টা করিতেন। রাজকর্ম্মে স্বামী ক্লান্ত হইয়া পড়িলে, পত্নীর সেবায় তাঁহার শরীর সবল ও হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিত। লুই স্থানান্তরে গমন করিলে, এলিজাবেথ বেশভূষা করিতেন না, ভাল খাবার জিনিসটি খাইতেন না, কোন কোন দিন একেবারে উপবাস করিতেন। তখন শুধুই উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহার সম্বল হইয়া দাঁড়াইত। এজন্য রাজপরিবারের মেয়েরা কতই পরিহাস ও নিন্দা করিত, কিন্তু এলিজাবেথ সকলই হাস্যমুখে সহিয়া যাইতেন।

এলিজাবেথের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন যেন সংসারের উপরে উঠিয়া যাইতে লাগিল। খ্রীষ্ট বলিয়াছেন—"তোমার সমস্ত হৃদয়, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তি দিয়া ঈশ্বরকে প্রীতি করিবে। তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মত প্রেম করিবে। এই দুই আজ্ঞা হইতে আর কোন শ্রেষ্ঠ আদেশ নাই।"

যিশুর এই দুইটি আদেশ পালন করিবার জন্য এলিজাবেথের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়া তাঁহাকে প্রীতি অর্পণ করিবার জন্য, উপাসনা ও প্রার্থনাকেই জীবনের সম্বল করিলেন। রজনীতে তাঁহার স্বামী শয়ন করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতেন;

কিন্তু এলিজাবেথের চোখে নিদ্রা কোথায় ? তিনি ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ভক্তিমতী নারী ধর্ম্মের উন্নত অবস্থা লাভ করিবার জন্য তৎকালের খ্রীষ্টান ধর্ম্মের কঠোর রীতিনীতি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। এজন্য তিনি কোন রকম কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করিতেন না। রেভারেণ্ড এলব্যান বাটলার লিখিয়াছেন, তাঁহার কৃচ্ছ্র-সাধন, সন্ন্যাসিনীদিগের তপস্যার চেয়েও কঠোর ছিল। তিনি রাজ-প্রাসাদে অতিথিদিগের সহিত স্বামীর পাশেই খাইতে বসিতেন। তাঁহারা উৎকৃষ্ট সামগ্রী আহার করিতেন; কিন্তু এলিজাবেথ মাংস খাইতেন না, কোন রকম উত্তম দ্রব্য খাইতেন না; শুধুই রুটি আর একটু মধু খাইতেন। স্বামীকে এবং অতিথিদিগকে সুমধুর গল্প এমনই মুগ্ধ করিয়া রাখিতেন যে, তিনি নিজে কোনরূপ উত্তম সামগ্রীই যে খাইতেছেন না, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতেই পারিতেন না। এলিজাবেথ স্বামীর অনুরোধেই দুই একদিন রাণীর পোষাক পরিতেন; নচেৎ সামান্য পরিচ্ছদই তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইত। সাধ্বী নারীর পবিত্র মূর্ত্তি দিব্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, সেজন্য সেই সামান্য পোষাকেই তাঁহাকে অসামান্যা নারী বলিয়া মনে হইত। "এলিজাবেথ" গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের একটি জায়গায় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—

"প্রেমে এখন এলিজাবেথের হৃদয় ভরপূর হইল। হৃদয়ের সেই সদ্য প্রেম এলিজাবেথ ঈশ্বরে অর্পণ করিলেন। তাঁহার বাল্যকালের দীনতা এখন দিনের পর দিন আরও গভীরতা লাভ করিতে লাগিল। তিনি সকলকেই অকাতরে প্রেম অর্পণ করিতেন; কিন্তু সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকেই প্রেম অর্পণ করিতেন। ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাস ছিল। আবার মণ্ডলীর সকল উপদেশ ও আদেশ একান্ত

বাধ্যতার সহিত পালন করিতেন। * * গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিলে, আনন্দের সহিত এলিজাবেথ গির্জ্জায় উপস্থিত হইতেন এবং ভক্তিভাবে পবিত্রচিত্তে তাঁহার প্রভুর অর্চ্চনা করিতেন। তিনি পর্ব্বদিনে বিশেষতঃ যিশুর দুঃখভোগের সপ্তাহে ধর্ম্মের কঠোর নিয়ম-বিধি সমস্তই পালন করিতেন। বৃহস্পতিবারে বার জন কুষ্ঠীর পদধৌত করিতেন; তৎপরে ভিখারিণীর বেশ ধারণ করিয়া অতি দীনভাবে, নগ্নপদে হাঁটিয়া গির্জ্জায় যাইতেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে, খৃষ্টের দুঃখভোগের কোন প্রতিকৃতির সমক্ষে নতজানু হইয়া ধ্যান ও প্রার্থনায় রাত্রি যাপন করিতেন। পুণ্য-শুক্রবার প্রভাতে তিনি আপন পরিচারকদিগকে বলিতেন—'আজ সকলের পক্ষেই বিশেষ দীনতার দিন; তোমরা কেহই আজ আমার প্রতি সামান্য সম্মানও দেখাইও না।' * * * ইহার পর তিনি সহরের মধ্যস্থ প্রশস্ত স্থানে গিয়া চতুর্দ্দিকস্থ অসংখ্য ভিক্ষুককে দান করিতেন।"

দুঃখী ও দরিদ্রের প্রতি এই করুণাময়ী নারীর যে কি ভালবাসা ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। এলিজাবেথের অন্তর হইতে যেন দয়ার ঝরণা নামিয়া যাইত; সেই নির্ঝরধারায় শত শত নরনারীর উত্তপ্ত হৃদয় শীতল হইত। এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল "দরিদ্রের রক্ষয়িত্রী।"

এলিজাবেথ এখন ত একটি রাজ্যের রাণী; তবুও তিনি অম্লানবদনে রাজপ্রাসাদের বাহিরে গিয়া দরিদ্র ও পীড়িত-লোকদিগের সন্ধান করিতেন। তিনি ঐ সকল লোকের ক্ষুদ্র কুটীরে গমন করিয়া, তাহাদিগকে ভালবাসা অর্পণ করিতে এবং তাহাদের চোখের জল মুছাইতে একটুও সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। বরঞ্চ দুঃখীর সেবাতেই তাঁহার চিত্ত সুখে পূর্ণ হইয়া উঠিত। এলিজাবেথ শুধুই যে তাহাদের

দেহের সেবা করিতেন, তাহা নয়। ঐ সকল নরনারীর আত্মার কল্যাণের জন্য, তাহাদের নিকট খ্রীষ্টের জীবনের কাহিনী সরল ভাষায় বর্ণনা করিতেন। এলিজাবেথ এক এক সময়ে নিজেই রাজবাড়ী হইতে খাদ্যসামগ্রী লইয়া দরিদ্রের কুটীরে উপস্থিত হইতেন। কুষ্ঠরোগীর কথা শুনিলেই ত আমাদের ভয় হয়; পাছে বা তাহাদের ছায়া আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করে, সেজন্য সঙ্কুচিত হইয়া দূরে সরিয়া যাই। কিন্তু এই রাণী স্নেহে হৃদয় পূর্ণ করিয়া কুষ্ঠরোগগ্রস্ত লোকের পাশে গিয়া বসিতেন। তাঁহার সুমধুর সান্ত্বনাবাক্যে হতভাগ্যদিগের জ্বালাময় হৃদয় ক্ষণকালের জন্য জুড়াইয়া যাইত। স্নেহময়ী রাণী স্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া রাজবাড়ীর নিকটেই একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিলেন। সেখানে আটাশ জন অসহায় রুগ্নব্যক্তি আশ্রয় লাভ করিল। রাণী তাহাদিগকে খাওয়াইয়া, তাহাদের সেবা করিয়া অন্তরে অনুপম তৃপ্তি লাভ করিতেন।

১২২৩ খ্রীষ্টাব্দে এলিজাবেথের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। সে দিন রাজপ্রাসাদে আনন্দোৎসবের আর সীমা রহিল না। কিন্তু এলিজাবেথ শুধু আমোদ-প্রমোদে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি একদিন গোপনে শিশুটিকে লইয়া সেণ্ট ক্যাথেরিণ গির্জ্জায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে শিশুকে ঈশ্বরের চরণে উৎসর্গ করা হইল। এলিজাবেথ প্রার্থনা করিলেন—"হে আমার ঈশ্বর, তুমি আমাকে এই শিশুটি দিয়াছ, আমি ইহাকে তোমারই চরণে অর্পণ করিতেছি। তুমি আমার এই শিশুকে গ্রহণ করিয়া, তোমার ভৃত্য করিয়া লও। ইহাকে তোমার স্বর্গের আশীর্ব্বাদ দান কর।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জীবনের আর এক অঙ্ক

আমরা এলিজাবেথকে সরলহৃদয়া, সেবাপরায়ণা, দয়াবতী ও ভক্তি-মতী নারী বলিয়াই জানি। প্রয়োজন হইলে তিনি যে রাণীর আসনে বসিয়া দৃঢ়তার সহিত আপন-কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, সে বিষয়ে বড় বড় রাজকর্ম্মচারীদিগের ভ্রূকুটি দেখিয়াও ভয় পান না;—পূর্ব্বে তাহা জানিতে পারি নাই, এবার জানিতে পারিব। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা লুই যুদ্ধের জন্য দূরদেশে যাত্রা করিলেন। কিছুদিন পরেই রাজ্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। বিস্তর লোক অনাহারে শীর্ণ হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কিন্তু রাজকর্ম্মচারিগণ বধির হইয়াই রহিলেন। তাঁহারা যে বিপন্ন লোকের সাহায্য করিবেন, তাহার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। কাজেই "দরিদ্রের রক্ষয়িত্রী" এলিজাবেথ আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্যের রাণীরূপে আপনার শক্তি প্রয়োগ করিলেন। তাঁহার আদেশে রাজকোষের ও রাজার শস্যাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল। এলিজাবেথ রাজপুরুষগণকে অগ্রাহ্য করিয়া দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগকে শস্য ও রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। বিপন্ন লোকেরা রাণীকে "ঈশ্বরের প্রেরিত স্বর্গের দূত" বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু রাজার ভ্রাতা হেনরী ও রাজপুরুষগণ রাণীর ব্যবহারে ক্ষুন্ন ও বিরক্ত হইলেন, তাঁহারা রাণীর কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহাদের প্রতিবাদ একেবারেই নিষ্ফল, রাণী কাহারো কথায় কর্ণপাতই করেন না; তখন ঐ সকল লোক রাণীকে ভয় দেখাইয়া বলিলেন— "আপনি যে কি অন্যায় কাজ করিতেছেন, একবার কেন তাহা ভাবিয়া

দেখিতেছেন না? এই অন্যায় কাজের কথা রাজার কর্ণে কি প্রবেশ করিবে না? তিনি কি এজন্য অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইবেন না? তখন কি আপনাকে দুঃখ ও মনোবেদনা সহ্য করিতে হইবে না?"

এলিজাবেথ কাহারো কথার কোন উত্তর দিতেন না, শুধুই হাস্য করিতেন এবং যাহা করিবার, তাহা নিঃসঙ্কোচে করিয়া ফেলিতেন। অগ্রেই রাণীর অর্থে ওয়াটবার্গ রাজপ্রাসাদের সন্নিকটে একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছিল; এই সময়ে তিনি শিশুদের জন্য উহার একটি স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিয়া দিলেন। অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে আসিয়া হাঁসপাতালের ঘরখানি পূর্ণ করিল। স্নেহময়ী এলিজাবেথ সেই ছেলে-মেয়েদের আদর করিয়া এক একটি দ্রব্য উপহার দিতেন। অসহায় শিশুগুলি তাঁহাকে "মা" "মা" বলিয়া ডাকিত। তিনি জননীর মত তাহাদিগকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিতেন।

রাণী শুধু এই কাজটুকু করিয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ঋণের জন্য যে সকল গরীব লোক জেলখানায় বন্দী ছিল, তিনি তাহা-দের মুক্তির চেষ্টা করিতেন। কতকগুলি কয়েদির পায়ে ভীষণ লৌহ-শৃঙ্খল ছিল। সেজন্য তাহাদের পায়ের স্থানে স্থানে ঘা হইয়াছিল। রাণী স্বহস্তে তাহাদের ঘা ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া, কাপড় দিয়া বাঁধিয়া দিতেন। ঐ সকল লোকের পাপের জন্য তাঁহার অন্তর হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইত। এজন্য কয়েদিরা তাঁহাকে "দয়ার দূত" বলিয়া মনে করিত।

রেভারেণ্ড এলবান বাটলার লিখিয়াছেন, "প্রতিদিন নয় শত গরীব লোক রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইত, এলিজাবেথ তাহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী দান করিতেন। তাহারা পেট ভরিয়া আহার করিত। রাণী ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কত অসহায় লোকেরই যে আহারের বন্দোবস্ত

করিয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে ? তাঁহার এই দয়া ও আশ্চর্য্য ধর্ম্মভাব দেখিয়া রাজার মন মুগ্ধ হইয়াছিল ; তিনি রাণীর উন্নত জীবনকে আদর্শ করিয়াই স্বীয় জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিতেন। এজন্য ইতিহাসে তিনি ধার্ম্মিক নরপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন।"

অনেক দিন পরে রাজা লুই আবার আপনার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। প্রজারা তাঁহাদের দয়াবান্ রাজাকে পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল। রাজকর্ম্মচারিগণ রাজাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া আসিলেন। কিন্তু রাণীর উপরে এখনো তাঁহাদের বিষম আক্রোশ। তিনি যে রাজপুরুষদিগকে মোটেই গ্রাহ্য করেন নাই, রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ দুই হাতে প্রজাদিগকে বিতরণ করিয়াছেন ;—সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নামে এই অভিযোগই উপস্থিত হইল। রাজা অভিযোগের কথা শুনিয়া, হাস্যমুখে কর্ম্মচারীদিগকে কহিলেন—

"রাণী কি করিয়াছেন ? রাজস্ব ত দরিদ্রদিগকে দান করেন নাই ?"

কর্ম্মচারীগণ নীরব রহিল। তাহার পরে রাজা বলিলেন—"রাণী ঈশ্বরের নামে যে কিছু ভাল কাজ করিতে চাহিবেন, তাঁহাকে তাহাই করিতে দিবে। এ বিষয়ে বাধা না দিয়া বরং তাঁহার সাহায্য করিবে। দরিদ্রকে ভিক্ষা দান করিলে কখনই রাজ্যের সর্ব্বনাশ হইবে না। আমরা ঈশ্বরের নামে মানুষকে যাহা অর্পণ করিব, ঈশ্বর তাহার চেয়ে অনেক বেশি আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করিবেন।"

রাজা লুই এলিজাবেথের নিকট গমন করিলেন। তাহার পরে হাস্যমুখে ও মধুরস্বরে বলিলেন—"দয়াময়ি, এই দুর্দ্দিনে তোমার গরীব লোকেরা কেমন আছে—বল ত ?"

চন্দ্রোদয়ে রজনী যেমন সৌন্দর্য্যময়ী হইয়া উঠে, তেমনি স্বামীর

আগমনে এলিজাবেথের মূর্ত্তি অতিশয় মনোহারিণী হইয়া উঠিল। রাজা লুই রাণীর প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় সুন্দর মুখখানি বারংবার দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনপ্রাণ আনন্দে আপ্লুত হইযা গেল।

কিন্তু হায়, পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর পরে যেমন অমাবস্যার নিবিড় অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি এলিজাবেথের সুখের দিনের পরে দুর্দ্দিন ঘনাইয়া আসিল।

১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপের অধিকাংশ রাজা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে যিরুশালেম তীর্থ উদ্ধারের জন্য যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাজা লুইয়ের মনে হইল, ইহা ধর্ম্মযুদ্ধ, এ যুদ্ধের জন্য খ্রীষ্টই তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন; সুতরাং তাঁহার যুদ্ধে যাওয়াই একান্ত আবশ্যক। তিনি রণক্ষেত্রে যাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। এই কথা পতিব্রতা এলিজাবেথের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ক্ষুদ্র বালিকার মত কাঁদিতে লাগিলেন। একদিন রাজা লুই যিরুশালেম-যাত্রী যোদ্ধাদের মত ক্রুশ ধারণ করিলেন। এলিজাবেথ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আর স্থিরভাবে দাঁড়াইতে পারিলেন না; একেবারে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞানলাভ করার পরে সরলা রমণী স্বামীর প্রীতিমাখা মুখখানির দিকেই চাহিয়া রহিলেন। এই এলিজাবেথই অতি অল্প বয়সে পিতা-মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্বশুরগৃহে বাস করিয়াছিলেন। আর আজ তাঁহার এই অবস্থা! তিনি স্বামীকে না দেখিয়া, শূন্য রাজপুরীতে বাস করিবেন কেমন করিয়া? স্বামী যদি রণক্ষেত্র হইতে আর ফিরিয়া না আসেন? সে কথা ভাবিতেও যে এলিজাবেথের প্রাণ শিহরিয়া উঠে! রাণী শুধুই অশ্রুজলে নয়ন-পল্লব সিক্ত করিতে লাগিলেন। রাজা লুই আর কোন্ কথা বলিয়া পত্নীকে সান্ত্বনা দান করিবেন? তিনি অনেক চিন্তা করিয়া কেবল একটি কথা খুঁজিয়া পাইলেন। রাজা কহিলেন—

"আমি যে যিশুর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার ধর্ম্মরক্ষার জন্য যুদ্ধে যাইতেছি। ইহা ত ঈশ্বরেরই কার্য্য।"

এলিজাবেথ বলিলেন—'স্বয়ং ঈশ্বরই যদি তোমাকে তাঁহার কাজের জন্য মনোনীত করিয়া থাকেন, তবে আমি আর কেমন করিয়া তোমাকে এখানে থাকিতে বলিব? তুমি ঈশ্বরের সেবা কর, তিনি তোমাকে শক্তি দান করুন। আমি তোমাকে ও আমাকে ঈশ্বরের নিকটই উৎসর্গ করিয়াছি। তাঁহার করুণা যেন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। আমি সর্ব্বদাই তোমার জন্য প্রার্থনা করিব। যাও তবে, ঈশ্বরের নামে চলিয়া যাও। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

রাজা লুইয়ের যুদ্ধে যাইবার দিন স্থির হইল। তিনি রাজকর্ম্মচারী ও প্রজাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, আত্মীয় স্বজনের নিকটও বিদায় গ্রহণ করিলেন; এইবার তাঁহাকে জননী ও পত্নীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে। কি এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার বুক যে ভরিয়া উঠিল, তাহা কে বর্ণনা করিবে? তিনি গম্ভীরভাবে জননী ও পত্নীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহার পরে একখানি হস্ত মাতার স্কন্ধের উপর এবং অপর হস্তখানি পত্নীর স্কন্ধের উপর রাখিলেন। তাঁহার বাষ্পরুদ্ধ-কণ্ঠ হইতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে একটি কথাও বাহির হইল না। কিয়ৎকাল পরে, তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া জননীকে কহিলেন—

"মা, তোমাকে দেখা-শুনার ভার, আমার দুই ভায়ের উপরেই রহিল। কিন্তু এলিজাবেথকে তোমার হস্তেই অর্পণ করিতেছি। তাহার মর্ম্মস্থানে যে কি বেদনা, তুমি ভিন্ন আর ত কেহই তাহা বুঝিবে না; আর কাহারো কাছে তাহার একটু স্নেহ পাইবারও আশা নাই।"

রাজা লুইয়ের সন্তানেরা পিতার সম্মুখেই দণ্ডায়মান ছিল। তাহারা সকলেই খুব ছোট। লুই পুনঃ পুনঃ সন্তানদিগকে দেখিতে লাগিলেন;

তাহাদিগের নিকট হইতেও বিদায় গ্রহণ করিলেন। এলিজাবেথ রাজপ্রাসাদে থাকিতে পারিলেন না; তিনি স্বামীর সঙ্গে রাজ্যের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত গমন করিলেন। অবশেষে বিদায়ের শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। তখন রাজা লুই বলিলেন—

"এলিজাবেথ, ঈশ্বরই তোমার রক্ষক। তিনি তোমার সহায় হউন। তিনি তোমাকে ধৈর্য্য ও সাহস দিন। তিনি সন্তানদিগকেও আশীর্ব্বাদ করুন। বিদায় হই, আমাদের পবিত্র প্রেমের স্মৃতি সযত্নে রক্ষা করিও; তোমার প্রার্থনার সময় আমাকে ভুলিও না। তবে বিদায়—বিদায়!"

রাজা লুই চলিতে লাগিলেন। কিন্তু এলিজাবেথের চলিবার শক্তি কোথায়? তিনি প্রস্তর মূর্ত্তির স্থায় স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর চাহিয়া চাহিয়া শুধু স্বামীকেই দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বামী অনেক দূরে চলিয়া গেলেন, দৃষ্টির সীমা অতিক্রম করিলেন; তখন এলিজাবেথকে রাজপ্রাসাদেই ফিরিয়া যাইতে হইল। সাধ্বী নারী আপনার অট্টালিকায় উপস্থিত হইয়াই, একে একে অঙ্গের আভরণ উন্মোচন করিলেন, মূল্যবান পরিচ্ছদ খুলিয়া রাখিলেন; বিধবার সামান্য পোষাকেই তাঁহার দেহ আচ্ছাদিত হইল। ইহার পরে তিনি যে আর কখনো জমকালো পোষাক পরিয়াছেন ও রত্নভূষণে অঙ্গ সুশোভিত করিয়াছেন, এমন শুনা যায় না।

রাজা লুই জাহাজে উঠিলেন। কে বলিবে কোথায় তাঁহার শরীরে বিষ প্রবেশ করিল? তিনি কয়েক দিন পরেই জ্বরে শয্যাশায়ী হইলেন। লুই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার আসন্নকাল উপস্থিত। তাই তিনি স্ত্রী ও সন্তানদিগের জন্য একটি উইল তৈরী করিয়া, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে অর্পণ করিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে বিশ্বাসের আলোকে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—

"দেখ দেখ, শ্বেত কপোতেরা আমার চারিদিকে উড়িতেছে। আমার আত্মা ইহাদের সঙ্গেই উড়িয়া যাইবে। ইহারা ত আমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছে।"

মুখের কথা ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ হইয়া গেল। রাজা লুই ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পরলোকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার প্রিয় সৈন্যগণ প্রভুকে হারাইয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

হায় পতিপ্রাণা এলিজাবেথ! তিনি কিরূপে এই নিদারুণ শোক সহ্য করিবেন? তাঁহাকে যখন স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনানো হইল, তখন তিনি কেমন এক অস্বাভাবিক স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"হে আমার প্রভু পরমেশ্বর, আজ তবে কি যথার্থই সংসার আমার নিকট মৃত?" তাহার পরে পতিপ্রাণা নারী উন্মাদিনীর ন্যায় আপনার অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ হইতে শুধু একটি কথা বাহির হইতে লাগিল—

"তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে—তাঁহার কি মৃত্যু হইয়াছে?"

রাণীর সহচরীগণ তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে এলিজাবেথের দেহের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল; তিনি ছিন্নলতার ন্যায় একটি মহিলার কোলের উপরে পড়িয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল পরে শোকার্ত্তা রমণী বলিতে লাগিলেন—"আমার ঈশ্বর, আমাকে ত সকলেই ত্যাগ করিয়া গেল। আমার শুধু তুমিই আছ; তুমি আমাকে সান্ত্বনা দাও, আমার মনকে দৃঢ় কর।"

এই সময়ে ধর্ম্মশীলা নারী ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তাঁহার প্রেমপূর্ণ বাণী শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন—"আমি যাহা করিয়াছি, তাহার গূঢ় রহস্য এখন বুঝিতে পারিবে না, পরে বুঝিতে পারিবে।"

এলিজাবেথ এখনো তরুণী নারী, তাঁহার এই শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িবারই কথা। কিন্তু তাঁহার প্রাণের দেবতা ঈশ্বরই তাঁহাকে শোক হইতে রক্ষা করিলেন। শুধুই বিশ্বাসের শক্তিতে ও ঈশ্বরের প্রেমে এই ভক্তিমতী নারীর চিত্ত স্থির হইল। তিনি দিনের পর দিন ঈশ্বরের প্রেমে ডুবিয়া, সংসার ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। এখন ধ্যান, প্রার্থনা ও দুঃখীদের সেবাতেই তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত। এই সময়ে রাজমাতা সোফিয়া বধূকে আর দূরে রাখিতে পারিলেন না। পুত্রশোকে তাঁহারও হৃদয় জ্বলিয়া পুড়িয়া যাইতেছিল। তিনি বধূকেই হৃদয়ের কাছে টানিয়া লইয়া একটুকু সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কাঙ্গালিনী

ঈশ্বর এলিজাবেথের জন্য সংসারে আর কিছুই রাখিবেন না, তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির করিয়া সম্পূর্ণরূপে আপনার দাসী করিবেন, ইহাই যেন তাঁহার ইচ্ছা। তাই রাজা লুইয়ের ভ্রাতা হেন্‌রীর ও রাজ-কর্ম্মচারীদিগের মন পাষাণে পরিণত হইল। এলিজাবেথ স্বামীকে আপনার মন্ত্রশক্তিতে ভুলাইয়া, রাজকোষের সঞ্চিত অর্থ দরিদ্রদিগের সেবায় উড়াইয়া দিয়াছেন। তিনি রাণী হইয়াও সামান্য লোকের সঙ্গে মেশেন এবং রাজপরিবারের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন না।

তাহারা এই [illegible] হইয়া উঠিয়াছে। [illegible]
পরে [illegible]
[illegible] এই [illegible] দিয়াছেন।
হেন্‌রী নবম পুত্রের রাজসিংহাসন অধিকার করিলেন। [illegible]
রাজপুত্রের উপর তাঁহার [illegible] প্রচারিত হইল। এলিজাবেথকে
[illegible] রাজপুত্রী ভাবে [illegible] চলিয়া যাইতে হইবে।
শুধু তাহাই নহে। রাজ্যের মধ্যে কেহ এলিজাবেথকে আশ্রয় দিলে,
তাহাকেও কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

এই আদেশ প্রচারিত হইবার পরে, হেন্‌রীর যমদূতের মত দুই জন
অনুচর অসহায়া এলিজাবেথের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা
বিধবারাণীকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিল—"রাণী এলিজাবেথ রাজা
লুইকে বঞ্চনা করিয়া রাজ্যের সর্বনাশ করিয়াছেন। [illegible]
অদ্যই রাজকোষ অর্থশূন্য। এই অপরাধের কঠিন শাস্তি তাঁহাকে মাথা
পাতিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার সম্পত্তি রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত
করা হইয়াছে। এখন এই মুহূর্তেই বিধবারাণীকে পুত্রসহ রাজ-
প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে।"

রাজমাতা সোফিয়া অনুচরদিগের স্পর্ধার কথা শুনিয়া জ্বলিয়া
উঠিলেন। তিনি এলিজাবেথকে আপনার বাহুর দ্বারা বেষ্টন করিয়া
কহিলেন—"এ যে আমারই পুত্রবধূ, আমার কাছেই আছে; আমার
নিকট হইতে কে ইহাকে কাড়িয়া লইবে? এমন সাহস কাহার?"

হেন্‌রীর [illegible] রাণীর [illegible] কথা [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

আছে। হায়, হেনরী আজ নির্দ্দয় হইয়া পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রীদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই রাণী এলিজাবেথই স্বামীর শোকে উন্মাদিনী হইয়াছিলেন; কিন্তু আজ এই দুর্দ্দিনে তাঁহার দুঃখ কোথায়? তাঁহার অশ্রুজল কোথায়? তাঁহার করুণ ও মধুর মুখখানি প্রশান্ত, হৃদয় স্থির; তিনি ধীরভাবে এই অভাবনীয় ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ত কোনই অপরাধ নাই, তাঁহার সন্তানেরা ত একেবারে নির্দ্দোষ; তবুও এমন অচিন্তনীয় ঘটনা কেন ঘটিল? নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে তাঁহার প্রেমের দেবতার গূঢ় অভিপ্রায়ই প্রচ্ছন্ন আছে। হেনরী আবার কে? সে ত উপলক্ষ্য মাত্র। পবিত্রহৃদয়া নারী হেনরীর উপর কোনরূপ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, কাহারো বিরুদ্ধেই তাঁহার কিছু বলিতে ইচ্ছা হইল না; তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন—"আমার প্রভু, তুমি আমাকে শান্তি দান কর। আমি যেন তোমারই নামে এই দুঃখ বহন করিতে পারি।"

এলিজাবেথ তিনটি সন্তান লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন। ছোট মেয়েটি তাঁহার ক্রোড়ে। আর দুইটি সন্তান ধীরে ধীরে মাতার সঙ্গেই চলিতে লাগিল।

সংসারে মানুষের জীবনখেলা এই রকমই বিচিত্র! কাল হয় ত এই সময়ে এলিজাবেথ রাণীর সম্মানই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুবৃহৎ অট্টালিকার সুরম্য প্রকোষ্ঠে তাঁহার সন্তানদিগের শয়নের জন্য, দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শুভ্র-শয্যা রচিত হইয়াছিল। কত দাস দাসী তাহাদের সেবা করিয়াছিল। আর আজ সেই রাজরাণী পথের কাঙ্গালিনী! আপনারও আশ্রয় নাই, সন্তানদিগেরও মাথা রাখিবার একটুও যায়গা নাই! রাণীর এই অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া একজন ধর্ম্মযাজক লিখিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে,

একমাত্র ঈশ্বরই সত্য, তাঁহার করুণাই সম্বল, তিনিই আমাদের, আমরাই তাঁহার। নচেৎ আর কোন্ পদার্থকে সত্য বলিতে পারি? কিই বা আমার চিরদিনের সম্বল? কেই বা আমাদের চিরদিনের আপনার?

দুরন্ত শীত। রাত্রিকাল। এলিজাবেথ শুধু দ্বারে দ্বারেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? হেন্‌রীর চর ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ বিধবাকে আশ্রয় দান করিলেই সে কথা রাজপুরুষদের কাণে উঠিবে, রাজার তলোয়ার তাহার মাথায় পড়িবে।

এলিজাবেথ নিরুপায় হইয়া এক সরাইখানায় একটি সামান্য লোকের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন। তিনি বলিলেন—"সংসারের সমস্ত সহায় হইতেই আমি বঞ্চিত হইয়াছি, এখন প্রার্থনাই আমার একমাত্র সম্বল রহিয়াছে।"

অসহায়া নারীর কথাগুলি কি মর্ম্মস্পর্শী! শুনিয়া মানুষটির মন একেবারে গলিয়া গেল। একখানি ঘরে শূকর থাকিত; লোকটি সেই ঘরখানি খালি করিয়া এলিজাবেথকে ছাড়িয়া দিল। বিপন্না জননী সন্তানদিগকে শীতের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সেই জঘন্য ঘরের মধ্যেই প্রবেশ করিলেন। ছেলেদের ক্লান্ত দেহ। তাহারা শুইয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। এলিজাবেথের চোখে আর নিদ্রা কোথায়? তিনি ছেলেদের পাশে বসিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই দুঃখের রজনীতেও উপাসনার মধ্য দিয়া তাঁহার অন্তরে আনন্দ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

যখন অনেক রাত্রি, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, তখন একটি আশ্রমের গির্জ্জায় ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। একদিন এলিজাবেথের ইচ্ছাতেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনিই মন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রচুর অর্থ দান

করিয়াছিলেন। বিধবা নারী এখন সন্তানদিগকে লইয়া সেই গির্জ্জা-ঘরেই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া প্রার্থনা উত্থিত হইল। সেই প্রাণস্পর্শী প্রার্থনাটি "এলিজাবেথ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রভু, তোমার পবিত্র ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। কাল আমি রাজরাণী ছিলাম, আমার কত সহায় ও সম্পদ ছিল। আজ আমি পথের ভিখারিণী, কেহ আমাকে একটু আশ্রয় দিতেও প্রস্তুত নয়। আমার শক্তি সম্পদের দিনে যদি আমি আরো তোমার সেবা করিতাম, তাহা হইলে এখন আমার কত সুখই হইত। দুর্ভাগ্য আমার!" ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা কহিল—

"মা, আমাদের কিছু খাবার দাও।"

দুঃখিনী নারী কোথায় খাদ্যসামগ্রী পাইবেন? তিনি ছেলেদের জন্য প্রার্থনাই করিলেন। তখন আর কিছুই করিবার শক্তিও ছিল না, সুবিধাও হইল না। দুঃখের প্রথম রাত্রি এই ভাবেই কাটিয়া গেল। পরদিন সকাল বেলায় ক্ষুধার্ত্ত শিশুরা বলিতে লাগিল—

"মা, এখানে কেন? আমরা বাড়ী যাইব। আমাদের রাজবাড়ীতে লইয়া চল।"

মা সন্তানদের কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিলেন; কিন্তু কে তাঁহাকে আশ্রয় দিবে? অবশেষে আশ্রমের ধর্ম্মযাজকই সাহস করিয়া দুঃখিনী রাণীকে একটু স্থান দান করিলেন। এলিজাবেথের সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই ছিল না, কেবল দুই একখানি গহনা ছিল মাত্র। তিনি সেই গহনা বন্ধক দিয়াই খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিলেন। তিনটি সন্তান ও একটি পরিচারিকা খাদ্যসামগ্রী পাইয়া বড়ই সুখী হইল।

কিন্তু এ আশ্রমেও এলিজাবেথের থাকিবার সুবিধা হইল না। রাজ-পুরুষেরা এ স্থান হইতেও তাঁহাকে তাড়াইয়া দিল। তিনি আর সন্তানদিগের দুঃখ সহিতে পারিলেন না; তাই তিনটি ছেলেমেয়েকেই দূরদেশের বন্ধুদিগের হস্তে অর্পণ করিলেন। তাহারা আশ্রয় লাভ করিল। এখন আর এলিজাবেথের তপস্যা ব্যতীত কিছুই করিবার রহিল না। তাই তিনি কৃচ্ছ্রসাধন আরম্ভ করিলেন। এক এক দিন ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপের মধ্যে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার মর্ম্মস্থান হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইত—"হে আমার প্রিয়, এ কি! তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার? আমি সম্পূর্ণরূপে তোমার? হে আমার ঈশ্বর, আমি যেন সমস্ত বস্তু অপেক্ষা তোমাকেই অধিক ভালবাসিতে পারি। আমার সমস্ত হৃদয় দিয়া, সমস্ত শক্তি দিয়া, স্মৃতি দিয়া তোমাকেই ভালবাসিতে দাও।"*

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেবা

এলিজাবেথের মামা একজন বিসপ। ভাগিনেয়ীর দুঃখের কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এলিজাবেথকে আপনার এলেকায় লইয়া আসিলেন। সেখানে একটি অট্টালিকায় বিধবা নারীর বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সন্তানবৎসলা জননী আবার ছেলেমেয়েদের আপনার কাছেই লইয়া আসিলেন। তখন মাতুল একদিন মমতায় পূর্ণ হইয়া

---

* রেভারেণ্ড এলবান বাটলার প্রণীত সেণ্টদিগের জীবনচরিতগ্রন্থ হইতে।

ভাগিনেয়ীকে কহিলেন—"এখনো তোমার অল্প বয়স। তুমি নিরাশ্রয়। তাই কোন সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত তোমার বিবাহ ঠিক্ করিতে চাই। এই প্রস্তাবে তুমি প্রসন্নমনে সম্মত হও।"

এলিজাবেথের মাতুল, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের সঙ্গে বিবাহবিষয়ে কথা বার্ত্তাও বলিয়াছিলেন। ঐ সময়ে সম্রাট বিপত্নীক ছিলেন। কিন্তু সাধ্বী নারী মাতুলের কথা শুনিয়া মোটেই সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন—"আমার স্বামী আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি আমার অতিশয় বিশ্বস্ত বন্ধু ছিলেন। আমি তাঁহার শক্তি, মান-সম্ভ্রম ও ধনসম্পদ সকলই সম্ভোগ করিয়াছি। কিন্তু আপনি জানেন, আমি তখনও এই সাংসারিক সুখ-ভোগকে অসার মনে করিতাম। সংসার ত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের যাহা, আমি ঈশ্বরকেই তাহা অর্পণ করিতে চাই। সংসারের ভোগসুখে কেবল দুঃখযাতনা ও আত্মার মৃত্যুই আনয়ন করে। এজন্য আমার প্রভু ও পবিত্রাত্মার সহবাসেই আজীবন যাপন করিব, সংকল্প করিয়াছি।"

এলিজাবেথের বাসস্থানের চতুর্দ্দিকের দৃশ্য অতিশয় মনোহর। কোথাও বা গগনস্পর্শী গিরিশৃঙ্গ রজতশুভ্র তুষাররাশিতে শোভা পাইতেছে, নির্ঝরিণী ঝর্ঝর সঙ্গীত গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে। কোথাও বা হ্রদের নিরুপম সৌন্দর্য্য, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা। কোন স্থানে কুসুমোদ্যানে তরু সকল পুষ্পপল্লবে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে, বায়ুহিল্লোলে কুসুমের সৌরভ ছড়াইয়া পড়িতেছে। এলিজাবেথ প্রকৃতির এই মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অসীমসুন্দর সত্যপুরুষের রূপের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন; তাঁহার অন্তরে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। তিনি প্রায় প্রতিদিনই ছেলেমেয়েদের লইয়া ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতেন।

এলিজাবেথের স্বামীর মৃত্যুর পরেও সংসারে একটুখানি বন্ধন ছিল। এখন আর এই বিপুল বিশ্বে তাঁহার কোনই বন্ধন নাই, আসক্তি নাই, কোন কামনার বিষয়ও নাই;—তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিয়া "চির-সতীত্ব" লাভ করিবার জন্য—অর্থাৎ ঈশ্বরকেই স্বামীরূপে বরণ করিয়া, আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহারই পাদপদ্মে অর্পণ করিবার নিমিত্ত কৃচ্ছ্র-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

আমরা পূর্ব্বেই রাজা লুইয়ের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি; কিন্তু তাঁহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার বিষয় কিছুই লিখি নাই। বিদেশেই তাঁহার সমাধি হইয়াছিল। কবরের মধ্যে তাঁহার দেহ প্রোথিত ছিল। এতদিন পরে জার্ম্মানীর বিস্তর সম্ভ্রান্ত লোক কবর হইতে ধার্ম্মিক রাজার দেহ-কঙ্কাল উত্তোলন করিয়া দেশে লইয়া আসিলেন। এই সময়ে বিধবা রাণী তাঁহার মাতুল বিশপের গৃহেই বাস করিতেছিলেন। তাই ঐ সকল লোক সান্ত্বনীতে যাইবার অগ্রেই শব লইয়া এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলেন। নানা দেশের বড় বড় সম্ভ্রান্ত পরিবারের নাইট উপাধিধারী ব্যক্তিগণ এবং বীরপুরুষ ও সৈন্যগণ মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গেই বিধবা রাণীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। এলিজাবেথ কিয়ৎকাল স্বামীর শবাধারের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার প্রাণে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি কিছুতেই আপনার অশ্রুজল রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিলেন না। নাইট উপাধিধারী বড় বড় লোকেরা রাণীকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন। তাহার পরে রাজার দেহ উপাসনামন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল এবং শবাধার খোলা হইল। রাজার দেহ-কঙ্কালের দিকে চাহিয়া সকলেই অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ প্রথমে ক্রন্দন করিলেন; তৎপরে তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল। তিনি নীরবে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে

এলিজাবেথ, ঈশ্বরকে "মহারাজ" সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তুমি আমার স্বামীকে অনন্ত শান্তিরাজ্যে লইয়া গিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ করি।"

রাজার মৃতদেহ কয়েকদিন এলিজাবেথের কাছেই রাখা হইল। প্রতিদিনই গভীরভাবে উপাসনা হইত। বিশ্বাসী উপাসকগণ ঈশ্বরের আবির্ভাবের মধ্যে বাস করিয়া পরকালের অস্তিত্ব অনুভব করিতেন। এই সময়ে হেন্‌রীর অত্যাচারের কথা নানা স্থানের সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিগণের ও তেজস্বী বীরদিগের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। এলিজাবেথ নানা কথা বলিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন।

সম্ভ্রান্ত লোকেরা রাজার শব লইয়া রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজার সঙ্গে যে সকল সৈন্য ও সেনাপতি ধর্ম্মযুদ্ধের জন্য পূর্ব্বদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া প্রভুর মৃতদেহের সঙ্গে সঙ্গেই রাজবাটীর প্রাসাদদুর্গে উপনীত হইলেন। হেন্‌রী সিংহাসন অধিকার করিয়া এলিজাবেথের প্রতি যে অত্যাচার ও দুর্ব্যবহার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহারা মর্ম্মাহত হইয়াছেন। এখন রাজপ্রাসাদের দিকে চাহিয়া ও হেন্‌রীকে দর্শন করিয়া দুঃখে, শোকে, ঘৃণায় ও ক্রোধে তাঁহাদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। তাঁহারা হেন্‌রীর দুষ্কার্য্যের প্রতীকারের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার অন্যায়াচরণের তীব্র প্রতিবাদের নিমিত্ত একটি দিন স্থির হইল। সে দিন চারিজন বীরপুরুষ সকল সৈন্যের প্রতিনিধি হইয়া হেন্‌রীর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সাহসী ও নির্ভীকচিত্ত লর্ড ভেরিলা গম্ভীর স্বরে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম "এলিজাবেথ" গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"মহারাজ, এই রাজ্যের একদল যোদ্ধার অনুরোধেই অদ্য আমাকে

আপনার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তাঁহাদের বক্তব্য প্রকাশ করিবার ভার আমার উপরেই অর্পিত হইয়াছে। আমিই আপনার নিকট তাঁহাদের নিবেদন জ্ঞাপন করিব। আমরা আপনার বিরুদ্ধে কতকগুলি গুরুতর দোষের কথা শুনিতে পাইয়া, দুঃখে ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছি। একজন রাজা যথার্থই কি এইরূপ অধর্ম্ম ও বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইতে পারেন? আপনি কোন্ লোকের কুপরামর্শে এই অন্যায় কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছেন? একজন সুপ্রসিদ্ধ রাজার কন্যা, আপনার ভ্রাতৃবধূ—তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা ও তাঁহাকে সান্ত্বনাদান করাই কি আপনার কর্ত্তব্য নয়? তাহা না করিয়া, পতিতা স্ত্রীলোকের মত তাঁহার অপমান করিয়া, আপনি তাঁহাকে রাজপ্রাসাদ হইতে তাড়াইয়া দিলেন? আজ সেই বিধবা নারীর গৃহ নাই, অর্থ নাই, মানমর্য্যাদা কিছুই নাই; তিনি পথের ভিখারিণী। আপনার যে ভ্রাতা ঈশ্বরের কার্য্যের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, আপনিই না তাঁহার অনাথ শিশুসন্তানদিগের অভিভাবক? তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করা ত দূরের কথা, আপনিই সেই অসহায় শিশুদিগকে রাজপ্রাসাদ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন। আপনি কি আপনার পুণ্যবান ভ্রাতার নিকট এই শিক্ষাই লাভ করিয়াছেন? আপনার ভ্রাতা তাঁহার অতি দরিদ্র, অতি হীন প্রজার প্রতিও এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতেন না। আমরা ভবিষ্যতে আপনার কর্ত্তব্যজ্ঞান ও, বিশ্বস্ততাতে কিরূপে আস্থা স্থাপন করিব? আপনি ত একজন যোদ্ধা; বিধবা ও অনাথদিগকে রক্ষা করাই যোদ্ধার ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া আপনার ভ্রাতৃবধূ ও ভ্রাতার শিশুসন্তানদিগের প্রতি কি না অত্যাচার করিয়াছেন? আপনার এই আচরণ কি জঘন্য নয়? প্রতিহিংসার যোগ্য নয়?”

ভাবোচ্ছ্বাসে লর্ড ভেরিলার আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। রাজমাতা

লোকিয়া দুঃখে ও শোকে কাঁদিতে লাগিলেন। হেন্‌রীর রাজমুকুট-গর্ব্বিত মস্তক লজ্জায় নত হইয়া পড়িল। লর্ড ভেরিলা আবার অগ্নিময়ী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"একজন ভগ্নহৃদয়া, বন্ধু ও সহায়হীনা বিধবার নিকট হইতে আপনি কি আশঙ্কা করিতেছিলেন? সেই পুণ্যশীলা নারী এই দেশের রাজপ্রাসাদের কর্ত্রী হইলেই বা আপনাদের কি অনিষ্ট হইত? এখন বিদেশের লোকেরা আমাদিগকে কি ধিক্কার দিবে না? আপনি কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আপনি ঈশ্বরের বিরাগভাজন হইয়াছেন? আপনি কি এই দেশ ও আপনার গৌরবান্বিত বংশের উপর কলঙ্ক অর্পণ করেন নাই? আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত না হন, আপনার ভ্রাতৃবধূর সহিত যদি সদ্ভাব সংস্থাপন না করেন, আপনার ভ্রাতার সন্তানদিগকে তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য যদি, ফিরাইয়া না দেন, তবে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের ক্রোধ এই দেশের উপর পতিত হইবে।"

লর্ড ভেরিলার এক একটি কথা যেন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত হেন্‌রীর হৃদয়ের উপর গিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি আর সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভয়ে, অনুতাপে, লজ্জায় ও দুঃখে অধীর হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তৎপরে বলিতে লাগিলেন—"আমার অপরাধের জন্য আমি যথার্থই অনুতপ্ত হইয়াছি, আর কখনই কাহারো কুপরামর্শে কর্ণপাত করিব না। আপনারা আমাকে বন্ধুর মত বিশ্বাস করুন। আমার ভ্রাতৃবধূ রাজ্য সম্পদ যাহা চাহিবেন, তাহাই তাঁহাকে অর্পণ করিব। তবে আপনাদের কাছে একটি, কথা বলা আবশ্যক। আমার ভ্রাতৃবধূকে সমস্ত দেশের অধিকার দান করিলেও, তিনি তাহা সমস্তই ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন।"

লর্ড ভেরিলা কহিলেন—"ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়ার উহাই একমাত্র উপায়।"

হেন্‌রী কয়েক জন সৈন্যকে এলিজাবেথের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। তাহারা বিধবা রাণীর কাছে উপস্থিত হইয়া কহিল—"আপনি রাজ্যের কোন্ অধিকার পাইলে রাজা হেন্‌রীর সঙ্গে বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন?"

এলিজাবেথ কহিলেন "বৃহৎ অট্টালিকা, ধনরত্ন, রাণীর অধিকার—এ সকল কিছুই চাহি না; আমার বিবাহের যৌতুকস্বরূপ যাহা পাইয়াছিলাম, শুধু তাহাই চাহি। ঐ সকল আমার স্বামীর ও আমার মুক্তির জন্য ব্যয় করিব।"

সৈন্যগণ হতাশ হইয়া হেন্‌রীর নিকট ফিরিয়া গেল। কিন্তু হেন্‌রী তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে মোটেই চিনিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এলিজাবেথের অন্তরে বৈর-নির্যাতনস্পৃহাই বলবতী হইয়া উঠিয়াছে। তাই হেন্‌রী কতকটা ভয়ে, কতকটা অনুতাপের জ্বালায় সুস্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি জননী সোফিয়া ও ছোট ভাই কণরাদকে সঙ্গে লইয়া এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং বিনীতভাবে কহিলেন—"আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি আমার সমস্ত অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত আছি।"

সরলা ও প্রীতিময়ী এলিজাবেথের প্রাণের স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি হেন্‌রীর গলা জড়াইয়া ধরিলেন। ভাবোচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। এলিজাবেথ শুধুই কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের প্রেম ও স্বর্গীয় ক্ষমার ভাব দর্শন করিয়া, লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন—

"এলিজাবেথ মানবী না দেবী?"

এইবার দেবীর প্রেমে যথার্থই পাষাণ গলিয়া গেল, মরুভূমির মধ্যে প্রীতির উৎস উৎসারিত হইল, হিংসা বিদ্বেষ সকলই ভাসিয়া চলিল। হেন্‌রী ভ্রাতৃবধূর ব্যবহারে আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনিও

বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজমাতা শোকিয়া বধূর চোখের জলের সহিত আপনার চোখের জল মিশাইয়া দিলেন। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শন করিয়া বীরপুরুষ যোদ্ধৃগণও চোখের জল থামাইতে পারিলেন না। আজ নয়নজলের ভিতর দিয়াই সকলের সঙ্গে সকলের মিলন হইয়া গেল। এলিজাবেথ শাশুড়ীর, দেবরের ও স্বামীর অনুগত সৈন্যদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া ওয়ার্টবার্গের রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ছেলেমেয়েদিগকে লইয়া সেই অট্টালিকায় বাস করিবেন, ইহাই স্থির হইয়া গেল। এলিজাবেথ রাণী হইয়া যে সকল অধিকার পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে সেই সমস্ত অধিকারই দেওয়া হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

প্রেমে পাগলিনী

এলিজাবেথ পুনর্ব্বার রাজপুরীর সুরম্য-হর্ম্ম্যতলে বাস করিতেছেন। তাঁহার সন্তানেরা পিতৃগৃহেই ফিরিয়া আসিয়াছে। আবার তাহাদের জন্য নানা রকম সুখের আয়োজন হইতেছে। এই সময়ে হেনরী ভ্রাতৃ-বধূকে রাজবাড়ীর প্রমোদোৎসবে ও নৃত্যগীতে মাতাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু তাঁহার বিফল প্রয়াস! যে নারীর প্রাণ স্বয়ং ঈশ্বরই অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, কে তাঁহাকে অসার আমোদ-প্রমোদে মুগ্ধ করিয়া রাখিবে? এলিজাবেথ এখন আর কোনরূপ ক্রীড়াকৌতুকে যোগদান করিতেন না, নাচগানের আসরেও যাইতেন না। তিনি তাঁহার

প্রেমের দেবতা ঈশ্বরের ধ্যানে ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও অমৃতে পূর্ণ হইয়া উঠিত। তদ্ভিন্ন দয়াময়ী নারী দরিদ্রকে অর্থ, ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করিতেন; তাঁহার দুখানি হস্ত পীড়িত লোকদিগের সেবাতেই নিযুক্ত থাকিত। এই সময়েই তিনি সেণ্টমেরী মেকডেলেন হাসপাতাল স্থাপন করেন।

কিন্তু এত করিয়াই বা তাঁহার তৃপ্তি কোথায়? সংসারের শত শত ধার্ম্মিক লোক যেরূপ ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিলে, জন্ম সার্থক মনে করেন, এলিজাবেথ সেইরূপ ধর্ম্মজীবন ত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু তবুও তাঁহার প্রেমের দেবতা তাঁহাকে সন্তুষ্ট হইতে দিলেন না। তিনি চাহেন, তাঁহার দাসী এলিজাবেথ প্রেমে পাগলিনী হইয়া আপনার সর্ব্বস্ব তাঁহারই চরণে ঢালিয়া দিবেন। তাই তিনি প্রেমের বীণা বাজাইয়া এলিজাবেথকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কাজেই এলিজাবেথের মন আর কিছুতেই ধৈর্য্য মানিল না, কোন তপস্যা, জীবনের কোন অবস্থা, হস্তের কোন কার্য্যই তাঁহার মনের মত হইল না। তিনি প্রেমে পাগলিনী হইয়া গৃহ হইতে বাহির হইবার জন্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাজপ্রাসাদের ধনরত্ন, শাশুড়ী ও দেবরের স্নেহ, আর তাঁহাকে রাজপুরীতে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি সন্ন্যাসিনীর মত নির্জ্জনে ধ্যান ও প্রার্থনা করিবেন, আপনার রক্ত, মাংস, দেহের অণু-পরমাণু, আত্মার সমস্ত শক্তি, প্রাণের সমস্ত প্রেম—ঈশ্বরকেই অর্পণ করিবেন;—পীড়িত লোকদিগের সেবায় আপনাকে তিল তিল করিয়া বিলাইয়া দিবেন; সেই জন্য তিনি আর ধনৈশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপুরীতে থাকিতে চাহিলেন না বিষয়ী লোকেরা রাণীর এই মতি-গতি দেখিয়া বলিতে লাগিলেন।—

"রাণী পাগল হইয়া গিয়াছেন।"

এলিজাবেথ রাজবাড়ী হইতে রুটি, মাংস, মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রকাণ্ড রাজপথ দিয়া দরিদ্রের কুটীরে গমন করিতেন; তখন অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়াই বলিত—"রাণী পাগল—একেবারেই পাগল হইয়া গিয়াছেন।"

এই সকল কথা শুনিয়া এলিজাবেথের একটুকু কষ্ট হইত না। এখন তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই একটি আনন্দের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হইয়া থাকিত। এই সময়ে রোমের পোপ এলিজাবেথের উন্নত জীবনের কথা শুনিয়া, স্বয়ং তাহার কাছে পত্র লিখিয়া স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তিনি প্রায় সকল কার্য্যে এলিজাবেথের সহায় হইয়াছিলেন।

কিছুদিন পরেই স্থির হইল, এলিজাবেথ মারবার্গ সহরের একটি নির্জ্জন ও মনোরম স্থানে গমন করিয়া, চিরদিন সেইখানেই বাস করিবেন। সেই যায়গায় তাঁহার তপস্যা ও সেবা দুয়েরই অত্যন্ত সুবিধা হইবে। এলিজাবেথ যে দিন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন, সে দিন তাঁহার অন্তরে যেন ভাবের তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। তিনি হৃদয়ের আবেগে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। প্রেমময়ী নারী সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বলিলেন—

"আপনারা আমাকে ভাল বাসিয়াছেন—আমাকে দয়া করিয়াছেন। আমার প্রতি এই দয়া কেন? আমি কি এই করুণার যোগ্যপাত্রী? বলুন ত আমি আপনাদের জন্য কি করিয়াছি? আজ আমাকে সকলে ক্ষমা করুন, আমার জন্য প্রার্থনা করুন, আমাকে প্রফুল্লমনে বিদায় দিন। আপনাদের প্রার্থনায় ও প্রভু পরমেশ্বরের করুণায় আমার সর্ব্বস্ব যেন তাঁহাকেই সমর্পণ করিতে পারি। তাঁহার সেবাতেই যেন এ দেহের রক্ত, মাংস সকলই অর্পিত হয়।"

এলিজাবেথ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া মারবার্গ সহরে উপস্থিত হইলেন।

ঐ সহরের সমস্ত অধিকার তাঁহাকেই অর্পণ করা হইয়াছে। সে যায়গার সকল পুরুষ ও নারী তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু এ রকম অভ্যর্থনা ও জনকোলাহল এলিজাবেথের মোটেই ভাল লাগিল না। তিনি সহরের তিন মাইল দূরে একটী নির্জ্জন স্থানে গমন করিলেন। সেখানে নানা জাতীয় বৃক্ষলতার ভিতর ক্ষুদ্র একখানি কুটীর ছিল। কুটীরের ছাদটি ভগ্ন; তবে তরুশাখায় ও সবুজপত্রে আচ্ছাদিত বটে।

এলিজাবেথ এই নির্জ্জন কুটীরেই বাস করিয়া প্রকৃত তপস্বিনীর ন্যায় তপস্যা ও দুঃখীর সেবা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বহস্তেই রন্ধন করিতেন। নিজে সামান্য কিছু আহার করিয়া, প্রচুর খাদ্য দরিদ্রদিগকে বিলাইয়া দিতেন। কিছুদিন পরে কুটীরের নিকট একটি কাঠের গৃহ নির্ম্মিত হইল। সেই গৃহে তপস্বিনী ছেলেমেয়েদের লইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এলিজাবেথের অপূর্ব্ব জীবনের কাহিনী এখন প্রায় সকলেই জানিতে পারিয়াছেন; রোমের পোপ নবম গ্রেগারি তাঁহাকে ত উত্তম-রূপেই জানিতেন। তিনি রীতিমত সন্ন্যাসিনী হন, ইহাই পোপের একান্ত ইচ্ছা। সেজন্য পোপ স্বয়ং এলিজাবেথের নিকট একখানি পত্র প্রেরণ করিলেন। এলিজাবেথ ত সন্ন্যাসিনীদের চেয়েও অধিক ক্লেশ সহ্য করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করেন, তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের অবির্ভাবের মধ্যেই বাস করে, তাঁহার পক্ষে সন্ন্যাসিনী হওয়া ত কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু এলিজাবেথের চির-হিতৈষী ধর্ম্মাচার্য্য কণরাদ বলিলেন—"আপনার সন্ন্যাসিনী হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। যে সকল অর্থসম্পদ আছে, আপনি তাহাই বা কেন ত্যাগ করিবেন? উহা ত ঈশ্বরের নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন। ঐ সকল অর্থসম্পদের দ্বারা দীনদুঃখীরই অভাব মোচন করুন।"

তপস্বিনী কণয়াদের সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করিলেন না। তিনি বাহিরের একটা অনুষ্ঠান করিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন না বটে; কিন্তু অন্তরে সন্ন্যাসিনীর ব্রতই গ্রহণ করিলেন। সাধিকা নারী একদিন উপাসনা মন্দিরের বেদীতে হস্ত রাখিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য্যই ত্যাগ করিলেন। এখন তাঁহার অর্থ সম্পদ সকলই ঈশ্বরের হইয়া গেল, তাঁহার নিজের আর কিছুই রহিল না। তিনি আপনার বিষয়সম্পদের একটি পয়সাও স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার সমস্ত অর্থই ঈশ্বরের কার্য্যে অর্থাৎ দুঃখীদিগের সেবায় ব্যয় হইতে লাগিল। রাণী স্বহস্তেই উলের সূতা কাটিতেন, সেই সূতা বিক্রয় করিয়া কিছু টাকা পাইতেন, সেই টাকাতেই তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। তিনি ভাল জিনিষটি খাইতেন না, ভাল পোষাকটি পরিতেন না; অতি অল্প দামের জামা গায়ে দিতেন; কিন্তু ঘরের বাহিরে গিয়াই হয় ত দেখিতে পাইতেন, একটি গরীব লোক ভয়ঙ্কর শীতে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেছে। দয়াময়ী রাণী তৎক্ষণাৎ গায়ের জামাটি দরিদ্রকে বিলাইয়া দিতেন; নিজে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আগুনের উত্তাপে শীত নিবারণ করিতেন।

এতদিন তাঁহার পুত্রকন্যাগণ কাছেই ছিলেন, এখন আর তাঁহাদিগকে কাছে রাখিতে পারিলেন না। তাঁহাদের তুষারশুভ্র সুকুমার মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মাতৃহৃদয়ে স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তাঁহারা দূরে চলিয়া যাওয়াতে, রাণীর অন্তরে কোন রকম আসক্তিই রহিল না। এখন এই বিপুল বিশ্বে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন, তাঁহার আর কেহই নাই—কিছুই নাই। তাপসী নারী প্রথম জীবনে প্রেমে অধীর হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"হে আমার আত্মার প্রিয়তম স্বামী, আমি তোমাকেই ভাল বাসিব। আর কোন জিনিসকে ভালবাসিতে দিও না। যে সকল সামগ্রী

আমাকে তোমার দিকে লইয়া যাইবে না, তাহা আমাকে বেদনা দিউক, আমার পক্ষে বিষাক্ত হউক। একমাত্র তোমার ইচ্ছাই আমার পক্ষে সুমিষ্ট হউক। সর্ব্বদা তোমার ইচ্ছাই যেন আমার ইচ্ছা হয়। যেমন প্রেম মিলনকে চায়, প্রেমিক সকল বস্তু প্রিয়তমের হস্তেই অর্পণ করিতে চায়; তেমনি আমি আমার জন্য কিছু না রাখিয়া, আমার সমস্ত সামগ্রী, আমার সমগ্র আত্মা সম্পূর্ণরূপে তোমাকেই অর্পণ করিতে চাই। আমি ধনৈশ্বর্য্যলাভের আকাঙ্ক্ষা একবারে হৃদয় হইতে দূর করিতেছি। আমার যদি অনেক জগৎ থাকিত, আমি সমস্তই ত্যাগ করিয়া আমার দৈন্য ও দারিদ্র্য লইয়া তোমাতেই ডুবিয়া থাকিতাম। হে আমার হৃদয়ের স্বামী, তোমার প্রতি আমার প্রেম এতই গভীর, যে সে প্রেমের জন্য আমি দারিদ্র্যব্রতকে পবিত্র মনে করি। আমার যাহা কিছু, তাহা তোমার জন্যই ত্যাগ করিতেছি; আমি যেন তোমাতেই রূপান্তরিত হইতে পারি।" *

এলিজাবেথের অন্তরের সেই উচ্চ প্রার্থনা এতদিন পরে আজ পূর্ণ হইল, তিনি যথার্থই ঈশ্বরের প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া গেলেন। তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত, যেন ধর্ম্মই নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছে। এই সময়ে ধর্ম্মাচার্য্য কণরাদ মারবার্গেই বাস করিতেন। তিনি বলিয়াছেন, "এলিজাবেথ নির্জ্জনে ঈশ্বরের সঙ্গে বাস করিতেন। তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইত। তাহার পরে তিনি যখন আমাদের সম্মুখে আসিতেন, তখন তাঁহার অনুপম মূর্ত্তি হইতে জ্যোতি নির্গত হইত।"

---

* রেভারেণ্ড এলবান বাটলার প্রণীত সাধুদিগের জীবনচরিত অর্থাৎ Lives of he Saints গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

এই সময়ে সাধিকা নারী সমাধিতে মগ্ন হইয়া থাকিতেন। তাঁহার সমাধির অবস্থায় যে-সকল ব্যাপার ঘটিত, তদ্বিষয়ে একটি ঘটনা বিবৃত করিব। একদিন এলিজাবেথ রান্না করিতে বসিয়া, ঈশ্বরের চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানে আত্মহারা হইয়া গেলেন। তখন কয়লার আগুনে তাঁহার কাপড় পুড়িতে লাগিল। তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু বাহিরের লোকেরা কাপড় পুড়িতেছে দেখিয়া তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিল এবং আগুন নিবাইয়া দিল। তখন তাপসী নারী চোখ মেলিয়া ব্যাপারটা যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এলিজাবেথ একটি হাসপাতাল খুলিয়াছিলেন। সেখানকার রোগীর সেবাতেই তাঁহার অনেক সময় কাটিয়া যাইত। পীড়িত লোকেরা তাঁহার মধুর স্নেহে মুগ্ধ হইত, তাঁহাকে জননী বলিয়া মনে করিত। তিনি বিস্তর কুষ্ঠ রোগীর সেবা করিতেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার মনে ভয় অথবা ঘৃণার উদ্রেক হইত না। একবার একটি অল্পবয়স্ক বালিকার কুষ্ঠ রোগ জন্মিল। তাহার আত্মীয় স্বজন তাহাকে ত্যাগ করিল। এলিজাবেথ বালিকার কাতর মুখখানি দেখিয়া, মাতার ন্যায় তাহার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আর বলিকাটিকে হাঁসপাতালে রাখিতে পারিলেন না, তাহাকে নিজের গৃহে রাখিয়াই তাহার সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। এলিজাবেথের জীবনের এই সকল ঘটনা স্মরণ করিয়া মনে হয়, ঈশ্বর যেন নবনীর কোমলতা, কুসুমের পবিত্রতা ও শিশুর সরলতা দ্বারা তাঁহার হৃদয়টি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। "এলিজাবেথ" গ্রন্থ-রচয়িতা এই পুণ্যশীলা নারীর সেবা ও সাধনসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"তিনি সমস্ত দিন মানবের সেবার ভিতর দিয়া প্রভুর পূজা করিতেন। রাত্রিতে শ্রান্তি ক্লান্তি অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় প্রভুর পদতলে নতজানু হইয়া,

ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপাসনায় কাটাইয়া দিতেন; তাঁহার প্রসাদ ও দয়া লাভের জন্য প্রার্থনা করিতেন।"

এলিজাবেথের আশ্চর্য্য জীবন দেখিয়া, বিস্তর লোক তাঁহাকে দেবীর মত ভক্তি করিত। অনেক পুরুষ ও রমণী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। তাপসী নারীর সান্ত্বনাবাক্যে বহু লোকের জ্বালাময় হৃদয় জুড়াইয়া যাইত। কোন পাপী পাপযন্ত্রণায় কাতর হইয়া এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলে, তাঁহার অন্তরে করুণা উচ্ছলিত হইয়া উঠিত। কারণ মানুষের পাপের চেয়ে আর যে কোন রকম ভয়ানক দুঃখ আছে বা হইতে পারে, তাহা তিনি মনে করিতেই পারিতেন না। তাই তিনি পাপভারাক্রান্ত লোকের জন্য কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতেন। সেই প্রার্থনার মধ্য দিয়াই যেন পাপীর হৃদয়ে আলোক ও শক্তি নামিয়া আসিত এবং মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত।

এলিজাবেথ যখন কুটীরে ভিখারিণীর মত বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার পিতৃরাজ্যের দূত কাউণ্ট বেন্‌ফি আসিয়া হেন্‌রীকে কহিলেন—"আমারা শুনিতেছি, আমাদের রাজকন্যা দুঃখীর ন্যায় দিন যাপন করিতেছেন। ইহার কারণ কি ?"

হেন্‌রী কহিলেন—"আমার ভ্রাতৃবধূ এখন পাগলিনী। আপনি তাঁহার কাছে গমন করুন এবং তাঁহাকে গিয়া দেখুন, তাহা হইলেই আমার কথার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

রাজদূত মারমার্গ সহরে উপস্থিত হইয়া, একটি লোকের নিকট তাঁহাদের রাজকন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল—"তিনি ত মানুষ নহেন, 'স্বর্গের দূত'। আমাদের আত্মার কল্যাণের জন্যই এখানে আসিয়াছেন।"

কাউণ্ট বেন্‌ফি যখন এলিজাবেথের কাছে উপস্থিত হইলেন,

তখন তাঁহার অঙ্গে সামান্য বস্ত্র, তিনি সূতা কাটিতে ব্যস্ত। দূত তাঁহার প্রভুর কন্যার এই অবস্থা দেখিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন,"কে আপনাকে পথের ভিখারিণী করিয়াছে ?"

এলিজাবেথ কহিলেন—"কোন মানুষ ত আমার কিছুই করে নাই। প্রভু পরমেশ্বরের জন্যই আজ আমার এই অবস্থা।"

দূত তাঁহাদের রাজকন্যাকে পিতৃরাজ্যে লইয়া যাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু চেষ্টায় কোন ফল হইল না। যিনি ঈশ্বরের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাকে কথায় ভুলাইয়া মায়ার ফাঁদে জড়াইয়া, আর কি সংসারে ফিরানো যায় ?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরলোক-যাত্রা

১২৩১ খ্রীষ্টাব্দ। নবেম্বর মাস। এলিজাবেথের জ্বর হইয়াছে। তিনি শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। এই অবস্থায় নিশাকালে একটি উজ্জ্বল আলোক তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার জীবনদেবতা সুমিষ্টস্বরে বলিতেছেন—"প্রিয় এলিজাবেথ, তুমি এস। তোমার জন্য নিত্যনিবাস প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। সেখানে তোমাকে লইয়া যাইব।"

এলিজাবেথ বুঝিতে পারিলেন, এইবার তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া যাইবে। তিনি প্রভুর আহ্বানে তাঁহার চির-বাঞ্ছিত-রাজ্যে চলিয়া যাইবেন। আলোকে পুলকে তপস্বিনীর হৃদয় ভরিয়া উঠিল। তিনি হর্ষোৎফুল্লমুখে পরলোক-যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। শরীরের যন্ত্রণা কিছুতেই তাঁহার আনন্দ হ্রাস করিতে পারিল না।

এলিজাবেথ মৃত্যুর পূর্ব্বে বন্ধু-বান্ধব ও আশ্রিত দীনদুঃখী, রুগ্নভগ্ন সকল শ্রেণীর লোকের নিকটেই একে একে বিদায়গ্রহণ করিলেন। এখন তিনি শান্ত-সমাহিত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট সময়টুকু ঈশ্বরের সঙ্গেই বাস করিবেন; পাছে বা তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, এজন্য বিস্তর লোক দূরে চলিয়া গেল। ধর্ম্মযাজক কণরাদ এলিজাবেথকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা করিবেন?"

এলিজাবেথ বলিলেন—"আমার যা কিছু পার্থিব সম্পত্তি, তাহা ত ঈশ্বরের চরণেই উৎসর্গ করিয়াছি। অনেক দিন হইতেই উহা গরীব-দের সম্পত্তি হইয়াছে। তাহাদিগকে সমস্ত অর্পণ করিবেন। প্রভু যিশুখ্রীষ্ট ব্যতীত আমার অন্য কেহই উত্তরাধিকারী নাই।"

এলিজাবেথের সহসা মনে হইল, যেন স্বর্গীয় সঙ্গীতে সমস্ত গৃহ পরিপূর্ণ। স্বর্গের দূতেরাই যেন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আনন্দ-সঙ্গীত গাহিতেছেন। তিনি এক একবার উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পরেই কণ্ঠ নীরব হইল। অনেকে কাঁদিতে লাগিলেন। এলিজাবেথ কহিলেন—

"চুপ কর, চুপ কর, আমার কর্ণে স্বর্গের সঙ্গীত আসিয়া পৌঁছিতেছে। তোমরা কোলাহল করিও না।"

১৯শে নবেম্বর রাত্রিকালে তপস্বিনী এলিজাবেথ পরলোক-যাত্রা করিলেন। সমাধির জন্য মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময়ে

যাজকগণ ধর্ম্মসঙ্গীত গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু শত শত দীনদুঃখীর ক্রন্দনের মধ্যে সেই সঙ্গীত বিলীন হইয়া গেল।

এলিজাবেথের প্রতি যাঁহাদের অতিশয় ভক্তি ছিল, অত্যন্ত ভালবাসা ছিল, তাঁহারা পুণ্যশীলা নারীর মৃত্যুর পরে, তাঁহার গৃহে বসিয়া অনুভব করিতেন, যেন সেই তপস্বিনী নারীর জীবনকুসুমের সৌরভে সমস্ত ঘর পরিপূর্ণ; যেন এখনো তিনি গাহিতেছেন—

"আমার প্রভুর তরে,
রাজ্য ও গৌরব মোর,
ত্যাগ করিয়াছি ভেবে তুচ্ছ ও অসার।
আমি তাঁরে দেখিয়াছি,
তাঁরে ভাল বাসিয়াছি,
বিশ্বাস করেছি তিনি সর্ব্বস্ব আমার।"*

---

* রেভারেণ্ড এলবান বাটলারের Lives of The Saints গ্রন্থ পাঠ করিয়া জানা যায়, এলিজাবেথের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে, রোমের পোপ তাঁহাকে "সেণ্ট" বলিয়া ঘোষণা করেন। ১২৩৬ সালে এলিজাবেথের সমাধিস্থানে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক স্বহস্তে তাঁহার সমাধির উপরে একটি বহুমূল্য স্বর্ণমুকুট স্থাপন করেন। ঐ সময়ে এলিজাবেথের পুত্র রাজকুমার হারমেন, কন্যা সোফিয়া ও জারট্রুড অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা জননীর পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন।

রাণী সীতা দেবী

সীতা নামটির উপরেই আমাদের অন্তরের একটি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু সেই শ্রদ্ধাটুকুর জন্যই যে এই জীবনচরিতটি লিখিতেছি, তাহা নহে। এই সীতাদেবী আমাদের চিরস্মরণীয়া জনক-দুহিতার ন্যায় পতিব্রতা নারী ত ছিলেনই; তাহা ছাড়া তিনি রাজরাণী হইয়াও সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। তাঁহার তরুণ বয়স রাজান্তঃপুরের মণিকাঞ্চনের মধ্যে অতিবাহিত হইলেও তিনি মধ্য বয়সে স্বামীর সঙ্গে ভিখারিণীর বেশে তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; তৎপরে এই মনস্বিনী নারী শ্রীহরির চরণে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া তপস্বিনীর জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার ন্যায় হয় ত অতি অল্প রমণীই স্বামীর যথার্থ সহধর্ম্মিণী হইয়া, দুজনে এক সঙ্গে কঠোর তপস্যা করিয়াছেন এবং ভক্তির অমৃতপ্লাবনে হৃদয়কে মধুময় করিয়া তুলিয়াছেন। আমি এই জন্যই ভক্তমালগ্রন্থের বিস্তর অস্বাভাবিক ও অসম্ভব বর্ণনার মধ্য হইতে এই ক্ষুদ্র জীবন-চরিতটি সংগ্রহ করিয়াছি। গ্রন্থরচয়িতা এই রাণী ও রাজার জীবন-চরিতটি লিখিয়া সমাপ্ত করিবার সময়ে লিখিয়াছেন—"ইঁহাদের কথা ত অনেক, কিন্তু আমি সংক্ষেপে অল্প কথাই লিপিবদ্ধ করিলাম। যাহা লিখিলাম, তাহা পাঠ করিলে, সকলেরই চিত্ত হরিভক্তি লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। আমি শুধু এই বাসনাই করি, সীতা ঠাকুরাণী ও তাঁহার স্বামী যেন করুণা করিয়া আমাকে তাঁহাদের ভৃত্যের মধ্যে গণ্য করেন।" এইটুকু পড়িলেই মনে হয়, যথার্থই রাজা ও রাণীর জীবন ভক্তি ও বৈরাগ্যে, তপস্যায় ও ত্যাগে

অতিশয় উন্নত ছিল। তাঁহারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমস্ত লোকের অত্যন্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, আমি এখন এই ভক্তিমতী নারীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রাণী সীতা দেবীর স্বামীর নাম পিপাজী। তিনি গাঙ্গোরোন প্রদেশের রাজা ছিলেন। রাজার প্রথম জীবনে ধর্ম্মভাব যে একেবারে ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু তাঁহার একটুখানি ধর্ম্মভাবের সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ধনৈশ্বর্য্যের অহঙ্কার ছিল। তিনি আপনাকে মস্ত বড় রাজা বলিয়া মনে করিতেন। এই সময়ে রাজপ্রাসাদে এক বৈষ্ণব আসিয়া অতিথি হইলেন। তিনি অতিশয় দরিদ্র। কিন্তু তিনি দরিদ্র হইলেও সাধক এবং শ্রীহরির পরম ভক্ত। রাজা গর্ব্বিত হইয়া এই বৈষ্ণবের প্রতি অতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ভক্ত বৈষ্ণব তাহাতে ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরঞ্চ তিনি রাজার কল্যাণের জন্যই তাঁহার উপাস্যদেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন। এ দিকে রাজা রাত্রিকালে দুঃস্বপ্ন দেখিলেন; বৈষ্ণব অতিথিকে সামান্য লোক মনে করিয়া, তাঁহাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্য করা যে অত্যন্ত অন্যায় কার্য্য, রাজা তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাই তাঁহার অন্তরে অনুতাপের উদয় হইল। সেই অনুতাপে তাঁহার চিত্ত একেবারে উদাস হইয়া গেল। তাহার পরে রাজার রাজ্য, সম্পদ ও ভোগের সামগ্রীর উপরে আর কোন রকম আসক্তিই রহিল না। এই সময়ে বৈষ্ণবগুরু রামানন্দ স্বামী শিষ্যসহ কাশীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। রাজা তাঁহার কাছে উপস্থিত হইয়া ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই সময় হইতেই তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন;—

"গুরুর আজ্ঞাতে গৃহে আসিয়া রাজন্।
বৎসরের কৈল হরি ভক্তির সাধন॥"

সম্পূর্ণ একটি বৎসর সাধনের পরে, রাজার আর সংসারের কোন বস্তুর উপরেই মন রহিল না। তাঁহার অন্তর হইতে সমস্ত ভোগের তৃষ্ণা দূর হইল। তিনি ধনরত্নপূর্ণ রাজপ্রাসাদ, রত্নমণি খচিত সিংহাসন ও স্বর্ণমুকুট অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। তৎপরে রাজপুরী ত্যাগ করিয়া, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও শ্রীহরির দর্শনের জন্য কঠোর সাধন করিবার বাসনাই তাঁহার মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল।

রাজা সাতটি বিবাহ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে সীতা দেবীর বয়স অতি অল্প ছিল। তিনিই রাণীদের মধ্যে সকলের চেয়ে ছোট ছিলেন। আমরা ছেলেবেলা হইতে গল্পে শুনিয়া আসিয়াছি, যিনি ছোট রাণী হন, তিনিই খুব সুন্দরী হন। তাঁহার মনেই হিংসা এবং সুখস্পৃহা উভয়ই অত্যন্ত প্রবল হয়। তাঁহার স্বামীর কল্যাণের চেয়ে রাজান্তঃপুরের সুখের সামগ্রীগুলির উপরেই দৃষ্টি থাকে অনেক বেশি। কিন্তু এই সীতাদেবী রাণীদিগের মধ্যে ছোট এবং রূপ-লাবণ্যে সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাঁহার হৃদয় পুষ্পের ন্যায় পবিত্র, মন সুখস্পৃহাশূন্য এবং চিত্ত ধর্ম্মের জন্যই অত্যন্ত ব্যাকুল ছিল। তিনি পতিব্রতা, সুগৃহিণী এবং তেজস্বিনী নারী ছিলেন। এই সাধ্বী রাণী স্বামীর পদচিহ্নের অনুসরণ করিয়া রামানন্দের নিকট ভক্তিধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখন স্বামীর গৃহ-ত্যাগের সংকল্পের কথা শুনিয়া, তাঁহার মনে এই চিন্তারই উদয় হইল যে, আমার স্বামী যখন দুর্ল্লভ মানবজন্ম সার্থক করিবার জন্য জীবনসর্ব্বস্বদেবতা শ্রীহরির অন্বেষণে গৃহত্যাগ করিতেছেন, তখন আর আমি স্বর্ণাভারণে দেহের শোভা বর্দ্ধিত করিয়া, এই

রাজপুরীর ধনরত্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, শূন্য হৃদয়ে এখানে পড়িয়া থাকি কেন? আমার সম্মুখে ত রামায়ণের দৃষ্টান্ত পড়িয়াই আছে। সীতা দেবী ত অযোধ্যার সর্ব্বসুখ পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে বনবাসিনীই হইয়াছিলেন। আমিও তাঁহার পবিত্র স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, এই রাজপুরী ত্যাগ করিব এবং স্বামীর সঙ্গিনী হইব।

কিন্তু রাণীর মনের সংকল্প মহৎ হইলেও, উহা পূর্ণ করিবার পক্ষে বিঘ্নও ছিল যথেষ্ট। সীতা দেবীর স্বামীর সঙ্গে গৃহত্যাগের বাসনা প্রবল হইলে কি হইবে? স্বামী যে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীকৃত নহেন। তবে রাণীরও অটল সংকল্প। তিনি ধর্ম্মশীলা এবং তেজস্বিনী। তাঁহার স্বামী অয়োধ্যার রামচন্দ্রের মতনই যখন তাঁহার অগ্নিপরীক্ষা করিলেন, তখন তিনিও সাধ্বী সীতার ন্যায় সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইলেন। এই সময়ে তিনি রাণীর বসন ভূষণ ত্যাগ করিয়া, সামান্য একখানি কম্বল পরিয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বিস্মিতনেত্রে রাণীর কম্বলাবৃত দেহ নিরীক্ষণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং পার্শ্বে উপবিষ্ট গুরু রামানন্দের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। ভক্তমালের লেখক বলেন—

"সীতা নামে ছোট রাণী।
টান মারি ফেলি দিলা হীরা হার মণি॥

*　　*　　*

রাজা চমকিয়া স্বামী মুখপানে চাহে।
ইহারে সঙ্গেতে লহ গুরুদেব কহে॥
হরি অনুরাগী যেই সেই গ্রহ্য হয়।
যদি বল রমণীর সঙ্গ না জুয়ায়॥

উভয়ের বীতরাগ যদ্যপি অন্বয়।
দৈহিক সম্বন্ধে অভিমান নাহি রয়॥
তবে সে পুরুষ-স্ত্রী ভেদ কি রহিল।
সবাই সমান তাহে হরিভক্তি হৈল॥
উপযুক্ত বুঝি স্বামী অনুমতি দিলা।
অযোগ্য কোথায় যাথে স্বামী কৃপা কৈলা॥”

গুরু রামানন্দ রাজাকে যাহা কহিলেন, তাহার প্রকৃত মর্ম্ম বোধ হয় এই যে, রাণী দেহাত্মবুদ্ধির পরিবর্ত্তে আত্মার জ্ঞানই অন্তরে উজ্জ্বল লইয়া উঠিয়াছে। এখন তিনি আত্মায় বিরাজ করিতেছেন। আত্মার আবার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ কি? রাণী যখন হরিভক্তি লাভ করিয়া দেহাত্মবুদ্ধির এবং স্ত্রী-পুরুষ ভেদের অতীত হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই গৃহত্যাগ করিতে এবং সাধনে ব্রতী হইতে পার। সংযতচিত্ত, স্পৃহাশূন্য ও বৈরাগ্যপরায়ণা পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য, রাজার প্রতি যখন গুরুর আদেশ হইল, রাজা তখন সীতা দেবীকে সঙ্গিনীরূপে সঙ্গে লইয়া রিক্তহস্তে রাজপুরী ত্যাগ করিলেন। তাঁহার ধনরত্ন সমস্তই রাজপ্রাসাদে পড়িয়া রহিল। তাঁহারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে রাস্তায় ভিক্ষান্নের দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। দুই রাজা ও রাণীর এইরূপ বৈরাগ্যের ভাব দর্শন করিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। সীতা দেবী নিরন্তর ভগবানের সুমিষ্ট নাম কণ্ঠে উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিনি নামের আনন্দে হৃদয় পূর্ণ করিয়া স্বামীর সঙ্গে দুর্গম পথে চলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঈশ্বরের নামের শক্তি এই নারীর চিত্তকে এমন সবল এবং মনকে এরূপ সরস করিয়া তুলিল যে, দিনের পরে দিন পথ চলিতে তাঁহার কোন কষ্টকেই আর কষ্ট বলিয়া মনে হইল না।

সীতা দেবী স্বামীর সঙ্গে চলিতে চলিতে সুদূর দ্বারকাতীর্থে

উপস্থিত হইলেন। একদিন মীরাবাইয়ের ভক্তির সাধনায় এই তীর্থের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছিল, এখন সাধ্বী সীতা দেবী এইখানে পতির সঙ্গে ভক্তির সাধনাতেই মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ভক্তবৎসলকে দর্শন করিবার জন্য, তাঁহাদের প্রাণ মহাপ্রেমিক গৌরাঙ্গের মতনই কাঁদিয়া উঠিল। সীতা দেবী তাঁহার জীবনদেবতা শ্রীহরির দর্শন না পাইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সাগরের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভগবানকে পাইবার জন্য যে নারীর অন্তরে এমনই ব্যাকুলতা, যিনি প্রেমের দেবতার জন্য প্রাণটা অনায়াসে তুচ্ছ মনে করিতে পারেন, প্রেমময় শ্রীহরি আর কি তাঁহার নিকট আত্মস্বরূপ লুকাইয়া রাখিতে পারেন? তাহা ত পারিলেন না। তিনি সীতা দেবী ও তাঁহার স্বামীর নিকট প্রকাশিত হইলেন। প্রেম তাঁহাদের হৃদয়-যমুনার দু-কূল ছাপাইয়া উঠিল। আনন্দে দুজনেরই হৃদয় একেবারে ভরপূর হইয়া গেল।

রাজা ও রাণী শ্রীহরির অপরূপ রূপ দর্শন করিয়া, প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া অনেক দিন দ্বারকায় অবস্থিতি করিলেন। তাহার পরে দুজনে শ্রীহরির মনোমোহন মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরিশেষে সীতা দেবী স্বামীর সঙ্গে বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সেই স্থানে পরম ভক্ত শ্রীধর বাস করিতেছিলেন। তিনি ত রাজা ও রাণীকে আপনার ক্ষুদ্র কুটীরে সমাদরের সহিত লইয়া আসিলেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে যে কি খাওয়াইবেন, কিরূপে যে অতিথিদের ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার গৃহে পয়সাও ছিল না, খাবার কোন সামগ্রীও ছিল না। অবশেষে শ্রীধরের পত্নী একখানি ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিয়া আপনার পরণের কাপড় খানি বাজারে বিক্রির জন্য পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে যে কিছু পয়সা পাওয়া গেল, সেই পয়সাতেই

খাদ্যদ্রব্য কিনিয়া সকলে পরম আনন্দে আহার করিলেন। ধর্ম্মের জন্য ইঁহাদের যে বৈরাগ্য, যে ত্যাগ, যে কষ্টস্বীকার, তাহা স্মরণ করিলে যথার্থই চোখের জল রাখিতে পারা যায় না। রাজা ও রাণী খরচ পত্রের জন্য সঙ্গে যদি কিছু টাকা আনিতেন বা রাখিতেন, তাহাতে কিছুই দোষ হইত না; কিন্তু বৈরাগ্যের ব্যাঘাত্ হইত, সুখের প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিত, ধর্ম্মের জন্য একেবারে সর্ব্বত্যাগী হইতে পারিতেন না; সেই জন্যই তাঁহারা রাজকোষের অর্থের প্রতি আর ফিরিয়াও চাহিলেন না, উহা হয় ত বৈষ্ণবসেবায় অথবা কোন রকম সৎকার্য্যেই দান করিয়াছিলেন। কি যে করিয়াছিলেন, ভক্তমালগ্রন্থের কোথাও তাহার কিছু উল্লেখ নাই।

সীতা দেবী স্বামীর সঙ্গে বৈষ্ণবদিগের প্রধান তীর্থ বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি স্বয়ং দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া স্বহস্তে রান্না করিতেন, সেই খাদ্যদ্রব্য স্বামীকে এবং বৈষ্ণবসাধুদিগকে খাওয়াইতেন। সীতা দেবীর মন এরূপ পবিত্র, হৃদয় এরূপ কোমল, জীবন এরূপ উন্নত এবং সেই জীবনের প্রভাব এ প্রকার আশ্চর্য্য ছিল যে, অতিবড় দুর্বৃত্ত পুরুষ এই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীর আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছে। এক বণিক অন্তরে পাপ লইয়া সীতা দেবীর কাছে আসিয়া নিষ্পাপ হইয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া স্তবস্তুতি করিয়া বলিয়াছে—

"জগন্মাতা তুমি মোর লক্ষ্মী ঠাকুরাণী।
অপরাধ ক্ষম মোর, মূঢ় অজ্ঞ জানি॥"

রাজকন্যা মালিনী

আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে যখন বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিক শক্তি বিস্তর নরনারীর অন্তরে আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, সেই সময়ে কাশীনগরীতে রুকী নামক এক ধার্ম্মিক ও ন্যায়বান্ রাজা ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্মের কঠোর আঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেন। তাঁহার উপরে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-দিগের অতিশয় আধিপত্য ছিল। রাজা তাঁহাদের মন্ত্রণা ও উপদেশ অনুসারে প্রজাপালন এবং ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন। এই রাজার পরম স্নেহের কন্যার নামই মালিনী। মালিনীর অনুপম রূপ লাবণ্যে রাজপুরী আলোকিত হইয়াছিল। তিনি বেদাদি হিন্দুশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল। এই বয়সেও তিনি কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহেই বাস করিতেন। রাজপ্রাসাদে তাঁহার স্বাধীনতা ও ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্টই ছিল। সেই জন্য তিনি ব্রাহ্মণ প্রতিপালক পিতার অট্টালিকায় বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে সাহস পাইয়াছিলেন। কিন্তু পিতার মনোবেদনার ভয়ে তাঁহাকে অত্যন্ত গোপনেই কাজটি সম্পন্ন করিতে হইত। এই অধ্যয়নের জন্যই রাজকন্যার মন বৌদ্ধধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। তাহার পরে রাজকুমারী পিতামাতার অজ্ঞাতসারেই বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। শুধু তাহাই নহে, মালিনী বৌদ্ধধর্ম্মের আধ্যাত্মিকভাবে আকৃষ্ট হইয়া সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার অন্তরে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি ও আত্মায় এক অনুপম আধ্যাত্মিক শক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল।

কিন্তু এই রকম একটা ব্যাপার যে রাজপুরীতে অনেকদিন গোপন থাকিবে, তাহা কখনই সম্ভব নয়; একটি ঘটনাতে রাজকন্যার বৌদ্ধ-ধর্ম্ম গ্রহণের কাহিনী প্রকাশ হইয়া পড়িল এবং বিষম বিভ্রাট উপস্থিত হইল। একদিন মালিনী একদল জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও সর্ব্বত্যাগী বৌদ্ধ সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের আলোকমণ্ডিত প্রশান্ত মূর্ত্তি দর্শন করিয়া মালিনীর অন্তর ভক্তি ও পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সেই তপস্বীদিগকে আদর অভ্যর্থনা করিয়া উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী ও অনেকগুলি ক্ষৌমবস্ত্র প্রদান করিলেন। এই কার্য্যটি সম্পন্ন হইবার পরেই রাজকুমারীর সমস্ত গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। প্রাচীন ধর্ম্মবিশ্বাসী ব্রাহ্মণগণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সহসা কাশী নগরীতে যেন এক বিপ্লব উপস্থিত হইল। আগেই বলিয়াছি, মহারাজ স্বয়ং হিন্দুধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষক। তাই কাশীর বিস্তর ব্রাহ্মণ, রাজকন্যার বিরুদ্ধে মহারাজার নিকটে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। তাঁহারা বলিলেন—"মহারাজ, রাজকন্যা বে-ধর্ম্মী বৌদ্ধসন্ন্যাসীদিগকে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্ব্বে আপনার অনুমতি গ্রহণ করিলেন না কেন? তিনি কোন্ সাহসে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ভোজন করাইলেন? তিনি তাঁহার স্বাভাবিক কোমলতা ও দয়ার জন্যই যদি সন্ন্যাসীদিগকে খাদ্যসামগ্রী দান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন, তবে ঐ সকল দ্রব্য তাঁহাদের মঠে পাঠাইয়া দিলেই ত হইত; ঐ সমস্ত ভিক্ষুদিগকে রাজবাড়ীতে আহ্বান করিয়া আনিবার কি প্রয়োজন হইয়াছিল? আসল কথা এই যে, রাজকন্যা রাজ্যলোলুপ বৌদ্ধদিগের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া, এই পবিত্র কাশীনগরী বে-ধর্ম্মীদিগের হস্তে অর্পণ করিতে চাহেন। এই জন্যই আমরা প্রার্থনা করি, মহারাজ! আপনি

সত্বর আপনার এই অবাধ্য কন্যাকে বারাণসী রাজ্য হইতে নির্বাসিত করুন।”

রাজা স্নেহময় পিতা হইয়াও ব্রাহ্মণদিগের অন্যায় অনুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি বাধ্য হইয়াই কন্যার প্রতি চিরনির্বাসনের আদেশ প্রদান করিলেন। ষোড়শ বর্ষীয়া রাজকন্যা মালিনীকে চিরদিনের জন্য পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু এই কঠোর দণ্ডের আদেশ শুনিয়া রাজকুমারীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি একটুকু ম্লান হইল না; তাঁহার মুখে বিষাদের রেখাটিও ফুটিয়া উঠিল না। তিনি পুলকিতচিত্তে পিতৃ-আদেশ মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। তবে তাঁহার স্নেহপরায়ণ পিতার নিকট একটিমাত্র প্রার্থনা ছিল। তাই তিনি রাজার সম্মুখে নির্ভীকচিত্তে অথচ নম্রভাবে দাঁড়াইয়া কহিলেন— “পিতা, আমার প্রতি আপনার যে সুগভীর স্নেহ, তাহার আর তুলনা কোথায়? আমি ত সেই স্নেহের জন্যই এতদিন পরম সুখে রাজান্তঃপুরে বাস করিয়াছি। এখন আপনার দণ্ডাজ্ঞা নত মস্তকে গ্রহণ করিয়া, রাজপুরী হইতে চলিয়া যাইবার নিমিত্ত মাত্র সাত দিন সময় প্রার্থনা করিতেছি। আপনি দয়া করিয়া আমার এই প্রার্থনা কি পূর্ণ করিতে পারিবেন না?”

রাজা কন্যার প্রার্থনা ত পূর্ণ করিলেনই; তাহা ছাড়া মালিনীকে বলিলেন—“প্রিয় কন্যা, তুমি কি নিজের জন্য কোনরূপ দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে চাহ? সে বিষয়ে তোমার মনের অভিলাষ কি?”

রাজকুমারী কহিলেন—“না পিতা, সুখের কোন সামগ্রীই আমি আর চাহি না। উহাতে আমার কোনই প্রয়োজন নাই। তবে আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহই প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আপনার চরণতলে আমার একটি মাত্র মনের বাসনা প্রকাশ করিব।

আপনার এবং এই কাশী নগরীর সমস্ত লোকের নিকট আমার অনেকগুলি কথা বলিবার আছে। আপনার অনুমতি পাইলেই সাত দিন এখানে বাস করিয়া সাতটি উপদেশের দ্বারা সেই কথাগুলি ব্যক্ত করিতে পারি। আমার কথাগুলি বলা হইলেই আমি, নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার জন্য, এই নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।

রাজা ন্যায়বান বিচারকই হউন আর ব্রাহ্মণদের রক্ষকই হউন, তিনি যে স্নেহময় পিতা ; তাই কন্যার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, এই তরুণী রাজকুমারী সাত দিন নগরের লোকদিগকে উপদেশ প্রদান করিলে, কাহারই বা কি অনিষ্ট হইবে ? কিন্তু তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী কন্যা এক অপার্থিব শক্তিতে শক্তিশালিনী হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় সত্য সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত বাণী শ্রবণ করিয়া নরনারীর চিত্ত এক অভিনব আধ্যাত্মিক ভাবে বিগলিত হইয়া যাইতে লাগিল। তপস্বিনীর আত্মার শক্তির কাছে বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী-ব্রাহ্মণ-দিগের পাণ্ডিত্য এবং পার্থিব শক্তি হার মানিল। সাত দিনের মধ্যে কাশীর রাজা, রাণী, রাজকুমার, রাজমন্ত্রী, রাজসৈন্য ও পণ্ডিতমণ্ডলী এবং নগরের দশ সহস্র পুরুষ ও নারী বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সকলেরই মনে হইল, রাজকন্যা ত মানবী নহেন, তিনি যে দেবী।

দেখিতে দেখিতে এক সপ্তাহ অতীত হইয়া গেল। রাজকন্যার যাহা বলিবার ছিল তাহাও বলা হইল। তখন তিনি রাজাকে কহিলেন—"মহারাজ, আমার কার্য্য শেষ হইয়াছে, এইবার আপনি দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করুন। আমি অদ্যই এই রাজপুরী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।" রাজা কহিলেন, "প্রিয় কন্যা, আমি পিতা হইয়াও তোমাকে চিনিতে পারি নাই ; তোমার মহত্ত্ব, তোমার জ্ঞান, তোমার তপস্যা, তোমার অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তি আমার ধারণা করাও অসম্ভব ছিল।

কিন্তু এখন তোমার অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া আমার জ্ঞানদৃষ্টি উজ্জল হইয়া উঠিয়াছে, আমি সত্য ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি, তোমার নব ধর্ম্ম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর কি তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি? তুমি কি দেখিতেছ না, কাশীর হাজার হাজার লোক বিমল জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়াছে, তোমার প্রচারিত নব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। এখন তুমি এই নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, কে তাহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবে? তাই বলি, তুমি আর সন্ন্যাসিনী হইতে পারিবে না; তোমাকে এই রাজপুরীতেই বাস করিতে হইবে।"

মালিনী কহিলেন—"মহারাজ, এই কাশী নগর কোলাহল পূর্ণ; তাহা ছাড়া ধনরত্নপূর্ণ রাজপ্রাসাদ শুধুই ভোগ বিলাসের স্থান; এরূপ যায়গা তপস্যার অনুকূল নহে। সেই জন্য আমাকে এই নগর পরিত্যাগ করিয়া কোন নির্জ্জন স্থানে যাইতেই হইবে। অতএব আপনি প্রসন্নমনে আমাকে এই রাজবাটী হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করুন।"

রাজা কহিলেন—"কাশীর নিকটেই সারনাথ তীর্থ; উহা অতি শান্তিপূর্ণ স্থান। তুমি সেই স্থানে বাস করিয়া তপস্যা এবং শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হও। তাহা ছাড়া নারীদিগের কল্যাণার্থ এক সুবৃহৎ বিদ্যালয় সংস্থাপন কর। আমি উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ তোমার হস্তে প্রদান করিব। তুমি মহীয়সী নারী হইয়া বৌদ্ধ রমণীদিগের যথার্থ কল্যাণসাধন কর।"

মালিনী পিতৃ আদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া সারনাথে গমন করিলেন। সেই স্থানে দশ হাজার মহিলার বাসের উপযোগী বিদ্যালয়গৃহ নির্ম্মিত হইল। রাজকন্যা উক্ত গৃহে নারীদিগকে জ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষা দান

করিতে লাগিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি সাধন ও ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তাঁহার নারীজন্ম সার্থক করিলেন।

শুনা যায়, এখনো সারনাথে এই তপস্বিনী রাজকন্যার স্মৃতিচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু শুধু সারনাথে তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন থাকিলে কি হইবে? এ দেশের প্রত্যেক নারীর অন্তরে এই প্রাতঃ-স্মরণীয়া মহিলার স্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া উঠা প্রয়োজন। আমরা বর্ত্তমান সময়ে সাগরপারের মহাত্মা জেনেরল বুথের প্রতিষ্ঠিত মুক্তিফৌজ-সম্প্রদায়ের মহিলাদিগের ধর্ম্মজীবনের ও ত্যাগের কথা শুনিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হই, কিন্তু আড়াই হাজার বৎসর পুর্ব্বে আমাদের এই ভারতবর্ষেই যে কত রাজকুমারী, কত গৃহস্থের কন্যা তপস্যা ও ত্যাগের দ্বারা পুণ্যজীবন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পবিত্র কাহিনী আমরা স্মরণ করিতেও পারি না। আমরা এ যুগে তাঁহাদের সন্ন্যাস গ্রহণের ও সংসার ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিব না, করিবার কোন আবশ্যকও নাই। কিন্তু তাঁহাদের ধর্ম্মজীবনের ও আশ্চর্য্য ত্যাগের আদর্শ হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করা, এ দেশের নারীদিগের একান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। নচেৎ কিছুতেই আমাদের দেশ এবং সমাজ উন্নত হইয়া উঠিবে না।

আমার বলিতে আনন্দ হয় যে, কবি রবীন্দ্রনাথ এই রাজকন্যার অপূর্ব্ব জীবন হইতেই উপাদান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার "মালিনী" নাটক রচনা করিয়াছেন। অনেক বৎসর পুর্ব্বে কবির কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে যখন এই উৎকৃষ্ট নাটকখানি প্রকাশিত হইয়াছিল, আমি তখন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া উহার প্রথম অংশটি পাঠ করিয়াছিলাম। সেই সময়ে জানিতাম না যে সেই অংশের সমস্ত কথাই কবির কল্পিত নহে; উহার অনের কথাই সত্য; এবং সেই সত্য একটি পুণ্যবতী রাজকুমারীর জীবনের ঘটনা হইতেই গ্রহণ করা হইয়াছে। আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের মালিনী

নাটক হইতে এ স্থানে কিঞ্চিত উদ্ধৃত করিলে আমার এই তুচ্ছ রচনাটি পাঠকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিবে এবং মালিনীর মহত্ত্ব ধারণা করিবার পক্ষেও তাঁহাদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইবে। তাই রবীন্দ্রনাথের সেই নাট্যকাব্যের প্রথমাংশ হইতে সামান্য গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি।

ব্রাহ্মণেরা মালিনীর নির্ব্বাসন দণ্ডের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া রাজমহিষী রাজাকে বলিতেছেন—

"নিশ্চিন্ত রয়েছ মহারাজ? ভাব মনে
এ কন্যা তোমার কন্যা, সামান্য বালিকা?
ওগো তাহা নহে। এ যে দীপ্ত অগ্নিশিখা!
আমি কহিলাম আজি শুনি লহ কথা—
এ কন্যা মানবী নহে, এ কোন্ দেবতা
এসেছে তোমার ঘরে। করিয়োনা হেলা;
কোন্ দিন অকস্মাৎ ভেঙে দিয়ে খেলা
চলে যাবে—তখন করিবে হাহাকার—
রাজ্যধন সব দিয়ে পাইবে না আর!"

রাণীর কথা শুনিয়া মালিনী রাজাকে কহিলেন—

"পিতা, তুমি নরপতি,
রাজার কর্ত্তব্য কর। জননী আমার,
আছে তোর পুত্র কন্যা এ ঘর সংসার,
আমারে ছাড়িয়া দে মা! বাঁধিস্‌নে আর
স্নেহ পাশে।"

মালিনী যখন রাজপুরীর অট্টালিকার বাহিরে নগরের লোকদিগের

সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহার অপূর্ব্ব বাণী শ্রবণ করিয়া একজন ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন—

"ভাসি নয়নের জলে
মা তোমার কথা শুনে।"

সমস্ত লোক বলিয়া উঠিল—

"আমরা সকলে
পাষণ্ড পামর।"

রাজকন্যা প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন—

"আজি মোর মনে হয়
অমৃতের পাত্র যেন আমার হৃদয়—
যেন সে মিটাতে পারে এ বিশ্বের ক্ষুধা,
যেন সে ঢালিতে পারে সান্ত্বনার সুধা
যত দুঃখ ব্যাথা আছে সকলের পরে
অনন্ত প্রবাহে।"

মালিনীর অপরূপ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া এবং তাঁহার অমৃতময়ী বাণী শুনিয়া ব্রাহ্মণগণই বলিয়াছিলেন—

"একি দেবী! এ কি বেশ! দয়াময়ী এ যে
এসেছেন ম্লানবস্ত্রে নরকন্যা সেজে!"

আমাদেরও কাশীর পণ্ডিতদিগের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া রাজকন্যাকে দেবী বলিতেই ইচ্ছা হয়। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে এরূপ দেবীর, এইরূপ মহানারীর জন্মগ্রহণ কতই প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

রাজকন্যা সুমেধা

সুমেধা মন্তাবতী নগরের রাজার সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা কন্যা। রাজার নাম কোঞ্চ। তিনি রাজকুমারীর শৈশবকালেই, গৃহে উচ্চ শিক্ষার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করিয়াছিলেন। কন্যা সুমেধা স্বাভাবিক জ্ঞানস্পৃহা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বয়ং ঈশ্বরই যেন বালিকার হৃদয়পাত্র ধর্ম্মভাবে পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই জন্য সুমেধা রাজান্তঃপুরের অতুলনীয় সুখের মধ্যে প্রতিপালিতা ও ধনরত্নের মধ্যে বর্দ্ধিতা হইয়াও ঐ সকল তুচ্ছ পার্থিব সামগ্রীর মোহে মুগ্ধ হন নাই; অল্প বয়স হইতে তাঁহার জীবনপদ্ম জ্ঞানের ও ধর্ম্মের আলোকেই প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। রাজকন্যা যখন তরুণী নারী, তখন তাঁহার সুনির্ম্মল চরিত্র, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, ভোগে অনাসক্তি, ত্যাগে অন্তরের অনুরাগ এবং ধর্ম্মের জন্য আত্মার গভীর তৃষ্ণা দর্শন করিয়া রাজপুরীর সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। সুমেধার পিতা এই নানা গুণে অলঙ্কৃতা, নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিতা, ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্না সুন্দরী ও সুকুমারী কন্যাকে সুপাত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া সুখী করিবার জন্যই ব্যাকুল হইয়াছিলেন। সুপাত্রের যে কোনরূপ অপ্রতুল হইয়াছিল, তাহাও নহে; তিনি ত ধনৈশ্বর্য্যে ও জ্ঞানে গুণে শ্রেষ্ঠ এক রাজাকেই জামাতারূপে বরণ করিবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু জগতের পিতা স্বয়ং ঈশ্বর তাঁহার কন্যাকে যদি বিশ্বের কল্যাণের জন্য বৈরাগ্যের পথেই আকর্ষণ করেন, তবে আর পৃথিবীর পিতার এমন কি শক্তি আছে যে, তিনি আপন কন্যাকে সংসারের সুখের প্রলোভনেই আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখেন? সেরূপ

আত্মবিস্মৃত করিয়া রাখিতে তিনি যে চেষ্টা কিছু কম করিয়াছিলেন, তাহা নহে; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই নিস্ফল হইয়া গেল। জ্ঞানালোক-সম্পন্না ও ধর্ম্মশীলা কন্যা পিতা ও মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

"আমার স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতা, তোমরা দুজনেই আজ আমার অন্তরের গোপনীয় কথা শ্রবণ কর। প্রবল ধর্ম্মতৃষ্ণায় আমার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর গৃহে বাস করিতে পারিব না। এখন নির্ব্বাণই আমার লক্ষ্য। উহা লাভ করিবার জন্যই আমার চেষ্টা। তোমরা সুখের প্রলোভনে আর আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না। কারণ, সংসারের কাম্যবস্তুর সুখ অতি ক্ষণস্থায়ী; উহা লাভ করিবার পথে বিঘ্নও বিস্তর। মূর্খেরাই উহাতে মুগ্ধ হয়। মূর্খদেরই পাপকর্ম্ম ও পাপবুদ্ধির জন্য অধোগতি হয়। মূর্খেরাই বাক্যে ও মনে সর্ব্বদাই অসংযত। তাই বলি, তোমরা দুজনেই আমাকে অনুমতি দাও, আমি বুদ্ধদেবের পবিত্র অনুশাসন অনুসারেই প্রবজ্যা অবলম্বন করিব। ধর্ম্ম ভিন্ন জন্মগ্রহণ করিয়া আর লাভ কি? এই অসার দেহ ধারণ করিয়াই বা আর সুখ কি? তোমরা আদেশ কর, আমি ভবতৃষ্ণা নিবারণের জন্য প্রবজ্যা অবলম্বন করিব। আমার অশুভ মুহূর্ত্ত চলিয়া গিয়াছে, এখন শুভক্ষণ আসিয়াছে; আমি জীবিত অবস্থায় যেন ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা প্রকাশ না করি, আমি যেন ব্রহ্মচর্য্যের পবিত্র আদর্শের কথা বিস্মৃত না হই।"

রাজা ও রাজমহিষী কন্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা উচ্ছ্বসিত স্নেহের আবেগে কন্যাকে নানা কথা বলিতে লাগিলেন; কন্যাকে সন্ন্যাসের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য চেষ্টার কোনই ত্রুটি করিলেন না। কিন্তু কিছুতেই রাজকুমারীর

মনের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি জনক ও জননীকে বলিলেন, "আমি গৃহে থাকিয়া আর এই মুখে কোনরূপ খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ করিব না—ইহাই আমার সংকল্প। তোমরা রাজান্তঃপুরের পাষাণ প্রাচীরের মধ্যে আর আমাকে বদ্ধ করিয়া রাখিও না। বদ্ধ করিয়া রাখিলে বরং অনাহারে প্রাণত্যাগ করিব, তবুও খাদ্যদ্রব্য কিছুতেই আমার এই মুখে দিতে পারিব না।"

কন্যার কথা শুনিয়া পিতার প্রাণ বেদনায় ভরিয়া উঠিল। মাতা কাঁদিতে লাগিলেন। রাজকুমারী জনক জননীর অন্তরের ক্লেশ অনুভব করিতে পারিলেন। দুঃখে তাঁহারও হৃদয় বিগলিত হইল। রাজকুমারী মৃত্তিকায় পতিত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন স্নেহময় পিতা কন্যাকে বলিলেন—"বৎসে, উঠ; তুমি কেন চোখের জল ফেলিতেছ? আমি তোমারই সুখের জন্য সুপাত্র মনোনয়ন করিয়াছি। অনিকর্ত্ত বারণাবতীর রাজা। দেখিতেও তিনি পরম সুন্দর। আমি তাঁহার হস্তেই তোমাকে সমর্পণ করিব। হে আমার প্রিয় কন্যা, তুমিই রাজার প্রধান মহিষী হইবে। তুমি কি জান না, ব্রহ্মচর্য্য বড় কঠিন ব্রত, প্রবজ্যা অবলম্বন করাও দুষ্কর কার্য্য। তুমি ঐ সকল হইতে মনকে ফিরাইয়া কাম্যবস্তু ভোগ কর। রাজ্যের প্রভুত্ব ও ধনৈশ্বর্য্য তোমারই হইবে, তুমি উহাই বরণ করিয়া লও।"

রাজকন্যা সুমেধা বলিলেন—"পিতা, ঐ সকলই অতি অসার। আমি অসার ভোগসুখের বাসনা সম্পূর্ণরূপেই পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি হয় প্রবজ্যা অবলম্বন করিব; নয় ত মৃত্যুকেই বরণ করিয়া লইব। আমি কখনই ধনরত্ন লইয়া রাজপুরীর মধ্যে ভোগ বাসনার অধীন হইয়া বাস করিতে পারিব না।"

অবশেষে সুমেধা আপনার সুন্দর ও সুদীর্ঘ কৃষ্ণ কেশগুচ্ছ খড়্গদ্বারা

কাটিয়া ফেলিলেন এবং রাজপ্রাসাদের একটি কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যান সাগরের অতলতলে ডুবিয়া গেলেন। ধ্যানের মধ্যে তাঁহার চিত্ত সংসারের মনোমুগ্ধকর বস্তু সকলকে অনিত্য বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল, রাজা অনিকর্ত্ত সুমেধার পিতৃভবনে আগমন করিবেন। বিবাহে সুমেধার সম্মতি গ্রহণ করাই তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য। তাই তিনি রাজকন্যার মনোহরণের জন্য মণিমাণিক্যে বিভূষিত হইয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সুমেধার সম্মুখেই তাঁহাকে দণ্ডায়মান হইতে হইল। তিনি রাজকন্যার জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে ভক্তির উদয় হইল। তাই রাজা অনিকর্ত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সুমেধার নিকটে আপনার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে কহিলেন—"তুমি নিশ্চয়ই তোমার পিতামাতার মর্ম্মান্তিক দুঃখ অন্তরে অনুভব করিতেছ। তাঁহাদের সুখের জন্যই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি, তুমি আমাকে স্বামীরূপে বরণ কর। তুমি আমার রাজ্যের অধিশ্বরী ও ধনরত্নের অধিকারিণী হও। তুমি সংসারের দুর্লভ সুখ উপভোগ কর। তুমি ইচ্ছানুসারে নরনারীকে অর্থাদি দান করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ কর।"

এই সময়ে ধ্যানধারণায় রাজকন্যার কামনা প্রশমিত ও মোহ বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। সত্যের নির্ম্মল জ্যোতি তাঁহার অন্তরে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি অনুপম আধ্যাত্মিক ভাবে হৃদয় পূর্ণ করিয়া, ধর্ম্মের অপূর্ব্ব তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত বাণী রাজা অনিকর্ত্তের হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি পরিণয়ের অভিলাষ ত্যাগ করিলেন এবং সুমেধার পিতাকে বলিলেন—

"আপনার এই তপস্বিনী কন্যাকে সন্ন্যাসিনী হইবার জন্যই অনুমতি দিন। তিনি নির্জ্জনে সাধন করিয়া সত্য দর্শন করুন।"

সুমেধার পিতামাতা নিরুপায় হইয়া কন্যাকে সন্ন্যাসিনী হইবার জন্যই অনুমতি প্রদান করিলেন। সুমেধা তপস্যা দ্বারা ছয়টি বিষয়ে দিব্যজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে সাধনের শক্তিতে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হইল। তপস্বিনী সুমেধা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন। শত শত পুরুষ ও নারী তাঁহার প্রতি অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

তৎপরে সুমেধা থেরী অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধার মধ্যে গণ্য হইলেন। তিনি স্বয়ং আপনার আত্মচরিত রচনা করিয়াছেন। তাঁহার অনেকগুলি উৎকৃষ্ট উপদেশ কবিতায় লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সুলেখক শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের "থেরীগাথা" গ্রন্থ হইতে তপস্বিনী সুমেধার রচিত কয়েকটি শ্লোক এবং বিজয় বাবুর পদ্যানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"রজ্জে আণা ধনমিস্ সরিয়ং সুখা দহরিকাপি।
ভুঞ্জহি কামভোগে বারেয্যং হোতু তে পুত্ত॥
অথনে ভণতি সুমেধা মা এদিসকানি ভগবতং অসারং।
পব্বজ্জা বা হোতিতি মরণং বা তেন চেব বারেয্যং॥"

সুমেধার পিতা কহিলেন—

"প্রভুতা ও ধনৈশ্বর্য্যে ভোগ সুখ লভগো যৌবনে;
রাজ্য উপভোগ পুত্রি! বেছে নাও আপনার মনে।
কহিল সুমেধা আমি ভজিব না অসার সংসার,
বরিব প্রবজ্যা, নয় বেছে নিব মরণ আমার।"

ভিক্ষুণী সুপ্রিয়া

সুপ্রিয়ার যখন অতি অল্প বয়স, তখনই তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্চর্য্য সাধনের কথা শুনিলেও বিস্মিত হইতে হয়। সুপ্রিয়া সর্ব্বপ্রকার সুখের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া যোগ সাধন করিয়াছিলেন। উহাতে তাঁহার অন্তরে অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফূরণ হইয়াছিল। তিনি বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের সঙ্গে জ্ঞানের গভীর যোগ হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে; সুপ্রিয়া মহৎ কর্ম্মের দ্বারা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের চির-স্মরণীয়া নারী হইয়া রহিয়াছেন। এই বরণীয়া ও যশস্বিনী মহিলার উন্নত জীবনের অতি অল্প কথাই বৌদ্ধগ্রন্থে পাঠ করা যায়। কিন্তু কথা অল্প হইলেও তাঁহার সাধন, তাঁহার ধর্ম্মজ্ঞান ও আত্মত্যাগের কাহিনী স্মরণ করিয়া অত্যন্ত শ্রদ্ধার সহিত উহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

সুপ্রিয়া, সন্তানবৎসল, কোমলহৃদয় ও স্নেহপরায়ণ অনাথপিণ্ডের কন্যা। এই পিতার গৃহে কন্যার যত্ন আদর যে যথেষ্টই ছিল, তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাহা থাকিলেই বা কি হইবে? নব আগন্তুক এক বৌদ্ধ তপস্বীর জীবনের প্রভাবে ও উপদেশের আশ্চর্য্য শক্তিতে সুপ্রিয়ার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল। সংসারের কোন সম্পর্কের এবং ভোগ্যবস্তুর কোন আকর্ষণই আর তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারিল না। তিনি তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্যই সংকল্প গ্রহণ করিলেন। সুপ্রিয়ার এই সংকল্পের কথা যখন তাঁহার স্নেহময়

পিতার কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি আপনার কোমল প্রাণে কঠোর আঘাত পাইলেন। তিনি কন্যার মন ফিরাইবার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পিতা কন্যাকে বলিলেন "প্রিয় কন্যা, তুমি আমার কথাগুলি উত্তমরূপে চিন্তা করিয়া দেখ। তোমার বয়স অল্প; এই কি তোমার ভিক্ষুণী হইবার সময়? এখন তুমি পিতৃগৃহে বাস করিয়া সুখের সামগ্রী সকল উপভোগ কর।"

সুপ্রিয়া কহিলেন—"পিতা, আমার চিত্ত জ্ঞানলাভ এবং যোগ সাধনের জন্যই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর সংসারসুখকে বরণ করিয়া লইতে পারিব না। আমাকে প্রসন্নমুখে সন্ন্যাসিনী হইবার অনুমতি প্রদান করুন।"

সুপ্রিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন। শাস্ত্রালোচনায় তাঁহার মন নিবিষ্ট হইল। কিছুদিন পরে তিনি বিমল জ্ঞানলাভ করিলেন। যোগ সাধনেও তাঁহার কিছুদিন কাটিয়াগেল। কয়েক বৎসর পরে, তিনি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উচ্চশ্রেণীর তপস্বিনী বলিয়া বিস্তর লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন।

সুপ্রিয়া সুধুই যে জ্ঞানলাভ ও যোগসাধন করিয়াছিলেন, তাহাও নহে। তিনি লোকের দুঃখ দুর্গতি নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। রুগ্ন ও বিপন্ন লোকদিগের দুঃখ দর্শন করিলে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত; তিনি তাহাদের দুর্দ্দশা দূর না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। একবার দেশে অর্থাৎ শ্রাবস্তিনগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শত শত পুরুষ ও নারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল। এই সময়ে দয়াময়ী সুপ্রিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বিস্তর লোকের অন্নকষ্ট নিবারণ করিয়াছিলেন।

একবার রাজগৃহের পথে এক অরণ্যমধ্যে, বুদ্ধদেব এবং তাঁহার অনেকগুলি শিষ্যের খাদ্যদ্রব্যের অভাবে ভয়ানক কষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল; সুপ্রিয়া যে মুহূর্ত্তে সেই কষ্টের কথা শুনিতে পাইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া নগরে বাহির হইলেন। তাহার পরে এই কল্যাণময়ী নারী বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যদিগকে আহার করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং এই শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না, সেবাপরায়ণা ও শক্তিশালিনী তপস্বিনীর অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন।

সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিণ

সেণ্ট ক্যাথেরিণ তপস্বিনী। তিনি হিন্দু সাধকদিগের মত কঠোর সাধন করিতেন। তাঁহার সমাধি হইত। ঐ সময়ে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে সকল বরণীয়া নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ক্যাথেরিণের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক তাঁহাকে দেবীর মত মনে করিতেন। এখনো অনেক ধার্ম্মিক লোকের ভক্তি তাঁহার উদ্দেশে অর্পিত হইয়া থাকে। তাই আমি এই তপস্বিনীর একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ক্যাথেরিণ ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইটালির অন্তর্গত সায়েনা নগর তাঁহার জন্মস্থান। ক্যাথেরিণের পিতার নাম জ্যাকোপো। তিনি সরলচিত্ত, বিনয়ী, দয়াবান ও ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। ক্যাথেরিণের মাতার নাম লাপা। তিনি স্নেহময়ী, সুগৃহিণী ও সাধ্বী রমণী ছিলেন। পিতা ও মাতা কন্যার সরল ও সুমিষ্ট স্বভাবের জন্য, তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ক্যাথেরিণের মুখখানি ফুটন্ত ফুলের মত বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি যখন ক্ষুদ্র বালিকা, তখন তাঁহার মাধুর্য্য-ভরা মুখখানি দেখিলে, লোকের চক্ষু জুড়াইয়া যাইত। তাই তিনি প্রতিবেশী পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের অতিশয় আদরের পাত্রী ছিলেন। শুধু তাহাই নহে। এই প্রকৃতির হাতে-গড়া অতি সরল ও অতি পবিত্র বালিকা যখন আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে দাঁড়াইতেন, তখন



সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিণ

তাঁহাদের বড়ই আনন্দ হইত। এজন্য তাঁহারা বালিকাকে "আনন্দদায়িনী" বলিয়া ডাকিতেন।

এই বালিকা শৈশবকালেই ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিতে এ বিষয়ে একটি স্বপ্নদর্শনের কাহিনী বর্ণিত আছে। একদিন রাত্রিকাল। ক্যাথেরিণ নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময়ে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, যিশুখ্রীষ্ট জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত! সেইদিন হইতেই তাঁহার কোমল মনে ধর্ম্মের রশ্মিরেখা ফুটিয়া উঠিল। তখন তাঁহার বয়স ছয় বৎসর মাত্র। তিনি এই বয়সেই নীরবে বসিয়া ঈশ্বরের কথা ভাবিতেন। যে বয়সে অন্য মেয়েরা খেলিত, ছুটাছুটি করিত, সেই বয়সে ক্যাথেরিণ সর্ব্বদাই সাধুদিগের জীবনের কথা শুনিতেন; উহাতেই তাঁহার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিত। বালিকার মনে এই সংকল্পের উদয় হইত যে, তিনিও সাধুদের মতই পবিত্র জীবন লাভ করিতে চেষ্টা করিবেন।

ক্যাথেরিণের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অন্তরের অস্ফুট ধর্ম্মভাব প্রস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল, "আমি কিরূপে ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে পারিব?"

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ইউরোপে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসিনী দেখা যাইত। তপস্যা ও লোকের সেবাই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য ছিল। বালিকা ক্যাথেরিণ তাঁহাদের চরিত্রে আকৃষ্ট হইলেন। সন্ন্যাসিনী হইতেই তাঁহার বাসনা জন্মিল।

একদিন সবেমাত্র রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, আকাশে আলোক রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে, দুই একটি পাখীর সুমধুর সঙ্গীত কর্ণে প্রবেশ করিতেছে। এমন সময়ে ক্যাথেরিণ চলিতে লাগিলেন। একটি নির্জ্জন

স্থানে গমন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কে বলিবে, আজ কেন তাঁহার মন উদাস হইয়া যাইতেছে? তিনি চলিতে চলিতে একটু দূরেই একটি রমণীয় উপত্যকা দেখিতে পাইলেন। স্থানটির নিরুপম সৌন্দর্য্যে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইল। তিনি ধ্যানে মগ্ন হইলেন। সহসা সংসারের শত প্রলোভন যেন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বালিকার সম্মুখে উপস্থিত হইল। পাছে বা তিনি প্রলোভনের কুহকে মুগ্ধ হন, তাঁহার সংকল্প ভাঙ্গিয়া যায়; তিনি সেই ভয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন প্রলোভন দূর হইল, তাঁহার অন্তরে দিব্যালোক ফুটিয়া উঠিল; ঈশ্বর ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন, ক্যাথেরিণের পক্ষে কুমারী-ব্রত গ্রহণ করাই শ্রেয়স্কর। তখন পুনর্ব্বার বালিকার মর্ম্মস্থান হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইল—"প্রভু, আমি যেন তোমাকেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইতে পারি; আর কাহাকেও যেন পতিরূপে বরণ না করি।"

ক্যাথেরিণ কুমারী থাকিবেন এবং কৃচ্ছ্রসাধন করিবেন, মনে মনে এইরূপ সংকল্প করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনের কথা পিতামাতার নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। প্রকাশ করিলেই তাঁহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগিত। পিতামাতার মন যে বড়ই কোমল; এই কন্যাটির প্রতি তাঁহাদের আসক্তিও অত্যন্ত অধিক। তাঁহারা মেয়ের বিবাহের জন্যই ব্যস্ত। জননী লাপা ত কন্যার বার বৎসর বয়সের সময়েই বিবাহের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বালিকার কোমল অঙ্গের মাধুরী বাড়াইবার জন্য, তাঁহাকে বসনভূষণে সাজাইয়া রাখিতে চাহিতেন। কিন্তু ক্যাথেরিণ সাজসজ্জা মোটেই পছন্দ করিতেন না।

কিছুদিন পরে জননী লাপা কন্যার নিকট বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। মাতৃবৎসলা কন্যা এখনো স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলিতে পারিলেন না। তিনি অস্পষ্টভাবে বলিলেন—'আমি মানুষের

প্রিয়কার্য্য সাধনের চেয়ে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনই শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে করি।"

ক্যাথেরিণের এই দুই-একটি কথাতেই তাঁহার মনের ভাব অনেকটা বুঝা গেল। কাজেই জননীর মুখ বিষাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। যে আদরের কন্যার বিবাহের জন্য তাঁহার কতই জল্পনা কল্পনা, সেই কন্যাই কুমারী থাকিতে চায়! ঈশ্বরের জন্য সংসারকেই পায়ে ঠেলিতে চায়!

কন্যার মন ফিরাইবার জন্য মাতা বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্যর্থচেষ্টা! ক্যাথেরিণের অটল সংকল্প হইতে কে তাঁহাকে টলাইবে? ক্যাথেরিণের এক বোন ছিলেন। তিনি বিবাহিতা। সেই বোনই ভগিনীকে সংকল্পচ্যুত করিবার জন্য অনেক বুদ্ধি খরচ করিলেন। অবশেষে তাঁহার চেষ্টাও নিষ্ফল হইয়া গেল।

কিন্তু ক্যাথেরিণের আত্মীয়স্বজনের জেদও নিতান্ত কম নয়। তাঁহারা একটি পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহাকে গৃহে আহ্বান করিলেন। পাত্রটি সঙ্গে গুটিকয়েক সঙ্গী ও মনের মধ্যে অনেকখানি আশা লইয়া উপস্থিত হইল। ক্যাথেরিণ যুবকের সম্মুখে আসিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। তবে কি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বিবাহ ঠিক্-করা হইবে? এই যুবক কি তাঁহারই মনোহরণের জন্য উপস্থিত হইয়াছেন? পাছে বা আপনার ব্রত ভঙ্গ হয়, সেই আশঙ্কায় ক্যাথেরিণ বিদ্যুদ্‌গতিতে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন এবং নিজের ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াই দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তখন যুবকটির ভগ্নহৃদয় ও নিরাশ মন লইয়া স্বস্থানে চলিয়া যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই করিবার রহিল না।

এই ঘটনায় বাড়ীর লোকেরা ভারি বিরক্ত হইলেন। ভগিনী ত গালাগালিই আরম্ভ করিলেন। তাহার পরে তিনি একটু নরম হইয়া, গলার সুর একটু নামাইয়া বলিলেন—"দেখ দেখি বোন, তোমার কি

রকম ব্যবহার! বিবাহে ইচ্ছা নাই বা থাকিল, একটি ভদ্রযুবকের সঙ্গে দুটি মিষ্ট কথা বলিতেও কি দোষ? তাহাতেও কি তোমাকে নরকে যাইতে হইত? তোমার এই অন্যায় ব্যবহারের জন্য আমাদের যে লজ্জা রাখিবারও স্থান নাই।"

বালিকার সুকোমল গণ্ডদ্বয় নয়নজলে সিক্ত হইল। তিনি কহিলেন—"যথার্থই আমার দোষত্রুটি অত্যন্ত অধিক। তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করিতেপারে।"

অল্পদিন পরেই ক্যাথেরিণের এই ভগিনীর মৃত্যু হইল। তিনি বোনকে বড়ই ভাল বাসিতেন। তাঁহার হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এখানকার সকলই ত অনিত্য। কে এই অনিত্য সুখের জন্য লালায়িত হইয়া নিত্যজীবন হারাইবে?" ক্যাথেরিণের বৈরাগ্য আরো বৃদ্ধি হইল, কৃচ্ছ্র সাধনের আকাঙ্খাই বলবতী হইয়া উঠিল। তিনি পূর্ব্ব হইতেই মাংস খাইতেন না, ভাল পোষাক পরিতেন না, কোমল শয্যায় শয়ন করিতে চাহিতেন না, আমোদপ্রমোদ ও নৃত্যগীত ভাল বাসিতেন না; বালিকা এখন আরো কষ্ট সহ্য করিয়া ধ্যান ও প্রার্থনাতেই সময় কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে আর একটি ঘটনা ঘটিল। ক্যাথেরিণের মস্তকের গুচ্ছ গুচ্ছ কেশরাশি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। চুলগুলির ভিতর দিয়া তাঁহার মুখের মাধুরী ফুটিয়া উঠিত। তাঁহাদের একজন ধর্ম্মযাজক, আগে ত তাঁহার মন ফিরাইবার জন্যই চেষ্টা করিলেন। তাহার পরে বালিকার বৈরাগ্য পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন—"তুমি কি তোমার সুন্দর চুলগুলি কাটিয়া ফেলিতে পার?" ক্যাথেরিণ কহিলেন—"আপনি বুঝি মনে ভাবিতেছেন, এই চুলগুলির উপরেই আমার আসক্তি? এই দেখুন না, এখনই চুলগুলি কাটিয়া ফেলিতেছি।"

বালিকা যথার্থই চুলগুলি কাটিয়া ফেলিলেন। তখন যাঁহারা সন্ন্যাসিনী হইতেন, তাঁহাদেরই চুল কাটিয়া ছোট করিতে হইত। তাই ক্যাথেরিণের আত্মীয়দের ভয় হইল;—তবে বুঝি ক্যাথেরিণও সন্ন্যাসিনী হইবেন! বাড়ীর লোকের বিরক্তির আর সীমা রহিল না। তাঁহারা মনে করিলেন, ক্যাথেরিণের উপর কড়া শাসন আবশ্যক। তাহা ছাড়া তাঁহার মাথায় সংসারের কাজ চাপাইয়া দেওয়া প্রয়োজন। কাজের চাপ পড়িলেই তিনি আর নির্জ্জন জায়গায় যাইতে পারিবেন না। তাঁহার ধ্যান ও প্রার্থনারও সুবিধা হইবে না। আত্মীয়েরা ক্যাথেরিণকে ডাকিয়া বলিলেন—"আমরা বাড়ীর চাকরাণী ও রাঁধুনী বিদায় করিয়া দিব। তোমাকেই রান্না ও ঘরকন্না করিতে হইবে।"

ক্যাথেরিণ প্রসন্নমনে মাতাকে কহিলেন—"মা, ঘরের সব কাজ আমিই করিব।"

ক্যাথেরিণের হস্তে গৃহকার্য্যের ভার অর্পিত হইল। তিনি রান্না ঘরকেই ঈশ্বরের মন্দির ও ঘরের কাজগুলিকেই ঈশ্বরের কাজ মনে করিয়া হৃষ্টচিত্তে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। রাত্রিকালে যখন তাঁহার হাতে কোনই কাজ থাকিত না, তখন তিনি নিদ্রার উপর জয়লাভ করিয়া শুধুই প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার এই সময়ের অবস্থাসম্বন্ধে রেভারেণ্ড এলবন্ বাটলার তৎপ্রণীত সেণ্টদিগের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন, "গৃহের যাহা নিকৃষ্ট কার্য্য, তাহাও ক্যাথেরিণকেই করিতে হইত। তিনি আনন্দের সহিত সকল কার্য্য করিতেন। অপমান ও নির্যাতনেও তাঁহার মুখ ম্লান হইত না। দুঃখের প্রতি তাঁহার যেন স্বাভাবিক ভালবাসা ছিল। দুঃখ যে মূর্ত্তি ধরিয়াই আসুক না কেন, তিনি তাহাকে গ্রহণ করিতেন—আলিঙ্গন করিতেন। তবে কি তাঁহার বেদনা-বোধ ছিল না? ছিল বই কি? তিনি বেদনা পাইতেন ঈশ্বরকে

হারাইয়া। কিন্তু ক্যাথেরিণের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে একটি নির্জ্জন স্থান রচনা করিয়াছিলেন। তিনি কর্ম্মের মধ্যেও অনুভব করিতেন, সেই স্থানে তাঁহার অন্তরতম দেবতা একাকীই বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার আত্মা সেই দেবতার মধ্যেই নিমগ্ন হইয়া থাকিত। তাই বাহিরের কর্ম্মকোলাহল তাঁহার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিতে পারিত না।"

এই সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। একদিন গভীর রাত্রি। ক্যাথেরিণ কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন। তাঁহার নয়ন অশ্রুসিক্ত। তাঁহার ললাটে দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত। এই পবিত্র মূহূর্ত্তে ক্যাথেরিণের পিতা কন্যার গৃহে প্রবেশ করিলেন। কন্যার আলোকমণ্ডিত মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া, তাঁহার চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িল। কন্যার অন্তরে যে স্বর্গের আলোক অবতীর্ণ হইয়াছে, সে বিষয়ে পিতার আর কোন সংশয়ই রহিল না।

২

ক্যাথেরিণ সেণ্ট ডোমিনিক সম্প্রদায়ের বিধি অনুসারে সন্ন্যাসিনী-ব্রত গ্রহণ করিবেন। এখন আর তাঁহার মনের সংকল্প গোপন রাখিবার কোনই প্রয়োজন নাই। তাই তিনি একদিন পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে মিলিত করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—

"আমি সরলভাবেই বলিতেছি, বাল্যকালেই কুমারীব্রত গ্রহণের সংকল্প আমার অন্তরে উদিত হইয়াছিল। এখন আমি প্রভু পরমেশ্বরের চরণেই জীবন সমর্পণ করিতে চাহি। এ বিষয়ে আমার সংকল্প অতিশয় দৃঢ়। নিশ্চয়ই আমি আর ক্ষুদ্র বালিকা নই। একটা খেয়ালের

বশবর্ত্তিনী হইয়া যে কিছু করিতেছি, তাহাও নয়। আমি জানি, আমার ব্রত বড়ই কঠিন। আমার দায়িত্ব অতিশয় গুরুতর। আমি ত সব জানিয়া শুনিয়াই এই মহদ্ব্রত গ্রহণ করিতেছি। পরমেশ্বরই আমার সহায়। তাই কোন মানুষ আর আমাকে সংকল্পচ্যুত করিতে পারিবে না। আমি বলিতেছি, পর্ব্বতও যদি বিচলিত হয়, তবুও আমার চিত্ত বিচলিত হইবে না। আমি পার্থিব-সম্মিলনের আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছি। সে বিষয়ে কিরূপে তোমাদিগকে সুখী করিব? তোমরা যদি আদেশ কর, আমি তোমাদের গৃহকার্য্য করিব, তোমাদের সেবা করিব; কিন্তু যে হৃদয় ঈশ্বরকে সমর্পণ করিয়াছি, তাহা কেমন করিয়া মানুষের হাতে অর্পণ করিব? আমি কি আমার প্রভু ভিন্ন আর কাহারো আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইতে পারি? আমার ব্রত যেমনই কঠোর, তেমনি সর্ব্বশক্তিমানই আমার সহায়। আমি আর কাহাকে ভয় করিব?"

কন্যার এই অগ্নিময়ী বাণী শ্রবণ করিয়া পিতা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। জননী লাপা কিছুতেই ক্রন্দন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ক্যাথেরিণের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস যখন একটুকু কমিল, তখন তিনিও জননীর চোখের জলের সঙ্গে আপনার অশ্রুজল মিশাইয়া দিলেন। এই সময়ে পিতা করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন—"প্রিয় কন্যা, আর তোমার ব্রতভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিব না। তাহা করিলে ঈশ্বরের নিকটই অপরাধী হইব। তিনিই যে তাঁহার প্রেমে তোমাকে আকর্ষণ করিতেছেন, সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ করিতে পারি? যাও প্রিয় কন্যা, তুমি তোমার আদর্শ ধরিয়া জীবনের পথেই চলিয়া যাও। নির্ভয়চিত্তে ব্রত সাধন কর। পবিত্রাত্মা যাহা আদেশ করেন, তাহাই পালন কর। তুমি আমাদের জন্যও প্রার্থনা করিও। আমরাও যেন ঈশ্বরের ভৃত্য হইতে পারি।"

ক্যাথেরিণ কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার জন্য একটি স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট হইল। তিনি তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খ্রীষ্টের পবিত্র আত্মার সহিত মিলিত হইতে হইবে। এজন্য শুচিতায় সমস্ত হৃদয় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ রাখা প্রয়োজন। তাই ক্যাথেরিণ শরীরকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া কঠোর সাধন করিতেন। সেই সাধনের কথা স্মরণ করিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। তিনি কয়েকখানা হাড়ের উপর কোন রকমে দেহটা খাড়া রাখিবার জন্যই সামান্য কিছু আহার করিতেন। অনেক দিন উপবাসেই কাটিয়া যাইত। তাঁহার নিদ্রা ত ছিল না বলিলেই হয়; ধ্যান ও প্রার্থনাতেই রাত্রি ভোর হইয়া যাইত। তাঁহার তৎকালের অবস্থা সম্বন্ধে রেভারেণ্ড এলবান্ বাটলার লিখিয়াছেন, "ক্যাথেরিণ দরিদ্রের সাহায্য করিতেন। পীড়িত লোকদিগের সেবা করিতেন। দুঃখী ও তাপিত ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিতেন। রুটি, চাটনি ও সিদ্ধ শাক-সবজি খাইয়াই জীবনধারণ করিতেন। পশুলোমে নির্ম্মিত নিকৃষ্ট বস্ত্রেই তাঁহার অঙ্গ আচ্ছাদিত হইত। তিনি মাটিতেই শয়ন করিতেন। গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন। তিনি পনের বৎসর বয়সের সময়েই জীবনের এই দুর্গমপথে যাত্রা করিয়াছিলেন।"

এই সময়ে সাধন বিষয়ে লোকের মনে যে অনেক রকম কুসংস্কার ছিল, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। অনেকেই বিশ্বাস করিতেন, এই পাপ দেহটাই ধর্ম্মপথের প্রধান বিঘ্ন। এটাকে যতই যন্ত্রণা দেওয়া যায়, ততই ঈশ্বরের কাছে যাইবার পথ প্রশস্ত হয়। তাই ক্যাথেরিণ লৌহশৃঙ্খলে শরীর আবদ্ধ রাখিতেন। ইহার ফল হইল এই যে, তাঁহার সুস্থ সবল দেহ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সে কথা যাউক। তপস্বিনী প্রাণের ভিতর যে ধর্ম্মতৃষ্ণা লইয়া কঠোর সাধন

করিতেন, তাহা চিন্তা করিলেও মন উন্নত হয়। ঈশ্বরের বিশেষ করুণা ব্যতীত, কে এইরূপ সাধনের শক্তি লাভ করিতে পারে ?

ক্যাথেরিণ পূর্ব্বেই সেণ্ট ডোমিনিক-সম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার পরে দেখিতে দেখিতে ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন তাঁহার বয়স আঠার বৎসর। এই বয়সেই তিনি সন্ন্যাসিনী-ব্রত গ্রহণ করিবেন। সেজন্য একটি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। অনুষ্ঠানের দিন স্থির হইল। সে দিন ক্যাথেরিণ হৃদয়ের যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু মহৎ, সমস্তই জীবনদেবতাকে অর্পণ করিবেন, তাঁহাকে স্বামীরূপে বরণ করিয়া লইবেন; তাই উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাঁহার হৃদয়ের দুকূল ছাপাইয়া উঠিল। তিনি এই দিনটিকে বিবাহের দিনের মত উৎসবের দিন মনে করিয়া, পিতা মাতা ও আত্মীয়দিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা সকলেই বিষাদ-ক্লিষ্ট-মনে উপাসনা-মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। ক্যাথেরিণকে যথাসময়ে মন্দিরে আনয়ন করা হইল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ। সেই পরিচ্ছদে আজ তাঁহাকে দেবকন্যা বলিয়া মনে হইতেছে; তাঁহার অন্তরের মহিমা যেন বাহিরের মূর্ত্তিতে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শত শত লোক বিস্ময়-পুলক ও ভক্তিপূর্ণহৃদয়ে সেই অপরূপ নারীমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে উপাসনা আরম্ভ হইল। উপাসনান্তে, অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। ক্যাথেরিণ দীনতা, পবিত্রতা ও ঈশ্বরের আনুগত্য—এই তিনটি ভাব বিশেষরূপে আয়ত্ত করিবার জন্য ব্রত গ্রহণ করিলেন।

এখন ক্যাথেরিণের তপস্যা পূর্ব্বাপেক্ষাও কঠোর হইয়া দাঁড়াইল। তিনি হিন্দু যোগীর মত মৌনব্রত অবলম্বন করিলেন। এক দিন নয়, দু-দিন নয়, ক্রমাগত তিন বৎসর, তিনি এই ব্রত রক্ষা করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মযাজক বাটলার লিখিয়াছেন—"ক্যাথেরিণ তিন বৎসর শুধু তাঁহার আচার্য্যের সঙ্গেই কথা বলিতেন; তাহা ছাড়া আর কাহারো সঙ্গেই কথা বলিতেন না। এই সময়ে তিনি দিবারাত্রি ধ্যানেই মগ্ন হইয়া থাকিতেন। ধ্যানের আনন্দেই তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিত।"

কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও ক্যাথেরিণকে ঘোর পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে পড়িতে হইল। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার বল বৃদ্ধি করিবার জন্যই, তাঁহাকে সংগ্রামের মধ্যে ফেলিলেন। ক্যাথেরিণের জীবনচরিতে পাঠ করা যায়, তিনি যখন সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, তখন যিশুখ্রীষ্টের আবির্ভাব হইল। তিনি বলিলেন—"বৎসে, তোমার উদ্ধারের জন্য তুমি ক্রুশ মনোনীত কর। তুমি কি শুন নাই যে, আমি আনন্দের সহিত ক্যালভারি পর্ব্বতের নীচে ঘৃণার্হ লোকদিগের সঙ্গে মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিয়াছিলাম। অতএব পরীক্ষা ও দুঃখকে শুধু যে সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিবে, তাহা নহে; কিন্তু আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিও। জানিও, উহারাই তোমার অনন্তকালের সম্বল আনিয়া দিবে।"

সন্ন্যাসিনী কিছুদিন পাপ ও প্রলোভনের মধ্যে পড়িয়া ভয়ানক সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুষ্পের মত সুপবিত্র হৃদয়; তবুও পাপ সেই হৃদয়ে কুচিন্তার রেখাপাত করিল। সংসারের শত কামনা যেন মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহার অন্তরে মায়া বিস্তার করিতে লাগিল। শয়তান অথবা কুমতি তাঁহার মন ভুলাইবার জন্য কহিল—

"হা বুদ্ধিহীনা নারী, তুমি স্বহস্তে আপনার জীবনপুষ্পের দলগুলি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিতেছ? সেই ছিন্নদল বৈরাগ্যের মরুভূমিতে ফেলিয়া দিতেছ? তুমি ধর্ম্মপথে চলিতেছ, না আত্মহত্যা করিতেছ? হায় রমণী, তোমার কিসের অভাব? একবার সংসারের পানে ফিরিয়া চাহ;



ক্যাথেরিণের ভাবোচ্ছ্বাস

চাহিয়া দেখ, তোমার জন্য কত রকম সুখের আয়োজন। তুমি কেন ইচ্ছা করিয়া দুঃখ ও বিপদকে বরণ করিয়া লইতেছ? সেরা, রেবেকা, লিয়া, রেচোল প্রভৃতি সাধ্বী স্ত্রীলোকগণ কি বিবাহ করেন নাই? তাঁহারা বিবাহ করিয়া কি ধর্ম্মলাভ করিতে পারেন নাই? ফিরিয়া এস, ফিরিয়া এস, সংসারে প্রবেশ কর; বিবাহ করিয়া সুখী হও।”

এই সময়ে ক্যাথেরিণের মন শুষ্ক। হৃদয় ভক্তিশূন্য। তিনি উপাসনা করেন, প্রার্থনা করেন; কিন্তু কোথায় ঈশ্বর? প্রাণের দেবতাকে আর ত কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার যে হৃদয় পবিত্রতায় সুনির্ম্মল, বিশ্বাসে সমুজ্জল, ও প্রেমে মধুময় ছিল, সেই হৃদয়ে আজ পাপের স্পর্শ, প্রলোভনের আক্রমণ! সন্ন্যাসিনী ভয়ে একেবারে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

ক্যাথেরিণ এই সঙ্কটের মধ্যেও আপনার মহদ্‌ব্রত বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন। এই সময়ে দিবারাত্রি প্রার্থনা ব্যতীত আর কোন কাজেই তাঁহার মন নিমগ্ন হইত না। কিন্তু প্রার্থনার শক্তি কি আশ্চর্য্য! এই শক্তির সাহায্যেই বিপন্না নারী সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলেন। ঈশ্বর যেন তাঁহার প্রিয় কন্যার ক্রন্দন ও প্রার্থনা শুনিয়া আর দূরে থাকিতে পারিলেন না; ক্যাথেরিণের নিকট প্রকাশিত হইলেন। ভক্তিমতী নারী অনেক দিনের পরে আজ অন্তরে ঈশ্বরের আবির্ভাব অনুভব করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন এবং তিনি বলিলেন—“প্রভু আমি কত দিন কত রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইয়াছি, তবুও তোমার দর্শন পাই নাই। তুমি এতদিন কোথায় ছিলে?”

ক্যাথেরিণের হৃদয় ভেদ করিয়া ঈশ্বরের এই বাণী উত্থিত হইল—“বৎসে, আমি তোমার অন্তরের মধ্যেই আছি। তোমাকে কি ত্যাগ করিতে পারি? তোমার নয়নের প্রত্যেকটি অশ্রুবিন্দু, তোমার ভক্তির

প্রত্যেকটি উচ্ছ্বাস আমি দর্শন করিয়াছি। তোমার প্রার্থনার প্রত্যেক বাক্যটি আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আমি উপযুক্ত সময় বুঝিয়াই, তোমার অন্তরে আমার জ্যোতি উদ্ভাসিত করিয়া আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিলাম। এখন তোমার দুঃখ দূর হইল, সংগ্রাম থামিয়া গেল; তুমি জানিও, তোমার বিশ্বাস ও সংগ্রামের পুরস্কারস্বরূপই আমি আত্মপ্রকাশ করিতেছি।

ক্যাথেরিণের প্রাণ আনন্দে প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি অনেক সাধন, অনেক সংগ্রাম করিয়া, অনেক কষ্ট সহিয়া, অনেক দিন চোখের জল ফেলিয়া, এখন জীবনের একটি নিরাপদ অবস্থা লাভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার দেবদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল।



যে সকল জ্ঞানী ও প্রেমিক ব্যক্তি বিশ্বের রহস্য-যবনিকার অন্তরালে প্রবেশ করিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিলীলা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন, ভগবানের প্রেমের জন্যই নরনারীর সৃষ্টি। তাঁহার প্রেম চরিতার্থ হইবে বলিয়াই তিনি মানুষকে কতকটা আপনারই অনুরূপ করিয়া সৃজন করিয়াছেন। তিনি জ্ঞানস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ ও ইচ্ছাময় পুরুষ। মানুষের মধ্যেও এই জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি। জ্ঞান, প্রেম ও ইচ্ছাশক্তি লইয়াই মানুষের আত্মা। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর প্রেমে পূর্ণ হইয়া মানব-আত্মাকে আপনার দিকেই আকর্ষণ করিতেছেন। সেই জন্য মানবাত্মা সংসারের কোন সামগ্রী লইয়াই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছে না—নিরন্তর অসীমসুন্দর সত্যপুরুষের দিকেই ছুটিয়া যাইতে চাহিতেছে। মানবাত্মা যদি ঈশ্বরের পানে ছুটিয়া যাইতে পারে, যদি ঈশ্বরের অনন্ত

প্রেমের সঙ্গে, মানুষের ক্ষুদ্র প্রেমের মিলন হয়; তবে ঐশীপ্রকৃতিও চরিতার্থ হয়, মানবপ্রকৃতিও চরিতার্থ হয়। তাহা না হইলে মানবজন্ম ব্যর্থ হয় এবং ঈশ্বরের প্রেমও চরিতার্থ হয় না। সেজন্য প্রেমের দেবতা ঈশ্বর, বিশ্বের সকল দৃশ্য, সকল সৌন্দর্য্য, সকল সঙ্গীত ও রসের মধ্য দিয়া তাঁহার আকর্ষণকারিণী শক্তিই প্রকাশ করিতেছেন এবং আমাদের প্রেম চাহিতেছেন। আমরা জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে সেই অসীমসুন্দরের অনন্ত প্রেমের দিকেই ছুটিয়া চলিয়াছি। সেই প্রেম ভিন্ন আমাদের আত্মার অনন্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কোথায়?

জ্ঞানী ও প্রেমিকেরা এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন; তাই তাঁহারা এই সত্যবাণীই আমাদিগকে শুনাইতেছেন। দুর্ভাগ্য আমাদের, আমরা এই বাণী শুনিয়াও শুনি না। শুনিলেও বিশ্বাস করিতে চাহি না। বিশ্বাস করিলেও তদনুসারে চলিতে পারি না। কিন্তু জ্ঞানী ও প্রেমিকেরা জীবনের ঐ মহাবাণী শুনিয়াই চলেন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হইয়াই কৃতার্থ হন।

ক্যাথেরিণ প্রেমময়ী নারী। প্রেমিকদিগের মহাবাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে। তাঁহার চিত্ত সেই অসীমসুন্দরের প্রেমের জন্যই অধীর হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি তাঁহার প্রেমের দেবতাকে লাভ করিবার জন্য দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস, বৎসরের পরে বৎসর তপস্যাই করিতে লাগিলেন। তৎপরে সাধিকা নারী সত্যসুন্দর পুরুষকে স্বামিরূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইলেন। ১৩৬৭ সালের পরেই তাঁহার আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্পন্ন হইল। এখন ঈশ্বরই তাঁহার সর্ব্বস্ব। তিনি চির-সতীত্ব লাভ করিবার জন্য সুপবিত্রচিত্তে ঈশ্বরেরই প্রেমমধুর-মূর্ত্তি ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে সৌভাগ্যবতী গভীর যোগের অবস্থা লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার সমাধি হইত। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে

নিগূঢ় যোগে যুক্ত হইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতেন। রেভারেণ্ড এল্‌বান বাটলার স্বরচিত সেণ্টদিগের জীবনচরিতগ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"প্রার্থনাই তাঁহার ক্ষুধার অন্ন ছিল। সর্ব্বশক্তিমানের সহিত যোগের প্রভাবে আত্মার রহস্যদ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়াছিল। তিনি এরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মুখে মুক্তির নিগূঢ় কথা শুনিয়া, শ্রোতামাত্রেরই মন স্তম্ভিত হইত। তাঁহার উপদেশ সকল গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত জীবন যেন একটি অলৌকিক ব্যাপার। কিন্তু সাধুগণ তাঁহার ধ্যানপরায়ণতারই অত্যন্ত প্রশংসা করিতেন। তিনি বড় বড় কাজে ব্যাপৃত থাকিতেন; তবুও অনেক সময়েই তাঁহার আত্মা ঈশ্বরের ধ্যানে মগ্ন থাকিত। তিনি এমন কঠোর সংযম অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, বহু বৎসর প্রভুর ভোজের রুটিটুকু খাইয়াই জীবন ধারণ করিতেন—এ কথা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। * * অনেক লোক তাঁহার বিরুদ্ধে মিথ্যা কুৎসা রটনা করিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তিনি আনন্দই অনুভব করিতেন। কোন দুঃখই তাঁহাকে বেদনা দিতে পারিত না। একবার তিনি একটি চমৎকার স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। স্বপ্নের মধ্যে স্বয়ং খ্রীষ্টই দুই হস্তে দুখানি মুকুট লইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। উহার একখানি স্বর্ণ মুকুট, আর একখানি কাঁটার মুকুট। খ্রীষ্ট ক্যাথেরিণকে বলিয়াছিলেন, এই দুইটি মুকুটের মধ্যে, তোমার যেটি ইচ্ছা সেইটি গ্রহণ করিতে পার। তিনি কাঁটার মুকুটখানিই গ্রহণ করিয়াছিলেন।"

১৩৭০ সাল হইতেই ক্যাথেরিণের উন্নত জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি পড়িতে লাগিল। তিনি লোকের নিকট অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বিস্তর লোক তাঁহাকে দেবীর মত মনে করিয়া, তাঁহার চরণতলে বসিয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিত। তিনি বিশ্বাসে

উদ্দীপ্ত হইয়া এক একটি বাক্য উচ্চারণ করিতেন। তাঁহার বাক্যের মধ্যে যেন ঐশীশক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিত। তাই তাঁহার জীবন্ত উপদেশ মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, আশ্চর্য্য শক্তি প্রকাশ করিত, অল্প দিনের মধ্যেই পাপীর মন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত। অনেক পাপিষ্ঠ পুরুষ ও কলঙ্কিনী নারী তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া, গুপ্ত পাপের কাহিনী খুলিয়া বলিত এবং অনুতাপ করিত। তিনি তাঁহার প্রেমে, সহানুভূতিতে এবং প্রার্থনাতে অনেক দুর্ব্বৃত্ত লোককে হৃদয়ের কাছে আকর্ষণ করিয়া লইতেন। তাহারা তপস্বিনীর উপদেশ শুনিয়া পাপ ত্যাগ করিত এবং ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইত।

ক্যাথেরিণ দিনের পরে দিন ধর্ম্মের অফুরন্ত উন্নতির পথেই অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যুন্নত জীবন দর্শন করিয়া লোকের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অনেকেই তাঁহাকে প্রশ্ন করিতেন, "আপনি কিরূপে ধর্ম্মের এইরূপ উচ্চাবস্থা লাভ করিয়াছেন?" তিনি এ বিষয়ে তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট যাহা বলিয়াছেন, তাহা "কুমারী ক্যাথেরিণ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। উহার সার মর্ম্ম এই :—

"আমার প্রভু স্বয়ং আমাকে জীবনের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। এ বিষয়ে মানুষের নিকট কোন সাহায্যই প্রাপ্ত হই নাই। প্রভুর আদেশবাণী শুনিয়াই আমি জীবনপথে চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। প্রথম প্রথম তাঁহার আদেশ শুনিয়াও নিঃসংশয়চিত্তে ও পূর্ণ বাধ্যতার সহিত উহার অনুসরণ করিতে পারি নাই। মনে ভাবিতাম, ইহা আমার প্রভুর আদেশ, না শয়তানের ছলনা, তাহা কিরূপে বুঝিতে পারিব? তৎপরে তিনি দয়া করিয়া তাঁহার আদেশ বুঝিবার একটি গূঢ় সঙ্কেত আমাকে বলিয়া দিলেন। প্রভু বলিলেন, আমার আদেশ ভয়ে আরম্ভ

হয় ও শান্তিতে পরিণত হয়। * * আমার আদেশ ও আমার দর্শন পাইলে আত্মা অত্যন্ত বিনীত হয়, দেবপ্রসাদে আত্মা আপনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ততা ও অসারতা অনুভব করে।

"আমার প্রভু একদা আমার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন—'বৎসে, তুমি কে এবং আমি কে, ইহা প্রথম অবগত হও। * * সেই পুরাকালের মহান্ আমি যাহা, তাহাই আমি। তুমি কিছুই নও। যদি এই দুইটি সত্য গভীর ভাবে তোমার আত্মাকে বিদ্ধ করে, তাহা হইলে কোন শত্রু তোমাকে প্রতারণা করিতে সমর্থ হইবে না।' একদিন প্রভু আমাকে এই কথা বলিলেন, 'বৎসে, তুমি আমাকে ভাবনা কর আমিও তোমার ভাবনা করিব।'

ক্যাথেরিণের কণ্ঠোচ্চারিত এই গভীর ভাবাত্মক ধর্ম্মকথাগুলি কি জীবন্ত ও প্রাণপ্রদ! উহা পাঠ করিলে হৃদয়ের তন্ত্রী কেমন এক স্বর্গীয় সুরে বাজিয়া উঠে।



সন্ন্যাসিনী ক্যাথেরিণের সংসারের ভোগের প্রতি কোনই আসক্তি নাই; কিন্তু সংসারের লোকের উপর প্রেম আছে এবং তাঁহার জনক-জননী ও ভ্রাতাদিগের প্রতি ভালবাসা আছে। তাঁহাদের সেবা তাঁহার ধর্ম্মেরই একটি অঙ্গ। সেজন্ত তিনি অনেক সময় পিতৃগৃহে বাস করিতেন। তখন পিতামাতা ও ভাইদের পরিচর্য্যায়, তাঁহার হৃদয় তৃপ্তিলাভ করিত। এখন আর ক্যাথেরিণের পিতা জীবিত নাই। তবুও তিনি জননীর সেবার জন্ত কিছুদিন পিতৃগৃহে বাস করিবেন, এইরূপ সংকল্প করিলেন। এই সময়ে ঈশ্বরের আদেশবাণী তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি

দেহের রক্ত দিয়া জনসমাজের সেবা করিবেন—ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

ক্যাথেরিণ সম্ভবতঃ ১৩৭০ সালে জননী ও ভ্রাতাদিগের পরিচর্য্যা এবং দীনদুঃখীর সেবার নিমিত্ত, কণ্‌ভেণ্ট হইতে পিতৃগৃহে গমন করিলেন। তখন তিনি যথার্থই লোকের সেবায় আপনার রক্ত দান করিতে লাগিলেন। একদিকে পীড়িত লোকদের সেবা ও শান্তিহারা লোকদিগকে সান্ত্বনা দান করিতেন; অন্যদিকে গৃহকার্য্যে ও জননীর পরিচর্য্যায় তাঁহার হস্ত দুখানি নিযুক্ত থাকিত।

১৩৭৪ সালে দেশে ভয়ঙ্কর মহামারী উপস্থিত হইল। শত সহস্র লোক ধ্বংস হইতে লাগিল। মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণার আর সীমা রহিল না। এই সময়ে ক্যাথেরিণ পীড়িত লোকদিগের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন। তখন এই মাতৃস্বরূপিনী নারীর মানব-প্রীতি দেখিয়া, সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল।

এই সময় হইতেই এই মহনীয়া নারীর সম্মান ও প্রতিপত্তি পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইল। দেশ-বিদেশের বিস্তর লোক উঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৩৭৫ সালে ফ্লোরেন্স নগরের অধিবাসিগণ পোপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। তখন পোপ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ক্যাথেরিণের উপরেই নির্ভর করিতে লাগিলেন। তিনি সন্ন্যাসিনীর বুদ্ধি-বিবেচনা, ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। পোপ ক্যাথেরিণকে কহিলেন—"শান্তি ছাড়া আমি আর কিছুই চাহি না। বিবাদ-নিষ্পত্তির সকল ভার আমি তোমার হস্তেই অর্পণ করিলাম। শুধু এইটুকু বলিতেছি যে, চার্চ্চের সম্মান যেন রক্ষা হয়।" দেশের প্রধান প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেটগণ বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য ক্যাথেরিণকেই পত্র লিখিলেন। এই শক্তিশালিনী নারীর চেষ্টাতেই বিবাদ মিটিয়া গেল। তবে, পোপ একাদশ গ্রেগারীর জীবিতকালে বিবাদ নিষ্পত্তি

হয় নাই, মৃত্যুর পরেই নিষ্পত্তি হইয়াছিল। বিবাদের সময়ে তেজস্বিনী নারী পোপকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করবার যোগ্য। আমরা পত্রের কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

"যিনি ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত, তিনি যদি আত্মসুখই খুঁজিয়া বেড়ান, তবে কি কাহারো মঙ্গল হয়? তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, ধর্ম্ম তাহার মধ্যে মৃত। * * আপনার অধীনস্থ যে সকল ধর্ম্মযাজক, অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত আছেন, আপনি তাঁহাদের ক্ষতস্থানে প্রলেপ লাগাইতেছেন কেন? তাঁহারা কষ্ট পাইবেন বলিয়া? * * এইরূপ লোক ত ভাড়া-করা মেষপালকের মত। নেকড়ের মুখ হইতে মেষকে রক্ষা করা ত তাঁহাদের উদ্দেশ্য নয়; তাঁহারা নিজেরাই মেষকে ভক্ষণ করিতে চাহেন। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল লোক ত ঈশ্বরকে ভালবাসেন না, ভালবাসেন আপনাদিগকে। আমি বলি, সকলেই যিশুর পথ অবলম্বন করুন। তিনি কি মেষের জন্যই আপনার প্রাণ দান করেন নাই? * * সেই পূর্ব্বের মহান্ গ্রেগারীর কথা স্মরণ করুন। তাঁহার ত আপনার মতই রক্তমাংসের দেহ ছিল। ঈশ্বর তখনও যেমন ছিলেন, এখনো তেমনই আছেন। হায়, আমাদের অন্য কিছুরই অভাব নাই, অভাব শুধু ধর্ম্মের। কই আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুলতা? কই আমাদের ঈশ্বরের জন্য আত্মার ক্ষুধা?"

যে রমণী পোপের অন্যায় কার্য্য দর্শন করিয়া ও তাঁহার অধীনস্থ লোকদিগের অধর্ম্মাচরণে মর্ম্মাহত হইয়া, এইরূপ তীব্র ভাষায় তাঁহাকে পত্র লিখিতে পারেন, তাঁহার মনের বল যে কত অধিক, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়।

এই শক্তিশালিনী নারী ধর্ম্মজীবনের যে অতি উন্নত অবস্থায় উপস্থিত

হইয়াছেন; সে কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার জীবন ক্রমশঃই ঈশ্বরের-সঙ্গে গভীর যোগে যুক্ত হইতে লাগিল। তাঁহার আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির কথা শুনিয়া নানা দেশের লোক, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। দূর-দূরান্তর হইতে সহস্র সহস্র লোক তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি বিশ্বাসে, প্রেমে ও পবিত্রতায় হৃদয় পূর্ণ করিয়া, জীবনের পরীক্ষিত সত্যবাণী উচ্চারণ করিতেন। উহাতে মানুষের হৃদয় বিগলিত হইত. অনেক অবিশ্বাসী বিশ্বাস লাভ করিত। এক এক সময় তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তি যাদুকরের ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ন্যায় মানুষের হৃদয়ের উপর আশ্চর্য্য কার্য্য করিত। তখন যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব হইত, যাহা স্বপ্নেরও অতীত, তাহাই সত্য হইয়া দাঁড়াইত। এ বিষয়ে আমরা একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ করিব। ঘটনাটি এই :—

পেরুগিয়া সহরে একটি ধনী যুবক বাস করিতেন। তাঁহার নাম নিক্‌লো টুল্‌ডো। তিনি জমিদার। সায়েনা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ উপস্থিত করেন। যুবকটির অন্য শত রকমের দোষ আছে; কিন্তু তিনি ষড়যন্ত্র করেন নাই—গবর্ণমেণ্টকে কতকগুলি কড়া কথা শুনাইয়াছিলেন মাত্র। অথচ সায়েনা গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। সেই আদেশ শুনিয়া যুবকের শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি ভাবিলেন, কি আশ্চর্য্য! কয়েকটি কথার জন্যই আমার প্রাণদণ্ড হইবে? এই কি ন্যায় বিচার? তবে কি ধর্ম্ম নাই? ঈশ্বর নাই? সংসারে কি কেবলই শয়তানের নিষ্ঠুর খেলা চলিয়াছে? যুবকটি ধর্ম্মের এবং ঈশ্বরেরই বিদ্রোহী হইয়া উঠিলেন। তাঁহার দুর্গতির আর সীমা রহিল না। তিনি অশান্তির আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া, যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে যুবকের

মর্ম্মান্তিক কাহিনী ক্যাথেরিণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি জননীর মত হৃদয়পাত্র স্নেহসুধায় পূর্ণ করিয়া, যুবকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার প্রেমের মায়া-মন্ত্রে ও উপদেশের ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে, সেই যুবকের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইল, তিনি ঈশ্বরের চরণে লুটাইয়া পড়িলেন। এ সম্বন্ধে ক্যাথেরিণের একখানি উৎকৃষ্ট চিঠি আছে। এই চিঠি তিনি তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যকে লিখিয়াছিলেন। চিঠিখানি মুদ্রিত হইয়াছে। ইউরোপের সর্ব্বত্রই এই প্রসিদ্ধ চিঠিখানির যথেষ্ট সমাদর। আমরা উহার কিয়দংশের মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"আমি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। আমার স্নেহ ও সান্ত্বনাতে তিনি যথেষ্ট শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমার নিকট তিনি তাঁহার পাপ স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি মৃত্যুর জন্ত সুন্দররূপে প্রস্তত হইয়াছিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাঁহার প্রাণদণ্ডের সময় উপস্থিত থাকিব। ভোর বেলায় আমি যুবকের কাছে উপস্থিত হইলাম। তখনো দণ্ডাজ্ঞা প্রচারের ঘণ্টা বাজে নাই। তিনি আমার সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করিলেন। তাঁহার শুধু চিন্তা এই যে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে বিশ্বাসে স্থির থাকিতে পারিবেন কি না। কিন্তু ঈশ্বরের করুণায়, যুবক মৃত্যুকালে তাঁহার প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—'আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না। আমার সঙ্গেই থাকিবেন। তাহা হইলেই আমি প্রসন্নচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব।' যুবক মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বুকের উপর মাথা রাখিলেন। আমি তাঁহার দেহের স্পন্দন ও নিশ্বাসের ভিতর দিয়া একটি সুমিষ্ট ভাব অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার হৃদয়ের প্রেম সেই ভাবের সঙ্গেই মিশাইয়া দিলাম। আমি বলিলাম—'ভাই, তুমি শান্ত হও। স্বর্গে

ঈশ্বরের যে প্রেমের ভোজ হইবে, আমরা শীঘ্রই গিয়া সেই ভোজে উপস্থিত হইব।' যুবকের মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'আমার উপরে আপনার কি দয়া!' যে স্থানটিতে তাঁহার মৃত্যু হইবে, তিনি সেই জায়গাটিকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন 'আমি আনন্দের সহিত বধ্যভূমিতে গমন করিব।' তিনি ঈশ্বরের করুণা ও মঙ্গলভাবসম্বন্ধে অতি চমৎকার কথা সকল বলিতে লাগিলেন। উহা শুনিলে হৃদয় দ্রব হইয়া যায়। * * যে কাঠের উপর যুবকটিকে হত্যা করা হইবে, আমি অগ্রে তাহার উপর মাথা রাখিলাম। আমার ইচ্ছা হইতেছিল, যুবকের পরিবর্ত্তে আমাকেই হত্যা করা হউক। আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কেন? আমার মনের মধ্যে যে ত্যাগের অহঙ্কার লুক্কায়িত ছিল। আমি প্রার্থনা করিতে লাগিলাম, হে ঈশ্বর, তুমি এই যুবককে আলোক ও সান্ত্বনা দান কর। যুবক যেন তোমার স্বর্গরাজ্যে উপনীত হইতে পারে। বধ্যভূমিতে বিস্তর লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই যুবক ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। আমি তাঁহার সুন্দর মুখখানি দেখিতেছিলাম। তিনি শান্ত মেষের মত ধীরে ধীরে বধ্যভূমিতে উপনীত হইলেন। আমাকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখখানি হাসিতে ভরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম—প্রিয় ভ্রাত, এই বার তুমি মস্তক নত কর। তুমি তোমার অনন্তজীবনের দ্বারে উপনীত হইয়াছ। তুমি প্রস্তুত হও।' যুবকটি শুইয়া পড়িল। আমি তাঁহার মস্তক 'মরণ-কাঠের উপরে রাখিলাম। যিশুর মৃত্যুকাহিনীও তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলাম। 'ঈশ্বর' ও 'ক্যাথেরিণ' এই দুইটি শব্দই তাঁহার মুখে উচ্চারিত হইল। 'তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক',—এই কথা বলিয়াই আমি নয়ন নিমীলিত করিলাম। তাহার পরে যুবকের ছিন্ন মস্তক

আমাব হাতের উপরে আসিয়া পড়িল।”

রাজদণ্ডে দণ্ডিত একটি ধর্মদ্রোহী যুবককে যখন হত্যা করা হইবে, তখন যে নারী তাঁহার অন্তরে ধর্মবিশ্বাস উদ্দীপ্ত করিতে পারেন, আশা ও আনন্দ বিকশিত করিয়া তুলিতে পারেন এবং তাঁহার শান্তি ও মুক্তির জন্ত হৃদয়ের সমস্ত প্রেম ঢালিয়া দিতে সমর্থ হন, তিনি যে পৃথিবীর কতটা উর্দ্ধে বাস করেন, তাহা কে নির্ণয় করিবে?

তপস্বিনী ক্যাথেবিণের সেবাব কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু তিনি যে কিরূপে কুষ্ঠ ও সংক্রামক রোগীর সেবা করিয়াছেন, তাহা বলা হয় নাই। বলা বড়ই প্রয়োজন। সেই সেবার কাহিনী অতীব চিত্তাকর্ষক। শুনিলে চোখের জল ঝরিয়া যায়, আর মনে হয়, স্বর্গেব করুণাই যেন নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া এবং ক্যাথেবিণ নাম গ্রহণ করিয়া এই মর্ত্ত্যে নামিয়া আসিয়াছে।

আমরা অতি সংক্ষেপে ক্যাথেরিণের দুইটি কার্য্যের উল্লেখ করিব। একটি স্থানে এক দুর্ভাগিনী স্ত্রীলোকের কুষ্ঠরোগ জন্মিল। তাহার নাম টেক্কা। তাহার কঠিন পীড়া অতি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইল। রোগিনীর ক্ষত স্থানের দুর্গন্ধে মানুষ আর তাহার ঘরে মুহূর্ত্তও টিকিতে পারিত না। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে একটা মাঠে ফেলিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই কথা ক্যাথেরিণের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দুর্ভাগিনীর সেবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়েরা বলিল— ”সে কি কথা? তুমি টেক্কার সেবা করিতে গিয়া, তোমার অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন দিবে? তাহা ত কিছুতেই হইতে পারে না।”

ক্যাথেরিণের প্রাণের প্রেম সেই অভাগিনী নারীর পানেই ছুটিয়া চলিল; কে তাঁহাকে সেবার পথ হইতে ফিরাইবে? তিনি আপনার ভগিনীর মত টেক্কার সেবা করিতে লাগিলেন। হয় ত কঠিন পীড়ার

জন্যই স্ত্রীলোকটির স্বভাব একেবারে বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। ক্যাথেরিণ ধ্যান ও প্রার্থনার জন্য, তাহার নিকট হইতে দূরে একটি নির্জ্জন স্থানে চলিয়া যাইতেন, ইহাতেও সেই কোপনস্বভাবা নারী রাগে জ্বলিয়া উঠিত এবং তাঁহাকে গালাগালি দিত। তিনি সমস্ত দুর্ব্বাক্য মাথা পাতিয়া লইয়া রোগিনীর সেবা করিতেন।

ক্যাথেরিণ যে আশ্রমে থাকিতেন, সেই আশ্রমেই একটি স্ত্রীলোক বাস করিত। তাহার নাম এণ্ড্রিয়া। সেও সন্ন্যাসিনী। তাহার অঙ্গে ক্ষত হইয়া বক্ষঃস্থল পচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। ক্ষত স্থানটির এমনই দুর্গন্ধ যে, কাহার সাধ্য তাহার সেবা করে? অবশেষে ক্যাথেরিণই তাহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু হায়, ক্যাথেরিণ প্রাণপণ করিয়া যে আশ্রমবাসিনীর সেবা করিতেছিলেন, সে ত মানবী নয়—সে যে দানবী। সে ত ধর্ম্মলাভ করিবার জন্য সন্ন্যাসিনী হয় নাই, সে চায় মানুষের প্রশংসা। তাই সে বাহিরে ধর্ম্মের ভাণ করিয়া সকলের মন ভুলাইত, কিন্তু তাহার অন্তরে কাল সর্পের বিষ রক্ষা করিত। এবার সুযোগ বুঝিয়া সেই বিষ ক্যাথেরিণের অঙ্গে ঢালিয়া দিল। তাঁহার বিশ্বাস ভক্তি ও আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া এণ্ড্রিয়ার মন হিংসায় জ্বলিয়া উঠিত। ক্যাথেরিণ যে তাহারই মত কপটতা ও প্রবঞ্চনা করিয়া মানুষের চোখে ধূলা দিতে পারিত না, সে যেন তাঁহার মস্ত বড় একটা অপরাধ। এজন্য হিংসা-পরায়ণা স্ত্রীলোক অবলীলাক্রমে ক্যাথেরিণের নামে অতি জঘন্য কুৎসা রটনা করিতে লাগিল। এই ছদ্মবেশিনী রাক্ষসী সত্যের মাথার উপরে দুখানি পা রাখিয়া, মিথ্যার চমকে ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মন ভুলাইয়া ফেলিল। এণ্ড্রিয়া বলিতে লাগিল—"ক্যাথেরিণ আমাকে পরিচর্য্যা করিবার ভাণ করিয়া, গোপনে পাপের সেবা করিয়া থাকে।"

কোন কোন ধর্ম্মযাজক ও সন্ন্যাসিনী মিথ্যাবাদিনী স্ত্রীলোকের কথাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন। রমণী আর যত রকম নিন্দাই সহ্য করুন না কেন, চরিত্রসম্বন্ধীয় কুৎসা তাঁহার পক্ষে একেবারেই অসহনীয়। কিন্তু ক্যাথেরিণ কাহারো বিরুদ্ধে কিছুই বলিলেন না। তিনি শুধু কলঙ্কভঞ্জন ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন।

একদিন আশ্রমের কয়েকটি রমণী প্রকাশ্যভাবেই ক্যাথেরিণকে ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল। শুদ্ধাচারিণী ক্যাথেরিণ আর আত্ম-সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, "তোমরা বিশ্বাস কর, আমি কুমারী—আমি চিরকুমারী। কোন কলঙ্ক আমার কুমারী ব্রতকে মলিন করিতে পারে নাই।"

এই সমস্ত কথা ক্যাথেরিণের মাতা লাপার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি উন্মাদিনীর মত ছুটিয়া কন্যার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ক্যাথেরিণ যে পবিত্রতার প্রতিমা, সে কথা লাপা অতি উত্তমরূপেই জানিতেন। তিনি কন্যাকে কহিলেন—"আমি তোর অপমান সহ্য করিতে পারি না। তুই কিছুতেই সেই রাক্ষসী এণ্ড্রিয়ার পরিচর্য্যা করিতে পারিবি না। তুই যদি আবার সেই হতভাগিনীর গৃহে গমন করিস্, তবে বুঝিব, আমি এখন আর তোর কেহই নই।"

ক্যাথেরিণ বলিলেন—"মা, মানুষ ত কতবার ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতেছে, কতবার তাঁহার কাছে অপরাধ করিতেছে; তাহা বলিয়া ঈশ্বরের করুণা কি মানুষকে ত্যাগ করিতে পারে? আমাদের প্রভু যিশু কি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াও শত্রুর কল্যাণকামনা করেন নাই? তবে আমি কেন এণ্ড্রিয়াকে ক্ষমা করিতে পারিব না? প্রভু পরমেশ্বরই এণ্ড্রিয়ার সেবার ভার আমার হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। এখন তাহাকে ত্যাগ করিলে, আমি কি ঈশ্বরের নিকট অপরাধিনী হইব না?"

ক্যাথেরিণের কথা শুনিয়া জননী লাপার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাঁহার কন্যার হৃদয় যে মলিন পৃথিবী হইতে অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গিয়াছে, আর এই সংসারের তুচ্ছ নিন্দা প্রশংসার জন্য তাঁহার প্রাণের প্রেম যে সঙ্কুচিত হইবে না,—তিনি তাহা বুঝিতে পারিলেন।

অবশেষে সত্য সত্যই প্রেমে পাষাণ গলিয়া গেল; পীড়িতা রমণীর মনের পরিবর্ত্তন হইল। এণ্ড্রিয়া দেখিল, সে যে ব্রহ্মচারিণীর চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা করিয়াছে, সেই নারী প্রতিদিন হৃদয়পাত্র প্রেমে পূর্ণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেছেন এবং আপনার বুকের রক্ত দিয়া তাহার সেবা করিতেছেন। সে আর কতদিন হিংসা বিষে অন্তর পূর্ণ করিয়া রাখিবে? তাহার পাষাণ প্রাণ বিগলিত হইল, অন্তরে অনুতাপের আগুন জ্বলিয়া উঠিল; সে ক্যাথেরিণের পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিল এবং কহিল—

"ভগিনি, তুমি ত মানবী নও, তুমি দেবী। আমি দুর্ভাগিনী নারী, আজ অনুতাপের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাকে মার্জ্জনা কর। ভগিনি, আজ আমাকে মার্জ্জনা কর।"

এণ্ড্রিয়া আর অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না। সে একদিন ধর্ম্মযাজক ও আশ্রমবাসিনীদিগকে মিলিত করিয়া বলিতে লাগিল— "আমি এতদিন ক্যাথেরিণের চরিত্রের বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসা রটনা করিয়াছি, সে সকলই মিথ্যা। এই তপস্বিনীর চরিত্র সৌরভযুক্ত পুষ্পের ন্যায় নির্ম্মল। ইনি প্রীতি, করুণায় ও ক্ষমায় মূর্ত্তিমতী দেবী। পবিত্রাত্মা সর্ব্বদাই ইহার অন্তরে থাকিয়া ইহাকে পরিচালিত করেন। আমি শয়তানের দ্বারা পরিচালিতা হইয়াই ক্যাথেরিণের নামে মিথ্যা অপবাদ রটনা করিয়াছি।"

এই ঘটনার পরে ক্যাথেরিণের প্রতি লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরো বর্দ্ধিত হইল। সকলেই তাঁহাকে আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্না তপস্বিনী মনে করিয়া, তাঁহার যশোগান করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে ক্যাথেরিণের জীবনে নব নব ভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তিনি যেন আত্মার অনন্ত উন্নতির পথেই যাত্রা করিলেন। এখন ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হইয়া থাকা ও নরনারীর সেবা করা ভিন্ন, তাঁহার আর আকাঙ্ক্ষার বিষয় কিছুই রহিল না। তপস্বিনীর এই উন্নত আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে "কুমারী ক্যাথেরিণ" গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন :—

"পুণ্যের আলোকে ক্যাথেরিণের সমস্ত জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, শান্তি ও আনন্দামৃত অন্তরে নিত্য বিদ্যমান রহিল। ক্যাথেরিণের ভাবান্তর ও রূপান্তর হইয়া গেল। স্বর্গীয় বিমল জ্যোতিতে তাঁহার চক্ষু অনবরত তাঁহার প্রভুকে দর্শন করিতে লাগিল। তিনি সমাধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ঈশ্বরদর্শনে ও ঈশ্বরের নাম শ্রবণে, তাঁহার মন এমনই নিমগ্ন হইত যে, তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা আর থাকিত না, শরীর মৃত দেহের ন্যায় পড়িয়া থাকিত। আত্মা পরমাত্মাতে প্রেমানন্দে ডুবিয়া যাইত।"

কিন্তু অকালেই এই তপস্বিনী নারীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঈশ্বর তাঁহাকে আপনার কাছেই আহ্বান করিলেন। তাই তিনি পরলোক-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশেষে ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দিন ক্যাথেরিণ একে একে সম্মুখস্থ পুরুষ ও মহিলাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে শুধুই একটি কথা বাহির হইল—

"হে প্রভু, তোমার হস্তেই আমার আত্মাকে সমর্পণ করি।"

ইহাই ক্যাথেরিণের শেষ কথা। এই কথার পরেই তিনি দেহ ত্যাগ



ম্যাডাম গেয়োঁ

করিলেন। তাঁহার আত্মা পরলোকে প্রস্থান করিল। এই সময়ে তপস্বিনীর সবেমাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল।

ক্যাথেরিণের মৃত্যুর পরে ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পোপ তাঁহাকে সেণ্ট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহার জীবনসম্বন্ধে ধর্ম্মযাজক বাটলার লিখিয়াছেন—"তিনি বিধাতার নিকট হইতে কি গভীর আনন্দ ও আশ্চর্য্য দয়া লাভ করিয়াছিলেন! ঈশ্বর তাঁহার দ্বারা কি বিচিত্র কার্য্যই করাইয়া লইয়াছেন। তিনি আমাদিগের জন্য তাঁহার জীবনের মহৎ আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন; আর রাখিয়া গিয়াছেন—ছয়টি প্রবন্ধ, কুমারী মেরীর সম্বন্ধে একটি উপদেশ এবং চৌষট্টিখানি চিঠি। উহাই তাঁহার প্রতিভার নিদর্শন।"



তপস্বিনী ম্যাডাম গেয়োঁ

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিণয়

তপস্বিনী ম্যাডাম গেয়োঁ ফরাসীদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উষার স্বর্ণরশ্মির ন্যায় তাঁহার জীবনের আলোক সমস্ত ইউরোপে পতিত হইয়াছিল। এখনো পাশ্চাত্য দেশের বিস্তর ধর্ম্মপিপাসু লোক এই ভক্তিমতী নারীর পুণ্যকাহিনী শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করেন ও তাঁহার উপদেশ হইতে আলোক প্রাপ্ত হন। শুধু সে দেশের কথাই বা বলি কেন? এই বাঙ্গলাদেশেরই অনেক ধর্ম্মপরায়ণ লোক আগ্রহের সহিত তাঁহার জীবনচরিত পাঠ করেন; ভক্তিরসে তাঁহাদের চিত্ত আপ্লুত

হইয়া যায়। এজন্ত আমি এই বিদেশিনীর ক্ষুদ্র একটি জীবনচরিত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ম্যাডাম গেয়োঁ স্বয়ং লিখিয়াছেন—"এই পৃথিবীর একান্ত অনুরক্ত প্রেমিক তাহার প্রেমাস্পদকে যেরূপ ভালবাসে, আমি ঈশ্বরকে তাহার চেয়ে অনেক বেশি ভাল বাসি।"

এই অল্প কয়েকটি কথা পাঠ করিয়াই আমরা ভক্তিমতী নারীর হৃদয়ের প্রেম অনুভব করিতেছি। আমার রচনার সঙ্কীর্ণ স্থানটুকুর মধ্যে বিশেষ ভাবে এই প্রেমের কাহিনী বর্ণনা করিতেই চেষ্টা করিব।

ম্যাডাম গেয়োঁ ফরাসীদেশের মোটার-ঝিঁ সহরে ১৬৪৮ সালের ১৩ই এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার আসল নাম জাঁ-মারি বুবি-এয়ার-ডি-লা-মোথ। জাঁ-মারির পিতা দেশের একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী লোক ছিলেন। তাঁহার টাকাকড়ি যথেষ্টই ছিল। তখন ফরাসীদেশের টাকাওয়ালা লোকের সাম্‌নে সুখের হাজার দরজা খোলা থাকিত। তাই জাঁ-মারি অত্যন্ত সুখের মধ্যেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শৈশবকালেই কোমল অন্তরে ধর্ম্মের সরল ও মধুর ভাবগুলি বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আমি যদিও খুব ছোট বালিকা ছিলাম, তবুও ঈশ্বরের কথা শুনিতেই ভাল-বাসিতাম। তখন সন্ন্যাসিনী সাজিতে আমার বেশ ভাল লাগিত।"

জাঁ-মারি চারি বৎসর বয়সের সময়ে একটি কন্‌ভেণ্টে ভর্ত্তি হইয়া লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিভা ছিল, স্মরণশক্তিও খুব বেশি ছিল; তাই অল্প সময়ের মধ্যেই অধিক শিখিয়া ফেলিতেন। জাঁ-মারির যখন এগার বৎসর বয়স, তখন বাইবেল গ্রন্থখানি তাঁহার হাতে পড়িল। এখানি তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ। বালিকা এই বইখানি পাইয়া, মনে আর আনন্দ ধরিয়া রাখিতে

পারিলেন না। তিনি এই দিনটিকে জীবনের একটি বিশেষ স্মরণীয় সুদিন বলিয়া মনে করিতেন। তখন সাধারণ লোকেরা বাইবেলকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ বলিয়াই মনে করিত। পুরোহিত ছাড়া অন্য লোকের হাতে এই বই বড় একটা দেখা যাইত না। বালিকা দৈবাৎ বইখানি প্রাপ্ত হইয়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উহাই পড়িতে লাগিলেন। খৃষ্টের এক একটি চমৎকার উপদেশ তাঁহার সরল প্রাণে কল্পনার তরঙ্গ তুলিতে লাগিল। এমন ভাল বই তিনি ত আর কখনই পড়েন নাই। তিনি স্মরণশক্তির সাহায্যে বাইবেলের চিত্তাকর্ষক অংশটি কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। ছেলেদের সুমিষ্ট গল্পের বহির মত এই ধর্ম্মপুস্তকখানি তাঁহার প্রিয়গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইল।

বালিকার বার বৎসর বয়সের সময়ে তাঁহার চিত্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল; ঈশ্বর ভিন্ন তিনি যেন আর কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন না। তাই তিনি আপনার সুপবিত্র কুমারী হৃদয় পরমেশ্বরের চরণে উৎসর্গ করিতে চাহিলেন।

কিন্তু বালিকার অন্তরের এই ধর্ম্মোচ্ছ্বাস নিতান্তই সাময়িক। এখনো তরুণ বয়সের চঞ্চলতা তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া আছে। কাজেই তিনি আপনার উচ্চ সঙ্কল্প অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে সুখস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিল। তাই তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্যোতি ম্লান হইয়া পড়িল।

তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। দেখিতেও পরমা সুন্দরী। বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই মাধুর্য্যে তাঁহার মূর্ত্তি মনোহারিণী হইয়া উঠিল। তাঁহার জননী কন্যাকে, বসনে-ভূষণে, কুসুমিত লতাটির মত সাজাইয়া রাখিতে চাহিতেন। কন্যার নিজেরও বেশ-বিন্যাস ও দেহের পারিপাট্যের দিকে মনটি ঝুঁকিয়া পড়িল। তিনি, আপনার পুষ্পের মত সুন্দরমুখখানি

প্রেমে ঢল ঢল নয়ন দুটি, নবনীত-সুকুমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্বচ্ছ-দর্পণে নিরীক্ষণ করিয়া রূপগর্ব্বে গর্ব্বিতা হইয়া উঠিতেন। ধীরে ধীরে বিলাসিতা ও সুখস্পৃহা তাঁহার অন্তরে মায়াকুহক রচনা করিতে লাগিল। তাঁহার নারীহৃদয় ঈশ্বরের প্রেমের চেয়ে মানুষের ভালবাসা পাইবার জন্যই চঞ্চল হইয়া উঠিল। বালিকার অল্প বয়স, তরল প্রকৃতি, তাই তাঁহার মনের অত্যন্ত পরিবর্ত্তন হইল বটে; কিন্তু সেজন্য তাঁহার পূর্ব্বের ধর্ম্মোচ্ছ্বাস ও ভক্তিটুকু কৃত্রিম বা মনের একটা খেয়াল বলিয়া ভাবিবার কোনই কারণ নাই।

জাঁ-মারির যখন চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স, সৌন্দর্য্যে সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ; তখন একটি অরুণকান্তি তরুণ যুবক, তাঁহার কমনীয় মুখশ্রী ও রমণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইল এবং বালিকার হৃদয়মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পরিণয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। জাঁ-মারির চিত্ত যে সেই যুবকের দিকে একটুকু ঝুঁকিয়া পড়ে নাই, এমন কথাও বলা যায় না। কিন্তু তাঁহার পিতা পাত্রটিকে আদবেই পছন্দ করিলেন না। সে জন্য বিবাহ হইতে পারিল না। তাহার পরে জাঁ-মারির পিতা পুত্র-কন্যাদিগকে লইয়া প্যারিস সহরে গমন করিলেন। প্যারিস চির দিনই সৌন্দর্য্যের মায়াপুরী; তখনো সাজসজ্জায় মানুষের মনে চমক লাগাইয়া দিত—বিলাসিতার মায়ামন্ত্রে নরনারীর হৃদয়ে কুহক বিস্তার করিত। এই স্থানেই ধনীর ছেলে এম, জে, গেয়োঁর অনুরাগ-দৃষ্টি জাঁ-মারির উপর পতিত হইল; তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহার পিতার নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। যাঁহার ঘরে টাকা ও বাহিরে পদমর্য্যাদা আছে, তাঁহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিতে কয় জন পিতারই বা আপত্তি হইয়া থাকে? এখানেও পাত্রীর পিতার কোন রকম আপত্তি হইল না। পাত্রের বয়স বেশি হইয়াছে, তিনি ধর্ম্মবিষয়ে

একেবারেই উদাসীন ; কন্যা হয় ত তাঁহাকে পছন্দই করিবে না ;—পিতা এই সকল গুরুতর কথা মোটেই ভাবিয়া দেখিলেন না। তাহার পরে পাত্রী যখন পাত্রকে দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিলেন, তখন তিনি কিছুতেই সুখী হইতে পারিলেন না।

কিন্তু তাহাতে পিতার মতের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি ১৬৬৪ সালের ২১শে মার্চ্চ এম, জে, গেয়োঁর সঙ্গেই কন্যার বিবাহ দিলেন। এই সময়ে জাঁ-মারির বয়স ষোল বৎসর ও তাঁহার স্বামীর আটত্রিশ বৎসর হইয়াছিল। বিবাহের পরে জাঁ-মারি ম্যাডাম গেঁয়ো নামেই খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা ও ধর্ম্মের উন্মেষ

ম্যাডাম গেয়োঁর অনিচ্ছাতেই বিবাহ হইল বটে ; তবুও তাঁহার আশা ছিল, তিনি প্রীতি ও সুমিষ্ট ব্যবহারের দ্বারা স্বামীকে সুখী করিবেন, নিজেও সুখী হইবেন। কিন্তু কিছুদিন স্বামীর গৃহে বাস করিবার পরে তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার সে আশা নিষ্ফল হইবে। তিনি পিতামাতার অতিশয় আদরের কন্যা। তাঁহাদের যত্ন ও মমতার মধ্যেই ফুলটির মত ফুটিয়া উঠিয়াছেন। শশুরগৃহে সে রকম মমতা ও আদর পান বা না পান, শাশুড়ীর কাছে একটু স্নেহ একটু ভাল ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা করিতে পারেন। কিন্তু এরকম রুক্ষমূর্ত্তি শাশুড়ী

কে কোথায় দেখিয়াছে? সামান্য একটু কিছু হইলেই তাঁহার মেজাজ বিগড়াইয়া যায়। তখন তিনি শুধু নিজেই বধূকে গঞ্জনা দিয়া খুসী হইতে পারেন না; এ-কথা সে-কথা বলিয়া ছেলেরও মুখভার ও মন খারাপ করিয়া তোলেন। তিনি স্ত্রীর প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে চোখের জলে ভাসাইতে থাকেন।

ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর স্বভাব যে নিতান্ত মন্দ, তাহা নহে। তবে তিনি বড় অসহিষ্ণু; সহজেই উত্তেজিত হন, সামান্য কারণেই তাঁহাব মন খারাপ হইয়া যায়। বুদ্ধিমতী বালিকা বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাবা একটুতেই চটিয়া উঠেন, পরিবারের লোকদিগকে সকল সময়েই হুকুমেব নীচে মাথা নীচু করিয়া রাখিতে চাহেন, তাঁহাদের কাছে বাস কবিযা কেহই সুখী হইতে পারে না, কাহারো মনের ভাব স্ফূর্ত্তি পায় না।

ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তরে এখনো ধর্ম্মেব উচ্চ ভাব পরিস্ফুট হয় নাই, সে কথা সত্য বটে; তবু ত তিনি খুব ভাল মেয়ে। তাঁহার বুদ্ধি আছে, সহিষ্ণুতা আছে, স্বভাবের মাধুর্য্য আছে, অথচ তাঁহাকে স্বামীব গৃহে আসিয়া দুঃখকেই হৃদয় পাতিয়া গ্রহণ করিতে হইল।

তরুণী বধূর এই দুঃখের অশ্রুতেই নয়ন নির্ম্মল হইল, তাঁহাব এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি বিশ্বাস-নয়নে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার জীবনের পশ্চাতে করুণাময় ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত রহিয়াছে। স্বয়ং ভগবানই তাঁহার দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য তাঁহাকে দুঃখ ও পরীক্ষার আগুনের মধ্যে ফেলিয়াছেন। সুতরাং তিনি এখন হইতে দুঃখ ও নির্য্যাতন ঈশ্বরের হস্তের বেদনার দান বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এতদিন যে দুঃখের অগ্নিশিখা তাঁহার হৃদয়কে জ্বালাময়ী করিয়া তুলিত এখন সেই অগ্নিশিখার মধ্য দিয়াই আধ্যাত্মিক জ্যোতি স্ফুরিত হইল। ম্যাডাম গেয়োঁর অন্তর হইতে রূপের অহঙ্কার ও সুখের তীব্র আকাঙ্ক্ষা

চলিয়া গেল। দুঃখের কঠিন আঘাতে তাঁহার পার্থিব বাসনা চূর্ণ হইতে লাগিল। তিনি দুখানি হস্ত প্রসারিত করিয়া জীবন্ত ধর্ম্ম বক্ষে ধারণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য তাঁহার মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল। তৎপরে তিনি পিতৃগৃহে গমন করিলেন। সেখানে শুভ মুহূর্ত্তে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ সম্প্রদায়ের একজন সৌম্যমূর্ত্তি সাধুর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।

এই সাধুপুরুষ একজন তপস্বী। তিনি পাঁচ বৎসর নির্জ্জনে তপস্যা করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে অন্তরের যোগ স্থাপন করিয়াছেন। এখন নরনারীর আত্মার কল্যাণসাধনই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। ম্যাডাম গেয়োঁ এই ঋষিতুল্য পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভক্তিতে তাঁহার মস্তক নত হইয়া পড়িল। তিনি তপস্বীর নিকট জীবনের সমস্ত কথাই প্রকাশ করিলেন এবং কহিলেন—"ঈশ্বরকে লাভ করিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু আমি নিরন্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে পাইতেছি না।"

সাধুপুরুষ ম্যাডাম গেঁয়োর জীবনের কাহিনী শ্রবণ করিলেন। তাঁহার চিত্ত ঈশ্বর-চিন্তায় ডুবিয়া গেল। তিনি ছোট একটি প্রার্থনা করিলেন। তাহার পরে তিনি বলিলেন—"বৎসে, তুমি এতদিন ঈশ্বরকে শুধুই বাহিরে অন্বেষণ করিয়াছ, সেজন্য তোমার চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে। তোমার হৃদয়ের মধ্যেই তিনি বিরাজিত। তুমি সেখানে অনুসন্ধান কর, নিশ্চয়ই তাহাকে প্রাপ্ত হইবে।"

সাধুপুরুষ এই সামান্য কয়েকটি কথা বলিয়াই প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ঈশ্বর যখন মানুষের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেন, তখন সামান্য কথাই অসামান্য হইয়া উঠে। আজ তাহাই হইল। সাধুপুরুষের কণ্ঠোচ্চারিত বাণীর মধ্য দিয়া, ম্যাডাম গেঁয়োর অন্তরে যেন এক

আধ্যাত্মিক বিদ্যুৎ নামিয়া আসিল; তাঁহার হৃদয়ে ঐশীশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইল; তিনি প্রাণে ঈশ্বরের স্পর্শ অনুভব করিলেন। ঈশ্বরের আলোকেই তাঁহার মনে ধর্মের গভীর তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই তত্ত্ব তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। উহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ এই:—

"কতকগুলি বাহিরের অনুষ্ঠান করিয়া কিছুতেই ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। শুধুই বহির্জ্জগতে ঘুরিয়া বেড়াইলে ঈশ্বর-দর্শন হয় না। মানুষ চিন্তা করিয়া ও বহির্জ্জগতের আলোচনা করিয়া, দূরস্থ এক মহান্ পুরুষের জ্ঞানে উপনীত হইতে পারে, সে রকম সিদ্ধান্ত যে অসত্য, তাহাও নহে। কিন্তু আমরা ঈশ্বরকে অন্তরে দর্শন করিতে না পারিলে, তিনি যে আমাদের, আমরা যে তাঁহার, এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারি না। আমাদের আত্মার সহিত তাঁহার মিলনও হয় না। আমরা তাঁহার সহিত প্রেমে এক হইতেও পারি না। তিনি যে আমাদের হৃদয়-মন্দিরে নিরন্তর বিরাজিত, তাহাও অনুভব করিতে সমর্থ হই না।"

১৬৫৮ সালের ২২শে জুলাই ম্যাডাম গেঁয়োর অন্তরে এই আধ্যাত্মিক-ভাবের স্ফুরণ হইল। তখন তাঁহার বয়স কুড়ি বৎসর মাত্র। সে দিন আনন্দোচ্ছ্বাসে ও ভাবাবেশে সমস্ত রাত্রি তিনি একটুকু ঘুমাইতে পারিলেন না। এই তারিখটি তাঁহার নবজীবন লাভের একটি স্মরণীয় দিন। তিনি এই দিবসের ঘটনাসম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"এই সময়ে আমি অনুভব করিলাম, ঈশ্বরের প্রেম যেন তীরের মত আমার মর্ম্মস্থানে বিদ্ধ হইল। এই প্রেমের স্পর্শ কি সুমধুর! এই প্রেমাস্ত্র আমার হৃদয়ে যে ক্ষতচিহ্ন আঁকিয়া দিল, তাহা থাকুক, চিরদিন থাকুক। আমি কত বৎসর যাঁহাকে খুঁজিতেছিলাম, সাধুর অমূল্য উপদেশ তাঁহাকেই আমার প্রাণের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত

করিল! যাহা আমি দেখিতে পাই নাই, তাহাই দেখিলাম, যাহা বুঝিতে পারি নাই তাহাই বুঝিলাম। হে আমার প্রাণের ঈশ্বর, তুমি ত এই হৃদয়মন্দিরেই বিরাজিত ছিলে; তবুও কেন তোমাকে দেখিতে পাই নাই? * * হে চির-সুন্দর, কেন তোমাকে এতদিন পরে জানিতে পারিলাম? ইহার কারণ এই যে, 'The Kingdom of God is within you' 'তোমার হৃদয়ের মধ্যেই ঈশ্বর বাস করেন' এই মহা-বাণীর অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি, তুমিই আমার হৃদয়ের রাজা; থাক, থাক, চিরদিন এই হৃদয়ের প্রভু হইয়া থাক।'

ম্যাডাম গেয়োঁ তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল কাচখণ্ডের ন্যায় পবিত্র রাখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। মহাত্মা যিশু বলিয়াছেন—'যাহাদের চিত্ত নির্ম্মল, তাহারাই ধন্য; কারণ তাহারাই ঈশ্বরের দর্শন পাইবে।' এই উক্তির মধ্যে গভীর সত্য নিহিত রহিয়াছে। সত্যসুন্দর ঈশ্বর নিরন্তর আত্মার মধ্যেই বাস করিতেছেন, এ কথা যথার্থ বটে; কিন্তু অন্তর শুদ্ধ ও মনের দৃষ্টি নির্ম্মল না হইলে, কে সেই হৃদয়স্থিত দেবতাকে দর্শন করিতে পারে? অন্তর শুদ্ধ ও মন পবিত্র রাখিতে হইলেই সংযম চাই, বৈরাগ্য চাই। সেজন্য সুখস্পৃহা খর্ব্ব হওয়া প্রয়োজন। তাই ম্যাডাম গেয়োঁ থিয়েটারে ও নাচগানের আসরে যাওয়া বন্ধ করিলেন। শুধু তাহাই নহে; যে সকল প্রমোদচঞ্চলা নারী নৃত্যগীত ও ক্রীড়াকৌতুকের জন্য অর্থ ব্যয়, স্বাস্থ্যক্ষয় ও সময় নষ্ট করিতেন, তিনি তাঁহাদের দেখিয়া ভাবিতেন, হায়, একদিন আমিও ত ঐ সকল স্ত্রীলোকের মত রঙ্গালয়ে ও নৃত্যসভায় গিয়া প্রমোদে মাতিয়া উঠিতাম।

এখন ধর্ম্মপরায়ণা নারীর নিকট ঈশ্বরের প্রেমই কেবল প্রার্থনার সামগ্রী। তাই তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত পুরুষকে প্রেমের দেবতারূপে

বরণ করিবার জন্ম অধীর হইয়া উঠিলেন এবং উপাসনা ও প্রার্থনাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিলেন। তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—

"এখন হইতে উপাসনা আমার নিকট সহজসাধ্য হইয়া গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুহূর্ত্তের ন্যায় চলিয়া যাইত। প্রার্থনা ব্যতীত আমি কিছুই করিতাম না। প্রেমের আধিক্যে সময়ের দীর্ঘতা অনুভব করিতেই পারিতাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মপথে—রক্তাক্ত চরণে

ম্যাডাম গেয়োঁর শুষ্ক ও সংগ্রামপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেম নামিয়া আসিয়াছে। পুণ্যশ্রীতে জীবন পবিত্র ও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মনের আর যে কোথাও কোন রকম সংশয়, বিকার অথবা আমিত্বের উগ্র ভাব লুকাইয়া আছে, তাহা তিনি ভাবিতেও পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল, অতীত জীবনের সকল অপরাধই ঈশ্বর মার্জ্জনা করিয়াছেন। তাঁহার পাপের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর সংসারের কোন রকম আসক্তি তাঁহার চিত্ত চঞ্চল করিয়া তুলিতে পারিবে না। এই সময়ের অবস্থা-সম্বন্ধে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"আমি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছুই সম্মুখে দেখিতে পাইতাম না। অতিশয় পবিত্র মনে ও দৃঢ়তার সহিত তাঁহাকে ভালবাসিতাম বলিয়া আমার সম্মুখ হইতে আর সকল বিষয় অন্তর্হিত হইল। ঈশ্বরকে কেন যে এইরূপ ভালবাসিতাম তাহার কারণ ত আমি জানি না * * এই

সময় হইতে আমার নিভৃত-মর্ম্মস্থানে এই আকাঙ্ক্ষাই জাগিয়া উঠিল যে, আমি সকল বিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিব। আমার অন্তর হইতে এই প্রার্থনাই উত্থিত হইল যে, 'হে পিতা, আমার এমন কোন্ প্রিয়বস্তু আছে, যাহা স্বেচ্ছায় তোমার নিকট বলি দিতে বা অর্পণ করিতে পারি না? আমাকে ক্ষমা করিও না, আমাকে ত্যাগ করিও না।"

ম্যাডোম গেয়োঁ কিছুদিন বিশ্বাসে, ভক্তিতে, প্রেমে পুণ্যে, পুলকে উচ্ছ্বাসে অন্তর পুর্ণ করিয়া ধর্ম্মপথে দ্রুতপদনিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উপাসনা ও প্রার্থনাতেই তাঁহার অনেক সময় চলিয়া যাইতে লাগিল। তিনি আপনার খরচের জন্য স্বামীর নিকট প্রচুর অর্থ পাইতেন; তাহা দুঃখী ও অসহায়দিগের অভাব মোচনের জন্যই ব্যয় হইয়া যাইত। যে সকল দুর্ভাগিনী নারী ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হইয়া পড়িত এবং দুই হাতে পঙ্ক তুলিয়া পবিত্র নারীহৃদয় মলিন করিয়া ফেলিত, ম্যাডাম গেয়োঁ সেই সকল স্ত্রীলোকের দুঃখ সহিতে পারিতেন না; তিনি ব্যথিতমনে ও সজলনয়নে তাহাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেন।

কিন্তু তাঁহার শাশুড়ীর মনে হইত, এ সকলই বধূর অন্যায় কার্য্য। ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীও এক এক সময় উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন। তখন স্ত্রীর প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আবার তিনি কখনো কখনো বিদ্রূপ করিয়া স্ত্রীকে বলিতেন—"তোমার সমস্ত ভালবাসা ত ঈশ্বরকেই দিয়াছ, এখন আমাকে আর কি দিবে বল?"

তাঁহার এইরূপ পরিহাসের মধ্যেও মনের একটা ঝাঁজ থাকিত। তিনি বুঝিতে পারিতেন না যে, ঈশ্বরকে হৃদয় অর্পণ করিলে তিনি তাহা শূন্য করিয়া সমস্ত প্রেমটুকু কাড়িয়া লন না; কিন্তু আপনার

প্রেমের স্পর্শমণির দ্বারা ভক্তের প্রেমকে সোণা করিয়া তোলেন। তখন ভক্তিমতী নারীর স্বামী যে রকম লাভবান হয়েন, এমন আর কেহই নহে।

ম্যাডাম গেয়োঁ এখন আর গৃহের এই সকল প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে কাতর হইতেন না; কিন্তু এক এক সময়ে তাঁহার হৃদয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িত, সুখস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিত, ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া যাইত, প্রাণের ঈশ্বরকে প্রাণের মধ্যে খুঁজিয়া পাইতেন না; এই জন্যই তিনি দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িতেন।

হায়, ম্যাডাম গেয়োঁ একদিন ভাবিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মরাজ্যের যে জায়গাটি অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গ; ঝড়ে টলিবে না, বজ্রপাতে ভাঙ্গিয়া পড়িবে না; তিনি চিরদিনই সেখানে নিরাপদে বাস করিতে পারিবেন। কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার আশ্রয়-পর্ব্বত ভূকম্পনে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার বিশ্বাসের ভিত্তি ভাঙ্গিতেছে, নির্ভর চূর্ণ হইয়া যাইতেছে; কোথায় তাঁহার সেই আধ্যাত্মিক সম্পদ্? এ যে অন্তরের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, আমিত্বের উগ্রভাব জাগিয়া উঠিতেছে, প্রেম শুকাইয়া যাইতেছে! এই অবস্থায় একদিন একটি অপরিচিত উদাসীন ব্যক্তি অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া তাঁহার দোষ-দুর্ব্বলতা সকলই দেখাইয়া দিলেন। তিনি মনের যাতনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ এবার এই দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়া, নিরাশ হইলেন না, সংশয় তাঁহার মনের উপর মায়া বিস্তার করিতে পারিল না; তিনি আপনার গভীর আধ্যাত্মিক চিন্তার সাহায্যে, ধর্ম্মপথের রহস্যকথা অতি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার মনে হইল, এ পথের সকল স্থানই পাথর বাঁধান পাকা রাস্তা নয়। কোন কোন জায়গা

সেই রকমই বটে ; সে সকল স্থানে পাথরের উপর পা ফেলিয়া অক্ষত-চরণে ও মনের আনন্দেই চলিতে পারা যায়। আবার কোন কোন স্থান বিপদসঙ্কুল, সংগ্রামপূর্ণ. অরণ্যময় ও কণ্টকাকীর্ণ ; সে সকল জায়গায় চলিবার সময় ভয়ে ভয়ে, রক্তাক্তচরণে ও সজলনয়নেই চলিতে হইবে, তদ্ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

ম্যাডাম গেয়োঁ এখন উপাসনা ও প্রার্থনাকেই বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিলেন। আর আত্মশক্তির উপর একটুও নির্ভর করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা পারিবেন ? তিনি সংগ্রামে পড়িয়া, ঠেকিয়া এই শিক্ষা লাভ করিলেন যে, মানুষের দুর্ব্বলতার অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন. বিপদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই ; কারণ আত্মসমর্পণ ও নির্ভরের মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের শক্তি অন্তরে নামিয়া আসে ও জীবনে তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হয় ; সেই ঐশীশক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইলেই আমিত্বের উগ্রভাব দূর হয়, বিশ্বাস উজ্জ্বল হয় এবং পাপের উত্তেজনা থামিয়া যায়।

সাধিকা নারী মনের মধ্যে সূক্ষ্ম আত্মচিন্তা জাগ্রত রাখিয়া, দিনের পর দিন ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ আধখানা ধর্ম্ম লইয়া, মনের একদিকে আলো ও অপর দিকে আঁধার রাখিয়া আত্ম-প্রতারিত হয়। তাই ম্যাডাম গেয়োঁ পূর্ণ ধর্ম্মের লক্ষণগুলি আপনার মধ্যে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য—বিশ্বাসে, প্রেমে, আনুগত্যে একেবারে ঈশ্বরের হইয়া যাইবার জন্য সাধন করিতে লাগিলেন। এ বিষয়ে তিনি আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"যদি সম্ভব হয়, আজ হইতে—এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইব। আমার কোন অংশ আর সংসারের থাকিবে না।"

১৬৭০ সালের অক্টোবর মাসে ম্যাডাম গেয়োঁর দুরন্ত বসন্তরোগ

জন্মিল। এই রোগের যন্ত্রণার মধ্যে ভক্তিমতী নারীর বিশ্বাস ও নির্ভর শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তাঁহার শরীর এখন শক্তিহীন, অঙ্গের লাবণ্য-জ্যোতি পরিম্লান; কিন্তু তাঁহার অন্তরের আধ্যাত্মিক আলোকে সমস্ত জীবন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি এই কঠিন পীড়ার মধ্যে আপনার জীবনদেবতার দুর্লভ প্রেম অনুভব করিয়া পুলকে ও ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মনের এই আনন্দ ও আত্মার এই অবস্থা সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"এই অবস্থা আমার আত্মাকে এতই আনন্দ দান করিয়াছিল যে, ইহার সহিত সৌভাগ্যবান রাজার অবস্থা বিনিময় করিতেও চাহিতাম না।"

ম্যাডাম গেয়োঁ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার কুসুমসুকুমার সুন্দর শিশুটি মাতৃবক্ষ শূন্য করিয়া সংসার হইতে প্রস্থান করিল। বড় ছেলেটি পিতামহীর কুশিক্ষায় মায়ের মনের মত হয় নাই, সেজন্য জননী এই ছেলেটিকেই আপনার স্নেহের আড়ালে রক্ষা করিয়া মানুষ করিতে চাহিয়াছিলেন। কাজেই এই শোকের আঘাত মাতার পক্ষে বড়ই মর্ম্মান্তিক হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ঈশ্বরের পানে চাহিয়াই শোক সংবরণ করিলেন এবং কহিলেন—

"The Lord gave, and the Lord hath taken away; Blessed be His name!" "ঈশ্বর দিয়াছিলেন, তাঁহার দান তিনিই গ্রহণ করিয়াছেন; তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক।"

এই নিদারুণ শোকের আঘাতে ম্যাডাম গেয়োঁর হৃদয়ে একটি নূতন ভাবের উৎস খুলিয়া গেল। তিনি এই সময় হইতেই করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়, এই ধর্ম্মশীলা মহিলাকে বুঝি কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া রক্তাক্ত চরণেই চলিতে হইবে? তাই শোকের উপরে শোক, সংগ্রামের পরে

সংগ্রাম আসিয়া তাঁহার কোমল অন্তরে কঠোর আঘাত করিতে লাগিল। ম্যাডাম গেয়োঁর ছেলেটির মৃত্যু হওয়ার এক বৎসর পরেই স্নেহময় পিতা পরলোক গমন করিলেন; তাঁহার পরে প্রাণের চেয়েও প্রিয় কন্যাটিকে হারাইতে হইল। এই মেয়েটি যেন কোন্ এক সৌন্দর্য্যের দেশ হইতে, মুখে অপার্থিব মাধুরী ও মনে সরলতা লইয়া সংসারে নামিয়া আসিয়াছিল। বাঁচিয়া থাকিলে হয় ত তাহার প্রকৃতির মধ্যে মাতার ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত। সে জননীকে নয়ন নিমীলিত করিয়া বসিতে দেখিলেই বলিত "মা, তুমি কি ঘুমাইতেছ? না মা, তুমি প্রার্থনা করিতেছ।" এই কথা বলিয়াই সেই ছোট মেয়েটি হাত যোড় করিয়া সুন্দর প্রার্থনা করিত।

এই সকল শোক ও দুঃখের পরে ভক্তিমতী রমণীর হৃদয়ে একটি মধুর ভাবের স্ফূর্ত্তি হইল। তাঁহার সেই ভাব অনেকটা এ দেশের বৈষ্ণব ভাবের মত। বৈষ্ণব-ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতি মনে করিয়া মধুর ভাবের সাধন করিয়া থাকেন। রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও খ্রীষ্টকে পতি মনে করিয়া সাধন করিবার জন্য আধ্যাত্মিক বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। ম্যাডাম গেয়োঁ সেই রীতির অনুসরণ করিয়াই তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে স্বামিরূপে বরণ করিলেন; তাঁহার আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। তখন তিনি যে একটি পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, সেই পত্রটির মর্ম্ম "ভারতমহিলা"র রচনা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"যদিও আমি তাঁহার ভালবাসার উপযুক্ত নই, তথাপি ঈশ্বরকে পতিরূপে বরণ করিতেছি এবং তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি। এই আত্মায় আত্মায় উদ্বাহক্রিয়ার দিনে আমি যেন তাঁহারই ইচ্ছার সহিত যুক্ত হইতে পারি, শান্ত ও পবিত্রভাবে যেন ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত আপনাকে এক করিয়া ফেলিতে পারি।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সংসার-পথে একাকিনী

বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটি বড় সুন্দর কথা প্রচলিত আছে। ঈশ্বর ভক্তকে বলেন—

"যে করে আমার আশ, তার করি সর্ব্বনাশ;
তাতেও যে ছাড়ে না আশ, তার হই দাসের দাস।"

ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনে এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সংসারের দিক হইতে দেখিলে, যথার্থই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তবুও তিনি এক দিনের জন্যও ঈশ্বরকে পাইবার আশা ত্যাগ করেন নাই, উপাসনা প্রার্থনা হইতেও দূরে সরিয়া দাঁড়ান নাই। তাই তাঁহার প্রেমের দেবতা স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে বরণ করিয়া লইলেন, ঈশ্বরের সঙ্গেই তাঁহার প্রেমের যোগ স্থাপিত হইল। তিনি ফরাসীদেশের ধার্ম্মিক পুরুষ ফেণেলোঁর মত লোকেরও ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন।

ম্যাডাম গেয়োঁর গৃহে মৃত্যু প্রবেশ করিয়া, তাঁহার স্নেহবৃন্তের সুন্দর দুইটি ফুলই যে কাড়িয়া লইয়াছিল, সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইবার মৃত্যু যেন ঝড়ের মত আসিয়া তাঁহার আশ্রয়গৃহ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, তাঁহাকে অনাথিনী করিল। তিনি একাকিনী তৃণখণ্ডের মত সংসারের স্রোতে ভাসিয়া, কেবলই এক দিক হইতে অন্য দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

১৬৭৬ সালের জুলাই মাসটি যেন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ম্যাডাম

গেয়োঁর সম্মুখে উপস্থিত হইল। এই সময়েই তাঁহার স্বামী কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী হইলেন। সাধ্বী নারী প্রেমে আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীর সেবা করিতে লাগিলেন। এই সেবার ভিতর দিয়াই তাঁহার প্রাণের অমৃতধারা স্বামীর তৃষিত হৃদয়ে প্রবেশ করিল। তাঁহার রোগক্লিষ্ট প্রাণ সেই অমৃতে জুড়াইয়া গেল।

এই ধনীর সন্তানের যথার্থই বিস্তর দোষ-ত্রুটি ছিল। স্ত্রী যে ধর্ম্ম লইয়া মাতিয়া উঠেন, তাহা তিনি মোটেই পছন্দ করিতেন না। জননীর নিকট পত্নীর নিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইতেন; তখন স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেও তাঁহার লজ্জাবোধ হইত না। তিনি চাহিতেন শুধুই পৃথিবীর সুখ; আর তাঁহার স্ত্রী চাহিতেন পবিত্রতা, ঈশ্বরের প্রেম, দুঃখীর সেবা। এজন্য দুজনের মধ্যে প্রাণের মিলন হয় নাই, হইতেই পারে না। তবুও পত্নীর প্রতি তাঁহার একটি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সেই শ্রদ্ধাটুকু মনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতে চাহিতেন বটে, কিন্তু পারিতেন না; সময় সময় বাহিরের ব্যবহারে প্রকাশ হইয়া পড়িত। তাঁহার পরিচিত লোকেরা স্ত্রীর দয়াধর্ম্মের উল্লেখ করিলেই তিনি অন্তরে গৌরব অনুভব করিতেন। শুধু তাহাই নহে। এক এক সময়ে তিনি নিজের দোষত্রুটি স্মরণ করিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেন। তখন তাঁহার জ্বালাময় হৃদয় জুড়াইবার জন্য সান্ত্বনাদায়িনী পত্নীর সহিত মিলিত হইতেন। পত্নীর পবিত্র হৃদয়ের সুমিষ্ট প্রেমে তাঁহার মন স্নিগ্ধ, কোমল ও সরস হইয়া উঠিত।

ম্যাডাম গেয়োঁ ক্রমান্বয়ে চব্বিশ দিন আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীর সেবা করিলেন। শুধুই শরীরের সেবা নহে; এই আসন্নকালে তাঁহার স্বামী যাহাতে ঈশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন, সেজন্য তিনি

স্বামীর আত্মার সহিত এক হইয়া প্রার্থনা করিতেন। স্বামীর রোগ-শয্যায়, পত্নীর আত্মার সহিত তাঁহার প্রাণের আর কোন ব্যবধান রহিল না। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতি অল্প সময়ের জন্য মিলনের একটি সুনির্ম্মল ও সুমিষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

একদিন ম্যাডাম গেয়োঁ স্বামীর সম্মুখে নতজানু হইয়া কহিলেন—"আমি ত এমন কত কাজই করিয়াছি, তাহার জন্য তুমি অতিশয় ক্লেশ সহ্য করিয়াছ। কিন্তু কখনই ইচ্ছা করিয়া তোমাকে অসুখী করি নাই। তবুও আমার অনেক অপরাধ হইয়াছে। আজ সেই সমস্ত অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি। প্রসন্নমনে আমাকে ক্ষমা কর।"

ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর রোগক্লিষ্ট মুখখানি স্নেহে ও প্রেমে রঞ্জিত হইয়া উঠিল ও নয়নে একটি করুণ ও মধুর ভাব দীপ্তি পাইতে লাগিল। তিনি বলিলেন—"তুমি কেন আমার কাছে ক্ষমা চাহিতেছ? আমি যে তোমাকে লাভ করিবার যোগ্য নই, তাহা কি জানি না? দোষ ত আমারই; আমিই তোমার কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিব?"

২১ শে জুলাই ম্যাডাম গেয়োঁর স্বামীর আসন্ন কাল উপস্থিত হইল। সে দিন ডাক্তারের ঔষধ, স্ত্রীর সেবা, সন্তানদিগের চোখের জল—সকলই ব্যর্থ হইয়া গেল; মৃত্যু তাহার শীর্ণ দেহের উপরে আপনার প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল। তিনি পত্নী ও পুত্র কন্যা এবং সংসার ও সম্পদ সকলই পৃথিবীতে রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

সবেমাত্র বার বৎসর চারি মাস হইল, ম্যাডাম গেয়োঁর বিবাহ হইয়াছে; এখন তাঁহার বয়স আটাশ বৎসর। তিনি এই বয়সেই দুটি পুত্র ও একটি কন্যা লইয়া বিধবা হইলেন। তাঁহারি আধ্যাত্মিক শক্তি যতই অধিক হউক না কেন, তিনি এই নিদারুণ শোক সহজে সহ্য করিতে পারিলেন না; তাঁহাকে অনেকদিন অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে হইল।

তৎপরে সাধিকা নারী অন্তরে অনুভব করিলেন, ঈশ্বরের চরণে তাঁহার জীবন যৌবন সমর্পণ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। ঈশ্বরের করুণা ও প্রেম ভিন্ন, এই সংসারে আর ত তাঁহার ধরিবার ছুঁইবার কিছুই নাই।

ইহার কয়েক মাস পরেই খ্রীষ্টোৎসব আরম্ভ হইল। তখন বিধবা নারী শাশুড়ীর স্নেহ আকর্ষণ করিতে ও তাঁহার সহিত মিলিত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মনে ভাবিয়াছিলেন, এই শোকের সময়ে শাশুড়ী তাঁহাকেই প্রাণের কাছে টানিয়া লইয়া সান্ত্বনা লাভ করিবেন। তাই তিনি অতিশয় কাতরভাবে শাশুড়ীকে কহিলেন—"মা, এই পবিত্রদিনে আমাদের প্রভু যিশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে শান্তি আনয়ন করিবার জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার নামে আপনার নিকট শান্তি ভিক্ষা করিতেছি। আমার কোন অপরাধ থাকিলে, তাহা বিস্মৃত হউন, আমাকে কন্যা বলিয়া গ্রহণ করুন।"

কঠিন পাষাণ যে গলিবে, তাহার কোনই লক্ষণ দেখা গেল না। বরঞ্চ শাশুড়ী বধূকে স্পষ্টই বলিলেন, "তোমার সঙ্গে আর একত্র বাস করিতে পারিব না।" এ কথার অর্থই এই যে, তুমি আমার এ বাড়ী হইতে চলিয়া যাও। ম্যাডাম গেয়োঁ শাশুড়ীর আদেশ পালন করিবার জন্য তিনটি সন্তান লইয়া গৃহের বাহির হইলেন; কিন্তু পিতৃহীন সন্তানদিগের মুখপানে চাহিয়া ও স্বামীর গৃহের দিকে তাকাইয়া, কিছুতেই কান্না থামাইতে পারিলেন না। তবুও তিনি শাশুড়ীর বিরুদ্ধে মনের মধ্যে কোন রকম মন্দ ভাব পোষণ করিয়া রাখিলেন না। তিনি মনে করিলেন, শাশুড়ীর দোষত্রুটির বিচারের ভার ঈশ্বর ত আমার হাতে দেন নাই; আমি কেন তাঁহার দোষের কথা ভাবিয়া মনকে বিষাক্ত করিব?

এই যে ম্যাডাম গেয়োঁ ঘরের বাহির হইলেন, আর কোথাও বেশী দিন স্থির হইয়া বাস করিবার সুবিধা হইল না। কেন যে সুবিধা হইল না, সে কথা আমরা যথাস্থানে সংক্ষেপে বর্ণনা করিব। আপাততঃ এই অসহায়া রমণী জনকোলাহল হইতে একটু দূরে গিয়া, একটি নির্জ্জন জায়গায় বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার সন্তানদিগের সুশিক্ষার কথা মনে হইল। তিনি ছেলেদের পড়ার সুবন্দোবস্ত করিলেন। তাহার পরে তিনি ল্যাটিন ভাষা শিখিতে লাগিলেন। এই ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করায় তাঁহার জ্ঞানানুশীলন ও ধর্ম্মচর্চ্চার অতিশয় সুবিধা হইয়াছিল। বোধ হয় ইহার কিছুদিন পরেই কেহ কেহ ম্যাডাম গেয়োঁর কাছে বিবাহের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন করিতে লাগিল। সাধ্বী নারী ঘৃণার সহিত সেই সকল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

এইবার ভক্তিমতী নারীর নবজীবনলাভের দিন ২২ শে জুলাই উপস্থিত হইল। সে দিন তিনি দিবারাত্রি প্রার্থনাতেই যাপন করিলেন। তাঁহার মনের প্রত্যেকটি চিন্তা, তাঁহার কণ্ঠোচ্চারিত প্রত্যেকটি বাক্য, তাঁহার নয়নের প্রত্যেক অশ্রুবিন্দু ঈশ্বরের কাছে গিয়াই পৌঁছিল। হায়, এতদিনেও ত দুঃখিনী নারীর সংগ্রাম থামিয়া যায় নাই, তিনি সংশয় ও পাপের অতীত হইতে পারেন নাই। আজ প্রেমময় ভগবান তপস্বিনী নারীর সম্মুখে আর একটি শুভদিন উপস্থিত করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার হৃদয়ে সংশয়ের রেখাটি পর্য্যন্ত নাই; পাপ নাই, বিকার নাই, বিদ্রোহ নাই, আমিত্বের অহঙ্কার নাই; আজ অন্তরে বাহিরে শুধুই জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ!

ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনচরিত রচয়িত্রী তাঁহার এই দিবসের অবস্থা বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন—"গভীর শান্তিতে তিনি নিমগ্ন হইয়া

রহিলেন। এখন আর তাঁহার আকাঙ্ক্ষা করিবার কিছু নাই, হারাইবার কিছু নাই, ভয় করিবার কেহ নাই। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাঁহার ইচ্ছা।"

অতঃপর ভক্তিমতী নারী তাঁহার সন্তান দুইটির ভার একজন উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে অর্পণ করিয়া, শিশু কন্যাটি লইয়া দূরদেশে যাত্রা করিলেন। এই যাত্রাকে তাঁহার ধর্ম্মরাজ্যে যাত্রাও বলা যাইতে পারে। কারণ এ যাত্রার উদ্দেশ্যই ধর্ম্মসাধন, ধর্ম্মপ্রচার ও দুঃখীর সেবা। আমরা পরে দেখিতে পাইব, তিনি এই তিন কাজেই আপনার অর্থ, সামর্থ্য সমস্তই অর্পণ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

যোগ ও কর্ম্ম

ম্যাডাম গেয়োঁ জেক্স্‌নগরে গমন করিলেন। সহরের লোকেরা অগ্রেই তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথা শুনিয়াছিল। তাই সকলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিল। এখানে তিনি কিছুদিন খুব সুখেই ছিলেন। তাঁহার মনোবীণা নিরন্তর উচ্চ সুরে বাঁধা থাকিত। সেই বীণায় যে স্বর্গীয় সঙ্গীত বাজিয়া উঠিত, তাহাতে তাঁহার নিজের হৃদয় মধুময় হইয়া উঠিত; যে সকল ধর্ম্মার্থী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহাদের চিত্ত রসসিক্ত হইয়া যাইত। তপস্বিনী নারীর এই সময়ের আধ্যাত্মিক উচ্চ অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনচরিত রচয়িত্রী লিখিয়াছেন

—"অনেক দিনই মধ্যরাত্রিতে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত। ঈশ্বরানুভূতির আনন্দ তাঁহাকে ঘুমাইতে দিত না। প্রিয়তমের সহবাসের বিমল আনন্দে তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া যাইত।"

এ দেশের সাধকদিগের বিশ্বাস এই যে, ধর্ম্মের সর্ব্বোচ্চ ভাবই যোগ ও ভক্তি। ম্যাডাম গেয়োঁর জীবনে, দিনের পরে দিন, এই দুই ভাবেরই স্ফূর্ত্তি হইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ের ভক্তি ঈশ্বরের পানেই ছুটিয়া যাইত; আবার তিনি গভীর প্রেমে ঈশ্বরের সঙ্গেই যোগযুক্ত হইয়া বাস করিতেন, ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছা বিলীন হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার যোগের অবস্থার বিষয়ে নিজেই লিখিয়াছেন—"আমার আত্মা ঈশ্বরের সহিত এমন ভাবেই যুক্ত যে, আমার মনে হয়, তাঁহার ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে আমি সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিয়াছি। ঈশ্বর দয়া করিয়া এইরূপে আমার সর্ব্বস্ব হইয়াছেন। যে অহংভাব এক সময়ে আমাকে কষ্ট দিত, তাঁহাকে আর দেখিতেছি না। সকল বস্তুতে সর্ব্ব ঘটনায় আমি ঈশ্বরকে দেখিতেছি। জীব কিছুই নয়—ঈশ্বরই সব।"

ম্যাডাম গেয়োঁ কি রকম সংগ্রাম ও সাধন করিয়া ঐরূপ উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"আমারও দুঃখের দিন গিয়াছে। বিদ্রোহী আত্মাকে বশীভূত করিতে আমাকে বক্ষে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে হইয়াছে। কত মাস, কত বৎসর আমি অশ্রুজলে নয়ন সিক্ত করিয়াছি। অবশেষে মুক্তির দিন আসিয়াছে—আমার ক্ষত আরোগ্য—আমার অশ্রুবারি শুষ্ক হইয়াছে। কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতে পারি, এখন আমার আত্মা শান্তি ও পবিত্রতার বিজয়মুকুট লাভ করিয়াছে।"

তপস্বিনী ম্যাডাম গেয়োঁ যে দুর্ল্লভ ধর্ম্মলাভ করিয়া জীবন

সার্থক করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মের সত্যবাণী মানুষকে শুনাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তদ্ভিন্ন তিনি রোগীর সেবা ও দরিদ্রের দুঃখ দূর করিবার জন্য কয়েকটি কার্য্যে হস্তার্পণ করিলেন।

তিনি জেক্স্ সহরের দরিদ্রদিগের দুর্গতি দেখিয়া, অর্থদ্বারা তাহাদের অভাব দূর করিতেন। তাঁহার সেবায় ও কোমল ব্যবহারে পীড়িত লোকেরা অত্যন্ত সুখী হইত। বিস্তর পুরুষ ও স্ত্রীলোক পাপে কাতর হইয়া ম্যাডাম গেয়োঁর কাছে আসিত ও তাহাদের মনের কথা খুলিয়া বলিত। তিনি উহাদের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিতেন। তাঁহার চেষ্টায় অনেক লোক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইত ও জন্মের মত পাপের পথ ত্যাগ করিত।

কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ এ সহরেও অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্ম্মমতের জন্য, একদল গোঁড়া ধর্ম্মযাজক শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের চক্রান্তে ধর্ম্মশীলা নারী অন্যত্র গমন করিলেন। সেইখানে তাঁহার টাকায় একটি হাঁসপাতাল নির্ম্মিত হইল। তিনি স্বয়ং রুগ্ন পুরুষ ও রোগিণী স্ত্রীলোকদিগের সেবা করিতেন। তাহার পরে ম্যাডাম গেয়োঁ ঘটনাচক্রে পড়িয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। লোকের বিরুদ্ধাচরণের মধ্যেও, সর্ব্বত্রই তিনি দুঃখীর নয়নজলের সঙ্গে আপনার অশ্রু মিশাইতে চেষ্টা করিতেন। বিস্তর দরিদ্র ও অসহায় লোক তাঁহার কাছে সাহায্য পাইত। কত শিল্পী ও গুণীদিগকে তিনি অর্থ দান করিয়া উৎসাহিত করিতেন। মহীয়সী নারী আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

"পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত ও তাহাদের শয্যা প্রস্তুত করিবার জন্য আমি সর্ব্বদাই তাহাদের নিকটে গমন করিতাম। তাহাদের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া পুনরায় বাঁধিয়া দিতাম এবং

প্রলেপ লাগাইতাম। মৃত ব্যক্তিদিগকে সমাধিস্থ করিবার ব্যয় সময় সময় আমিই নির্ব্বাহ করিতাম। কখনো কখনো গুপ্তভাবে ব্যবসায়ী ও শিল্পীদিগকে, তাহাদের ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সাহায্য করিতাম।”

আমরা যে সময়ের উল্লেখ করিতেছি, তখন ফরাসীদেশের লোকের ধর্ম্মভাব ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। অনেক পুরুষ ও স্ত্রীলোক ধর্ম্মের কতকগুলি বাহিরের অনুষ্ঠান খুব ঘটা করিয়াই সম্পন্ন করিত; কিন্তু তাহাতে তাহাদের ধর্ম্মলাভের বড় একটা সুবিধা হইত না। বরং ঐ সকল আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের আড়ালে মানুষের পাপ ঢাকা পড়িয়া যাইত, ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রচার করিবার সুবিধা হইত। বিস্তর ধর্ম্মবিহীন ধর্ম্মযাজক কতকগুলি মত ও প্রাণহীন অনুষ্ঠানের উপরই কড়া নজর রাখিতেন। সে বিষয়ে একটুকু এ-দিক সে-দিক হইলেই মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইত। কারণ ঐ সকল ধর্ম্মযাজকের জনসমাজে প্রভুত্বস্থাপনের পক্ষে ঐ মত ও বাহিরের অনুষ্ঠানগুলিই যথেষ্ট।

দেশের চারিদিকে যখন ধর্ম্মের এই রকম অবস্থা, তখন মানুষের দুঃখ ও পাপ দেখিয়া ম্যাডাম গেয়োঁর প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি ধর্ম্মকে সত্যরূপে পাইয়াছেন; ধর্ম্ম না হইলে মানুষের যে মোটেই চলে না, এ কথাও চিরদিনের জন্য তাঁহার মর্ম্মস্থানে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তাই ধর্ম্মশীলা নারী জীবন্ত ধর্ম্মের অমৃতময়ী বাণী লইয়া লোকের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। যে সকল পুরুষ ও রমণীর ধর্ম্মতৃষ্ণা প্রবল, যাহারা পাপে ম্লান, অনুতাপে ক্লিষ্ট, তাহারা ম্যাডাম গেয়োঁর উপদেশ শুনিবার জন্য, ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি বিশ্বাসে উদ্দীপ্ত হইয়া জলন্ত ভাষায় জীবনের পরীক্ষিত সত্য সকল প্রকাশ করিতেন, সেই সমস্ত সরল ও অকৃত্রিম ধর্ম্মকথা নরনারীর হৃদয় স্পর্শ করিত; কোন কোন পুরুষ ও রমণী পাপের পথ ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেন।

আমরা এ স্থানে ম্যাডাম গেয়োঁর গুটিকয়েক ধর্ম্মকথা লিপিবদ্ধ করিব। উহা পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, কথাগুলি কি জীবন্ত! কি গভীর ভাবপূর্ণ! কি প্রাণস্পর্শী! তপস্বিনী নারী বলিতেছেন—"প্রার্থনা কি? ইহা নিশ্চয়ই নির্দ্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা বেশি কিছু। যে অবস্থায় মানুষের হৃদয় ঈশ্বরের সহিত বিশ্বাসে ও প্রেমে যুক্ত থাকে, হৃদয়ের সেই অবস্থাটিই প্রার্থনা।"

"নিভৃতে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে, ঈশ্বরের সহিত তোমার যে সম্বন্ধ, তাহা অনুভব করিতে চেষ্টা কর। আপনাকে তাঁহার একেবারে সম্মুখে স্থাপন কর। মনকে প্রথমে এই মহৎ চিন্তায় ব্যাপৃত করিতে হইবে যে, ঈশ্বর সৎ, তিনি সম্মুখেই রহিয়াছেন, ঈশ্বর আমাদের পিতা; তাঁহার নিকট আমরা সর্ব্ববিষয়ে ঋণী। এই মহা সত্যগুলির উপরে মন শান্তভাবে বিশ্বাসের সহিত অবস্থিতি করুক। শান্ত নম্র হইয়া থাক, সকল ইন্দ্রিয়কে, সকল চিন্তাকে পরিধি হইতে সঙ্কুচিত করিয়া কেন্দ্রে আনিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। এইরূপে ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাক—তীব্র আকাঙ্ক্ষার সহিত অপেক্ষা করিও, কিন্তু প্রাণ যেন উত্তেজনাপূর্ণ না থাকে।"

"সমস্তই ছাড়িয়া না দিলে আত্মসমর্পণ করা হয় না। ঈশ্বরের চরণে আপনাকে একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, উৎসর্গ করিয়া দিতে হইবে। অতীতের বিষয় বিস্মৃতির তলে ডুবিয়া যাক, ভবিষ্যতের ভাবনা ভগবানের হস্তে থাকুক, বর্ত্তমানে—এই মুহূর্ত্তে আমরা আপনাদিগকে তাঁহার চরণে নিঃশেষে দান করিয়া দিই।"

"পৃথিবীর সান্ত্বনা দুদিনের, তাহা চলিয়া যায়; কিন্তু ঈশ্বর সমীপে সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের যে সান্ত্বনা, তাহা চিরদিনের। যে দুঃখকে বরণ করিয়া লইল না, সে ঈশ্বরকে বরণ করিতে পারে না।"*

* কুমারী নির্ঝরিণী ঘোষ প্রণীত "ম্যাডাম গেয়োঁ" হইতে উদ্ধৃত

ম্যাডাম গেয়োঁর আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির কথা দেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দেশের জ্ঞানী, মূর্খ, গৃহী, সন্ন্যাসী, কুমারী, সধবা, বিধবা সকল শ্রেণীর পুরুষ ও স্ত্রীলোকই তাঁহার জ্বলন্ত উপদেশ শুনিবার জন্য উপস্থিত হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহাদের অন্তরে জীবন্ত ধর্ম্মভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতেন। কিন্তু নারীর এই আধ্যাত্মিক শক্তি, এক শ্রেণীর গোঁড়া রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টান কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। কেমন করিয়াই বা সহ্য করিবেন? তাঁহারা পুরাতনের একান্ত পক্ষপাতী। মানুষ প্রাচীন ধর্ম্মনিয়মের পাষাণ বুকে বাঁধিয়া ডুবিয়া মরুক, তাহাতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই; কিন্তু কেহ ধর্ম্মের নূতন আলোকে আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে চাহিলেই তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিবেন। এই দলের অনেক গোঁড়া ধর্ম্মযাজক স্বার্থের জন্য, সত্যের চেয়ে কুসংস্কার প্রচার করিয়াই কর্ত্তব্যসাধন করিতেন। কেহ তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিলেই রাজার তলোয়ার তাহার মাথায় পড়িত; যাজকেরা রাজশক্তির সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে জেলে পাঠাইতেন।

কিন্তু ম্যাডাম গেয়োঁ ঐশীশক্তিতে শক্তিশালিনী, ধর্ম্মের তেজে তেজস্বিনী; তিনি নির্ভীকচিত্তে অসত্য, কুসংস্কার, অসার অনুষ্ঠান ও অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন; যথার্থ ধর্ম্ম যে কি, তাহা মানুষকে বুঝাইবার জন্য, তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থও প্রণয়ন করিলেন। আর কি রক্ষা আছে? গোঁড়া রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ দল বাঁধিয়া এই রমণীর উপর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অত্যাচার এমনই বাড়িয়া উঠিল যে, ম্যাডাম গেয়োঁ কোথাও সুস্থির হইয়া কাজ করিতে পারিলেন না; শুধুই এখান হইতে সেখানে, সেখান হইতে আর এক জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

জীবনের শেষ কথা

ম্যাডাম গেয়োঁ নানা স্থান ঘুরিয়া প্যারিস সহরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানেও বিস্তর ধর্ম্মপিপাসু নরনারী তাঁহার জ্ঞান-ভক্তি ও কর্ম্ম সমন্বিত সুপবিত্র জীবন দেখিয়া ও তাঁহার সুমিষ্ট উপদেশ শুনিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কিন্তু এই প্যারিস সহরেই অনেক বড় বড় ধর্ম্মযাজক বাস করেন। তাঁহাদের মধ্যে এক শ্রেণীর যাজক ধর্ম্মের সিংহাসন হইতে ঈশ্বরকে এক পাশে সরাইয়া দিয়া নিজেরাই খানিকটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছেন। অথচ ম্যাডাম গেঁয়ো একমাত্র ঈশ্বরকেই ধর্ম্মের সিংহাসনে বসাইয়া, সর্ব্বত্র তাঁহারই মহিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। তিনি মানুষকে পরিষ্কার ভাষায় বুঝাইয়া বলিলেন—"স্বয়ং ঈশ্বরই মানুষের হৃদয়ে শান্তি দান করেন। তাঁহাকে জীবন অর্পণ করিলেই যথার্থ মুক্তিলাভ করা যায়।"

নারীর এই সত্যবাণী গোঁড়া ধর্ম্মযাজক ও গোঁড়া রোমাণ ক্যাথলিক খ্রীষ্টানগণ কেমন করিয়া সহ্য করিবেন? তাঁহারা ম্যাডাম গেয়োঁকে ধর্ম্মদ্রোহ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া, রাজার নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিলেন। কিন্তু দেশের প্রচলিত আইনের কোন শৃঙ্খল দিয়াই রমণীকে বাঁধিতে পারা গেল না। সেজন্য বিরুদ্ধপক্ষীয় কোন কোন লোক একখানি চিঠি জাল করিয়া, সেই মিথ্যা পত্রখানিকেই সত্য দলিলরূপে বিচারকের কাছে উপস্থিত করিলেন। রাজা ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি কারাদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহাকে সেণ্ট

মেরী কন্‌ভেণ্টে বন্দিনী করিয়া রাখা হইল। স্নেহময়ী নারী নানা রকম অবস্থা বিপর্য্যয়ের মধ্যেও অল্পবয়স্কা কন্যাটিকে কাছে কাছেই রাখিয়াছেন; সেটিকে বক্ষে ধারণ করিয়া মাতৃত্বের একটি অনির্ব্বচনীয় সুখ অনুভব করিয়াছেন। কিন্তু এবার রাজপুরুষেরা সেই কন্যাটিকে মাতৃবক্ষ হইতে কাড়িয়া লইলেন। অসহায়া রমণী বন্দিনী অবস্থায় আর কি করিতে পারেন? তিনি নির্জ্জন কারাগারে আপনার প্রেমের দেবতার সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া সকল দুঃখই বিস্মৃত হইতে চেষ্টা করিতেন। এইখানেই তিনি অনেকগুলি ভক্তিরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। কবিতাগুলির মধ্যে তাঁহার জীবনের অনেক পরীক্ষিত সত্য পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

ম্যাডাম গেয়োঁ আট মাস কারাগারের যন্ত্রণা সহ্য করিলেন। তৎপরে একটি শক্তিশালিনী মহিলার সহিত তাঁহার আলাপ হইল। তিনি ফরাসীদেশের রাজার উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রমণী ম্যাডাম গেঁয়োর সহিত কথা কহিয়া বুঝিতে পারিলেন, যথার্থই তিনি ধর্ম্মশীলা নারী; শুধু ধর্ম্মের জন্যই দুঃখ ও বিপদকে জীবনে বরণ করিয়া লইয়াছেন। এই বুদ্ধিমতী ও মনস্বিনী নারী রাজাকে সকল কথা খুলিয়া বলায়, ম্যাডাম গেয়োঁ মুক্তিলাভ করিলেন।

তৎকালে দেশবিখ্যাত ফেণেলোঁ ফরাসী দেশের একজন অসাধারণ ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন। তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভা, অগাধ পাণ্ডিত্য ও ঈশ্বরের প্রতি সুগভীর ভক্তি ছিল। দেশের সহস্র লোকের মস্তক শ্রদ্ধায় তাঁহার চরণতলে নত হইত। এই প্রভূত ক্ষমতাশালী ধর্ম্মযাজকের সহিত ম্যাডাম গেয়োঁর অতিশয় আত্মীয়তা জন্মিল। তিনি ধর্ম্মশীলা নারীর জীবনের অতি উচ্চ অবস্থা দর্শন করিয়া এবং তাঁহার প্রতিভা ও শক্তির পরিচয় পাইয়া, তৎপ্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ

করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে; এই উদারচিত্ত উন্নত চরিত্র বিদ্বান্ ধর্ম্মযাজক ম্যাডাম গেঁয়োর সুচিন্তিত রচনাগুলি পাঠ করিয়া, তাঁহার সুযুক্তিপূর্ণ ধর্ম্মমত সমর্থন করিতে লাগিলেন।

তখন আবার চারিদিকে ঝড় উঠিল; তুমুল ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইল। গোঁড়া যাজকগণ মনে করিলেন, ম্যাডাম গেয়োঁ নিশ্চয়ই মায়াবিনী স্ত্রীলোক। কোন রকম যাদুবিদ্যা জানা না থাকিলে, তিনি কিরূপে ফেণেলোঁর মত অসাধারণ পুরুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন?

আবার বিপক্ষের লোক দল বাঁধিয়া ফেণেলোঁ ও ম্যাডাম গেয়োঁ দুজনের উপরেই আপনাদের বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। ইহার ফল হইল এই যে, ফেণেলোঁ আপনার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে গিয়া নির্ব্বাসিত যাজকের মত বাস করিতে লাগিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁর প্রতি পুনর্ব্বার কারাবাসের আদেশ হইল। তিনি বিন্‌সেন্‌জ কারাগারে বন্দিনী হইয়া রহিলেন। এখন আর তাঁহার কোন বিষয়েই স্বাধীনতা রহিল না। কিন্তু সেজন্য তিনি গভীর আনন্দ ও সুমধুর শান্তি হইতে বঞ্চিত হইলেন না। যাঁহার আত্মা ঈশ্বরের সঙ্গেই গূঢ়যোগে যুক্ত, যিনি ঈশ্বরের প্রেমেই পরিতৃপ্ত, ঈশ্বরই যাঁহার সর্ব্বস্ব, তাঁহার আবার অশান্তি কোথায়? ভক্তিমতী নারী সেখানে প্রেম-সঙ্গীত রচনা করিতেন; সেই গান গাহিতে গাহিতে প্রেমে ও পুলকে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"আমি যেন ক্ষুদ্র একটি পাখী। আমার প্রভু আমাকে পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এখন গান গাওয়া ব্যতীত আমার আর কোনও কাজ নাই।"

আমরা প্রেমময়ী ফরাসী নারীর একটি সঙ্গীতের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"আমি আমার ঈশ্বরকে ভালবাসি। কিন্তু আমার প্রেমে নহে। কারণ তাঁহাকে দেবার মত আমার ত প্রেম নাই। হে প্রভু, আমি তোমাকে ভালবাসি। কিন্তু আমার এ ভালবাসা তোমারই। তোমার ভালবাসাতেই আমি জীবিত আছি। আমি নিজে ত কিছুই নই। তোমাতে ঢালিয়া পড়িতে, তোমাতে হারাইয়া যাইতে, তোমাগ্রস্ত হইতেই আমার আনন্দ। হে প্রভু, একমাত্র তুমিই আমার তাহা, যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না। তোমা হইতেই অপার সুখের স্রোত প্রবাহিত হয়। যাহারা সুখী তাহারা তোমাতেই বাস করে। তুমিই জীবনের প্রস্রবণ। যে করুণা সকল সময়েই যথেষ্ট, তুমিই সেই করুণার উৎস। আমাদের জীবনের আকর তুমি, উৎপত্তিস্থান তুমি, কেন্দ্র তুমি, তুমিই আমাদের বাসস্থান।"

এই গদ্য অনুবাদটি সঙ্গীতে পরিণত করিতে চেষ্টা করা গেল :—

তোমারেই ভালবাসি হে প্রভু আমার,
আমার প্রেমেতে নয়, প্রেমেতে তোমার।
আমি ত কিছুই নই তব প্রেমে বেঁচে রই,
আমার কি আছে হায়, তোমারে দেবার।

তোমাতে পড়িতে ঢেলে হতে তোমাময়
তোমাতে হারায়ে যেতে সুখ উথলয় ;
একমাত্র এ ধরায় তোমারেই সবে চায়,
তোমা হতে সুখ-স্রোত বহিছে অপার।

তোমাতেই সুধীরা ত সদা বাস করে,
যে দয়া যথেষ্ট সব মানুষের তরে ;
সে দয়ার উৎস তুমি তুমিই আবাস ভূমি,
তোমাতে উৎপত্তি স্থিতি আমা সবাকার।

চারি বৎসর পরে ম্যাডাম গেয়োঁ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। কিন্তু প্যারিসে আর তাঁহার একটুকু জায়গা হইল না। তাঁহাকে দূরে নির্ব্বাসিত করা হইল। তৎপূর্ব্বেই নানা দেশের ধার্ম্মিক লোকেরা তাঁহার উন্নত ধর্ম্মজীবনের কথা শুনিয়াছিলেন। তাই এখন, ইংলণ্ড, জার্ম্মানী প্রভৃতি দেশ হইতে বিস্তর লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। তিনি লোকের একান্ত অনুরোধে আত্ম-চরিতখানি প্রকাশ করিবার জন্য ইংলণ্ডের একটি ভদ্রলোকের হস্তে অর্পণ করিলেন।

অবশেষে তাঁহার জীবনের অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তিনি ধনীর কন্যা, ধনীর পত্নী, রূপবতী, গুণবতী, সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মশীলা রমণী ; কিন্তু সতের বৎসর বয়স হইতে গৃহে ও গৃহের বাহিরে এবং আপনার অন্তরের মধ্যে শুধু দীর্ঘকাল সংগ্রামই করিয়াছেন। পৃথিবীর ভাষায় যাহাকে সুখ বলে, সে রকম সুখ কোনদিনই তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই ; দুঃখের অন্ধকার ঠেলিয়াই তাঁহাকে জীবনের পথে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। কিন্তু এবার তাঁহার সংগ্রাম থামিয়া গেল, দুঃখের অন্ধকার অপসারিত হইল ; তাঁহার জীবনের স্বামী স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহাকে আপনার আনন্দ-নিকেতনে আহ্বান করিলেন। ম্যাডাম গেয়োঁ ১৭১৭ সালের ৯ই জুন ৬০ বৎসর বয়সের সময়ে ইহলোক হইতে হাস্যমুখে চলিয়া গেলেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে একটি দলিল

লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উহা হইতে গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিতেছি। তপস্বিনী নারী ঈশ্বরকে লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—

"আমি তোমার নিকট হইতে সকলই পাইয়াছি এবং তোমাকেই সমস্ত অর্পণ করিয়া যাইতেছি। হে ঈশ্বর, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। আমি তোমাকে আমার শরীর ও আত্মা অর্পণ করিতেছি, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।"

সেণ্ট টেরেসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সংকল্প

স্পেনবাসিনী ধর্ম্মশীলা নারী সেণ্ট টেরেসার উজ্জ্বল প্রতিভা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস, কর্ম্মের অসাধারণ শক্তি, মানুষের হৃদয়ের উপরে প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা, বিপদে ধৈর্য্য, সংগ্রামে সাহস—এই সমস্ত সদ্‌গুণের কথা স্মরণ করিলে, আপনা আপনি মনের মধ্যে সম্ভ্রমের উদয় হয়। এই মহীয়সী নারী স্বদেশের ধর্ম্মের গ্লানি দেখিয়া, ঐ ধর্ম্মকে পবিত্র ও উন্নত করিতে চেষ্টা করায়, প্রথম জীবনে ঘোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়া অত্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু শেষ জীবনে তিনি দেশের রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, মুর্খ সকল শ্রেণীর লোকেরই ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহারা এই তপস্বিনীকে মূর্ত্তিমতী দেবী বলিয়া মনে করিতেন। টেরেসার মৃত্যুর পরে, ১৬১৪ সালে

তাঁহার বিটিফিকেশন হইল, অর্থাৎ রোমের পোপ তাঁহাকে "স্বর্গসুখ-ভোগের অধিকারিণী" বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ঐ সময়ে স্পেনদেশে এ রকম উৎসব হইয়াছিল যে, অনেক রাজার রাজ্যাভিষেকের সময়ে তেমন উৎসব হয় কি না সন্দেহ।

এইরূপ একটি পুণ্যশীলা নারীর জীবনচরিত লেখাও সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমি এই কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইতেছি যে, আমার এই ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে তপস্বিনীর জীবনচিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত করিতে পারিব না; তাঁহার সুবৃহৎ জীবনচরিত পুস্তকের সমস্ত কথা আমি আমার গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠার মধ্যে কেমন করিয়া বর্ণনা করিব? সেই জন্য এই রচনার মধ্যে সেণ্ট টেরেসার কর্ম্মের বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া, তাঁহার ধর্ম্মজীবনের কথাই পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিব।

টেরেসা ১৫১৫ সালের ২৮শে মার্চ্চ সূর্য্যোদয়ের সময়ে স্পেনের অন্তর্গত এবিলা Avila নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম টেরেসা সেপেড-ই-আহুমদা। টেরেসা শব্দের অর্থ আশ্চর্য্যজনক। টেরেসার পিতা ডি, সেপেডা একটি প্রদেশের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। টেরেসার মাতার নাম বিয়াট্রিজ। তিনি পরমা সুন্দরী এবং ধর্ম্মশীলা রমণী ছিলেন। টেরেসার পিতৃকুলের ও মাতৃকুলের অনেকেই বীর পুরুষ। তাঁহার পিতা যুদ্ধ করাটা একটা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, টেরেসার স্বভাবের মধ্যেও যুদ্ধ করার ভাবটি প্রচ্ছন্ন ছিল। তাঁহার সম্মুখে ধর্ম্মসংগ্রাম উপস্থিত হইলেই, তিনি সাহসী সৈন্যের মত তন্মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেন এবং জয়লাভ করিতেন। টেরেসা কার্ম্মেলাইট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংস্কার করিতে গিয়া, প্রতিদ্বন্দ্বী লোকদিগের সঙ্গে যে সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পূর্ব্ব

পুরুষদের যুদ্ধের অনুরূপ। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, তিনি মানুষের রক্তে মেদিনী রঞ্জিত না করিয়াই স্বদেশের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন।

টেরেসার সাত ভাই ও দুই ভগিনী ছিল। তাঁহার পিতা অতিশয় তেজস্বী ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন। পিতার বিষয়ে স্বয়ং টেরেসাই লিখিয়াছেন—"আমার পিতার প্রকৃতি অতিশয় দৃঢ় ছিল। অথচ তিনি খুব দয়াবান্ ছিলেন। তাঁহার পুস্তকালয়ে বিস্তর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ ছিল। সেই সকল গ্রন্থ পড়িতে পিতা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেন। তাঁহার দান খুবই বেশি ছিল। ভৃত্যেরা তাঁহার অতিশয় স্নেহ প্রাপ্ত হইত। তিনি তাঁহার ভায়ের চাকরকে নিজের ছেলের মত ভালবাসিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। আমার পিতা কখনই কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না। পরনিন্দা এবং কথায় কথায় শপথ করা—তাঁহার একেবারেই অসহ্য বোধ হইত।"

টেরেসা তাঁহার জননীর বিষয়ে লিখিয়াছেন—"আমার মাতার সুমিষ্ট স্বভাব, সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং ধর্ম্মের প্রতি অন্তরের অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। আমরা প্রতিদিন সরল অন্তরে যাহাতে প্রার্থনা করিতে প্রবৃত্ত হই, সে বিষয়ে তিনি উপদেশ প্রদান করিতেন। আমরা তাঁহার নিকট বিস্তর সাধুপুরুষের পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিতাম।"

টেরেসা মায়ের মতনই অতিশয় সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার চেহারা একটু লম্বা ছিল; কিন্তু তাহা হইলেও সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে বেশ একটি সামঞ্জস্য লক্ষিত হইত। টেরেসার প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাট, সুন্দর সুদীর্ঘ ভ্রূ, সুকুমার গণ্ডদ্বয়, জ্যোতিঃপূর্ণ দুইটি নয়ন, সুন্দর দন্ত, সুকোমল হস্ত; তাঁহার প্রত্যেকটি অঙ্গের মধ্য দিয়াই যেন লাবণ্য ফুটিয়া উঠিত। টেরেসার মস্তকে কালো কোঁকড়ান গুচ্ছ গুচ্ছ কেশ শোভা পাইত;

সেগুলি যখন কপালের উপরে আসিয়া পড়িত, তখন তাঁহাকে বড়ই সুন্দর দেখাইত। তাঁহার নয়নে ও অধরে মধুর হাসি ফুটিয়া থাকিত এবং তাঁহার হাস্যোজ্জ্বল প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিলেই লোকের মনে আনন্দের সঞ্চার হইত।

টেরেসা নিজের শৈশবকাহিনী লিখিতে গিয়া আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আমি শৈশবকালে পিতামাতার কাছে কিছু কিছু টাকা পাইতাম, সে টাকা খুব অল্প বটে; তবুও উহা দরিদ্রদিগকেই দান করিতাম। অনেক সময় নির্জ্জনে বসিয়া প্রার্থনা করিতেই আমার ভাল লাগিত। আমি অল্প বয়সে পিতামাতার বাধ্য ছিলাম। তাঁহারা কোন কাজ করিতে বলিলে, করিতে পারিব না, এমন কথা মুখে উচ্চারণ করি নাই। এমন ত আমার মনে হয় না যে, আমি কখনো পরের নিন্দা করিয়াছি অথবা কোন মানুষকে ঘৃণার চোখে দেখিয়াছি। হিংসা ও ঈর্ষ্যা অন্তরে পোষণ করিয়া, কখনই মনকে বিষাক্ত করি নাই।"

টেরেসা এবং তাঁহার এক ভাই তরুণ বয়সেই বেশ এক কীর্ত্তি করিয়াছিলেন। দুই ভাইভগিনী অনবরত সাধুদিগের জীবনচরিত পাঠ করিতেন। ঐ সকল সাধুদিগের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরের কাজে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। দুই ভাইবোন সাধুদের মত ধর্ম্মের জন্য জীবন দান করিবেন, ইহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাহাই নহে; সত্বরই দুই ভাইভগিনীর ঈশ্বরের কার্য্যে প্রাণ দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে হইল। কিন্তু জীবন বিসর্জ্জন করিবার উপায় কি? উপায় আবিষ্কার করিতে অধিক বিলম্ব হইল না। তাঁহারা ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন, দুইজনে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী হইয়া মুরদের দেশে গমন করিবেন। সেখানে খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচার করিলেই

মুসলমান মুরগণ দুই ভাইভগিনীকে ধরিয়া হত্যা করিবে; তাহা হইলেই ত সাধুদের মত ঈশ্বরের জন্যই প্রাণ বিসর্জ্জন করা হইবে। দুজনের মাথায় এই খেয়াল প্রবেশ করামাত্র, তাঁহারা কাহাকেও কিছু না বলিয়া মুরদেশে যাত্রা করিলেন। দুজনেই কিছুদূর গমন করিয়া স্পেনের একটি বিজয়স্তম্ভের কাছে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। মানুষ কথায় বলে, "যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত্রি হয়।" দুই ভাইবোন একেবারে গুপ্তভাবে মুরদের দেশে গিয়া উপস্থিত হইবেন, আর হঠাৎ এ কি বিপদ্! টেরেসার পিতৃব্য অশ্বারোহণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়াই উপস্থিত। তিনি দুজনের পোষাক ও হাব-ভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহাদের মাথায় কিছু খেয়াল চাপিয়াছে; তাঁহারা একটা নূতন কিছু করিবার জন্য কোথাও যাত্রা করিয়াছেন। টেরেসাকে বাধ্য হইয়াই পিতৃব্যের কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিতে হইল। পিতৃব্য বড় জবরদস্ত লোক। তিনি বল-পূর্ব্বক দুজনকেই ফিরাইয়া গৃহে লইয়া গেলেন। দুই বালক বালিকার প্রাণ বিসর্জ্জন করাও হইল না, সাধু হওয়াও হইল না।

টেরেসার বার বৎসর বয়সের সময়ে স্নেহময়ী জননীর মৃত্যু হইল। তাঁহার বড় বোন এখন গৃহকর্ত্রী হইলেন। কিন্তু তিনি বিবাহের চিন্তাতেই ডুবিয়া আছেন। সত্বরই একটি সুপাত্রের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইবে। এতদিন টেরেসার মাতা কন্যাকে দেখিতেন; এখন আর কে তাঁহার উপর চোখ রাখিবে? কাজেই টেরেসাকে কুসংসর্গে পড়িয়া অনেক দুর্গতি ভোগ করিতে হইল। তাঁহার পিতা এ বিষয়ে খুব সতর্ক ছিলেন বটে; কিন্তু তবুও তাঁহাদের একটি চঞ্চল প্রকৃতি বিলাসিনী ধর্ম্মহীনা আত্মীয়া টেরেসার সঙ্গে খুব ভাব করিয়া বসিল। এই রমণী ধীরে ধীরে টেরেসার সরল মনে বিষ ঢালিতে

লাগিল। সংসারের যে সকল নিকৃষ্ট ভাব টেরেসা কল্পনাতেও আনিতে পারিতেন না, ধর্ম্মহীনা নারী সেই সমস্ত বিষয়েই তাহার চোখ ফুটাইয়া দিল।

এখন টেরেসাকে আর বালিকা বলা যায় না, তিনি তরুণী নারীর মধ্যে গণ্য হইতেছেন। কিন্তু কুসংসর্গের জন্যই এই সময়ে তাঁহার হৃদয়বৃন্তের অনেকগুলি সুন্দর ফুলই ম্লান হইয়া পড়িল, তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্যোতি নিষ্প্রভ হইতে লাগিল। তিনি যে রূপসী নারী, সহজেই মানুষের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারেন, এ কথা কিছুতেই বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। এতদিন তিনি সর্ব্বদাই ধার্ম্মিক লোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করিতেন, এখন তিনি পিতার অজ্ঞাতসারে অনেক জঘন্য পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। তাঁহার যে দৃষ্টি উর্দ্ধে ঈশ্বরের দিকে ছিল, এখন সেই দৃষ্টি পৃথিবীর মানুষের উপর পড়িল। টেরেসার এই পরিবর্ত্তনের বিষয়ে তিনি নিজেই লিখিয়াছেন—

"তখন আমি বেশ সুন্দর সুন্দর পোষাক পরিতাম, কেশবিন্যাস এবং তাহার পারিপাট্যের জন্য অতিশয় চেষ্টা করিতাম। উৎকৃষ্ট এসেন্স অঙ্গে মাখিতাম। এই সময়ে সাজিয়া গুজিয়া থাকিবার ইচ্ছাই প্রবল হইয়া উঠিল।"

টেরেসা তাঁহার আত্মচরিতের অন্য একটি স্থানে লিখিয়াছেন—"এই স্ত্রীলোকটির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য আমার খুব পরিবর্ত্তন হইল—আত্মার ধর্ম্মভাব বিনষ্ট হইতে লাগিল। এই স্ত্রীলোক এবং আর একটি মানুষ আমার হৃদয়ের উপরে তাহাদের চরিত্রের ছাপ দিয়া গেল। * * আমার যে যুবকটির প্রতি ভালবাসা জন্মিয়াছিল, তাহাকে বিবাহ করিলে যে ভয়ানক একটা অপরাধ হইত, তাহা নহে। আমি ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট জীবনের সমস্ত কথাই খুলিয়া বলিয়াছি। তিনি

বলিয়াছেন, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তেমন গুরুতর কোন কার্য্য করি নাই।”

মনস্বিনী টেরেসা হৃদয়ের সহিত সংগ্রাম করিয়া বিবাহের আকাঙ্ক্ষা ও মনের অনুরাগ দূর করিলেন; অল্প সময়ের জন্য একটি ধর্ম্মহীন লঘুপ্রকৃতির যুবকের দিকে যে মনটা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল, সে মনকে ফিরাইয়া বিবেকের অধীন করিলেন। টেরেসার পিতা কন্যাকে আর বাড়ীতে রাখা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না; কারণ টেরেসার বড় বোনের বিবাহ হইয়া গিয়াছে, গৃহে আর কোন স্ত্রীলোকই নাই; এ রকম অবস্থায় তাঁহাকে কিরূপে গৃহে রাখিবেন? কে তাঁহার তত্ত্বাবধান করিবে? কাজেই বাধ্য হইয়া তিনি কন্যাকে সন্ন্যাসিনীদিগের কনভেণ্টে অর্থাৎ মঠে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ সময়ে অনেক বালিকা মঠে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিত।

টেরেসা দেড় বৎসর মঠে বাস করিলেন; তাহার পরে তাঁহার সঙ্কটাপন্ন পীড়া হইল। তখন পিতা কন্যাকে গৃহে লইয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহে কেই বা তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিবে? তাই টেরেসা একটু ভাল হইয়াই ভগিনীর গৃহে চলিলেন। সে স্থানের স্বাস্থ্য অতি উত্তম। সেখানে যাইবার সময়ে রাস্তার সুনির্ম্মল বায়ুর জন্য তাঁহার শরীর সুস্থবোধ হইতে লাগিল। তাহা ছাড়া টেরেসার প্রকৃতির মধ্যে কবিত্ব ও অতিশয় সৌন্দর্য্যানুরাগ ছিল। তিনি পথের দুধারে অভ্রভেদী গিরিশিখর, বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ অরণ্য ও নদী-নির্ঝরিণী এবং স্থানে স্থানে সুন্দর পাইনের গাছ দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ভগিনীর গৃহে যাইবার রাস্তাতেই টেরেসার এক পিতৃব্যের গৃহ। তিনি খুব সম্ভ্রান্ত জমিদার। তাঁহার বিপুল সম্পত্তি। বাড়ীতে

সুবৃহৎ অট্টালিকা, গাড়ীঘোড়া, দাসদাসী, বিস্তর লোকজন। টেরেসা পিতৃব্যের অনুরোধে কয়েক দিন তাঁহার গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। টেরেসার পিতৃব্য বাহিরে ধনী, কিন্তু অন্তরে সন্ন্যাসী। সংসারের ধনসম্পদ্, গৃহের লোকজনের কোলাহল, কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। তাঁহার চিত্ত ক্ষণস্থায়ী সংসারের অতীত অক্ষয় পুরুষের দিকে ছুটিয়া যাইবার জন্য উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে।

পিতৃব্য ভ্রাতুস্পুত্রীকে পাইয়া অত্যন্ত সুখী হইলেন। তিনি টেরেসাকে কহিলেন—"মা, তুমি যে কয়েক দিন এখানে থাকিবে, তোমার সুমিষ্ট কণ্ঠে আমাকে গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতে হইবে।"

এই ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠ-সম্বন্ধে টেরেসা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই,—"আমি পিতৃব্যকে উচ্চৈঃস্বরে গ্রন্থগুলি পড়িয়া শুনাইতাম। পিতৃব্যের কাছে অল্প কয়েক দিন বাস করিয়াছিলাম। কিন্তু কে বলিবে ঐ গ্রন্থগুলির মধ্যে কি এক ঐন্দ্রিজালিক শক্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। সেই শক্তি আমার অজ্ঞাতসারে গোপন-মর্ম্মস্থানে প্রবেশ করিল, চোখের আঁধার কাটিয়া গেল; জীবনের চঞ্চলতা দূর হইল; আবার ধীরে ধীরে শৈশবের মহৎভাবগুলি অন্তরে জাগ্রত হইতে লাগিল।

টেরেসা পিতৃব্যের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভগিনীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে শরীর ও মন দুই-ই খুব ভাল বোধ হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার জীবনের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে অত্যন্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। টেরেসার মনে হইল, সংসারের সুখ মানুষকে কিছুতেই তৃপ্তিদান করিতে পারে না। ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিলেই পাপ দূর হয় এবং প্রকৃত শান্তিলাভ করা যায়। ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলেই সন্ন্যাসিনী হওয়া প্রয়োজন।

টেরেসা ক্রমাগত তিন মাস পর্য্যন্ত নানা রকম চিন্তা করিলেন, তাঁহার অন্তরে ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। তিনি কি বাসনার উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে পারিবেন? তিনি কি ভোগস্পৃহা দূর করিয়া ত্যাগমন্ত্রই গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন? পিতার চোখের জল দেখিয়া কি তাঁহার মন টলিবে না? সহস্র চিন্তা আসিয়া রমণীর হৃদয় অধিকার করিল। কিন্তু তিনি সেই সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হওয়ার জন্যই দৃঢ় সংকল্প করিলেন।

টেরেসা তাঁহার সন্ন্যাসিনী হইবার সংকল্প পিতাকে জানাইলেন। হায়, স্নেহময় পিতার প্রাণে তখন যে আঘাত লাগিল, সে আঘাতের বেদন অন্তর্যামী দেবতা ভিন্ন আর কেহই জানিতে পারিল না। তিনি মাতৃহীনা কন্যাকে কত যত্ন করিয়া মানুষ করিয়াছেন, আজ সেই কন্যা সুখের পথ ত্যাগ করিয়া, চিরদিনের জন্য দুঃখকেই বরণ করিয়া লইতেছেন। শুধু কি তাই? টেরেসা যে ধর্ম্মের দুর্গম গিরি-শিখরে আরোহণ করিবার জন্য যাত্রা করিতে চাহিতেছেন, সেই পথে পদস্খলন হইবার আশঙ্কা যথেষ্ট; অথচ একবার পদস্খলন হইলেই অধর্ম্মের রসাতলপুরীতে গিয়া পড়িবার সম্ভাবনা। পিতা এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়াই কন্যাকে সন্ন্যাসের পথ হইতে ফিরাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টা যখন ব্যর্থ হইল, তখন তিনি কন্যাকে বলিলেন—

"আমি ত আর অল্পদিনই এ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব। কিন্তু যতদিন এখানে আছি, ততদিন আমার অনুরোধ রক্ষা কর; সেই কয়টা দিন তুমি সন্ন্যাসিনীর ব্রত গ্রহণ করিও না। তাহার পরে আমার মৃত্যু হইলে, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও, তখন কেহই তোমার সংকল্পের পথে বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইবে না।"

বুদ্ধিমতী টেরেসা পিতার মনোবেদনা বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বুঝিয়াই বা ফল কি? তিনি ঈশ্বরকে আপনার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের যে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আবার গুরুতর অপরাধ করিবেন? ধর্ম্ম লইয়া এই রকম ছেলেখেলা করিলে, তাঁহার নরকের পথই কি প্রশস্ত হইয়া উঠিবে না? পিতার কষ্টের কথা চিন্তা করিয়া তাঁহার অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হইতে লাগিল, তবুও তিনি অধর্ম্ম ও নরকের ভয়ে অধীর হইয়া আপনার সঙ্কল্প অটুট রাখিলেন এবং সন্ন্যাসিনী হইবার জন্যই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ন্যাসিনী

১৫৩৩ সাল, নভেম্বর মাস; ঐ মাসের ২রা তারিখটি যেন স্বর্গের আলোক ও পবিত্রতা লইয়া টেরেসার সম্মুখে উপস্থিত হইল সেই আলোকস্পর্শে তাঁহার চিত্তশতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী কেমন এক নূতন স্বরে বাজিতে লাগিল। অবশেষে টেরেসার অন্তরে পবিত্রাত্মা আবির্ভূত হইলেন। তখন তরুণী নারী পিতার স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, সংসারের সুখ পায়ে ঠেলিয়া সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য গৃহ হইতে বাহির হইলেন। ঐ সময়ে টেরেসার বয়স সবে আঠার বৎসর মাত্র।

টেরেসা পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া এক মাইল দূরস্থিত এবিলা নগরের সন্ন্যাসিনীদিগের একটি কণ্‌ভেণ্টে অর্থাৎ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে তাঁহার সন্ন্যাসিনী হইবার দিন স্থির হইল। সে দিন স্নেহময় পিতা কন্যাকে দেখিবার জন্য উপাসনামন্দিরে উপস্থিত হইলেন। হায়, একদিন যে সুন্দরী ও সুকুমারী টেরেসা বস্ত্রাভরণে সুসজ্জিতা হইয়া সৌন্দর্য্যে লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন, আজ তাঁহার মস্তকের গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশরাশি কর্ত্তিত হইয়াছে; অঙ্গে একখানিও আভরণ নাই; পরণে সন্ন্যসিনীর পরিচ্ছদ। কিন্তু আভরণবিহীনা টেরেসার নিরুপম মূর্ত্তির ভিতর এক অপার্থিব জ্যোতি নিরীক্ষণ করিয়া পিতা চমকিত হইলেন; তাঁহার মনের দুঃখ যেন একটুকু প্রশমিত হইল। দেখিতে দেখিতে টেরেসার সন্ন্যাসব্রতগ্রহণের শুভানুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়া গেল। পিতা উদাস মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

টেরেসা, সন্ন্যাসিনী হওয়ার পরে, আপনার অসাধারণ মানসিক শক্তি হৃদয় ও মনের উপর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। তিনি দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞার বলের দ্বারা এক বৎসর পর্য্যন্ত আশ্রমের কঠোর ব্রত প্রতি-পালন করিলেন। কিন্তু তাঁহার শরীর আর ক্লেশ সহ্য করিতে পারিল না, একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল; তিনি সময় সময় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেন।

টেরেসা ১৫৩৫ সালে চিকিৎসার জন্য পিতৃভবনে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় রোগ আরোগ্য হইল না। ১৫৩৭ সালে আবার তিনি আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন; তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগে ক্রমাগত তিন বৎসর বিছানায় শয়ন করিয়াই থাকিতে হইল। তিনি রুগ্নশয্যায় সর্ব্বদা ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করিতেন। ধর্ম্মার্থী মুমুক্ষু মানুষের পক্ষে গভীর আধ্যাত্মিক-ভাব পূর্ণ গ্রন্থপাঠ এবং

ব্যাকুল প্রার্থনাই বিশ্বাস ও ভক্তিলাভ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। টেরেসা প্রার্থনার মধ্য দিয়াই ঈশ্বরের পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। কিছু দিনের জন্য তাঁহার হৃদয় বিশ্বাস ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ঈশ্বরের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া এবং রোগের মধ্যে প্রেমস্বরূপের প্রীতি পাইয়া আনন্দোৎফুল্লমনে শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করিতেন। আশ্রম-বাসিনী মহিলাগণ এই তরুণী নারীর বিশ্বাসের বল ও নির্ভরের শক্তি দেখিয়া, তাঁহাকে অতিশয় ধর্ম্মশীলা স্ত্রীলোক বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

ঐ সকল আশ্রমবাসিনী দেখিতে পাইলেন, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা ব্যাপারটি টেরেসার হৃদয়ের সীমার মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে না; ক্ষুদ্রতা ও নীচতাকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন; আত্মার দুর্জ্জয় শক্তিতে তিনি দুঃখের উপর জয়লাভ করেন; কাজেই তাঁহাদের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। টেরেসা লিখিয়াছেন—"আমি কখনই বিস্মৃত হই নাই যে, আমার সম্বন্ধে যে রকম আলোচনা আমি মোটেই পছন্দ করি না, অন্য লোকের সম্বন্ধে সেইরূপ আলোচনা করা কখনই উচিত নয়। যাঁহারা আমার সঙ্গে নিরন্তর বাস করিতেন, আমার প্রভাব যাঁহাদের উপরে পতিত হইয়াছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই পর-নিন্দা ও ক্ষুদ্রতা ত্যাগ করিয়াছেন। আশ্রমের সকলেই একটা কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আমি যেখানে থাকিব, সেখানে আর যাহাই হউক, পরনিন্দা হইতে পারিবে না—যে রকম আলোচনায় অন্য লোকের সম্মানের লাঘব হয়, সেরূপ আলোচনা কেহই করিতে পারিবেন না।"

টেরেসা আরো লিখিয়াছেন—"আমার রোগ-যন্ত্রণার মধ্যে আমি ঈশ্বরের নিকট হইতে যে বিশ্বাসের ও নির্ভরের শক্তি লাভ করিয়াছি, উহা যদি আমার অন্তর হইতে চলিয়া যায়, তবে আমি আরোগ্যলাভ

করিতে চাহি না, চিরকাল রুগ্নশয্যায় পড়িয়া থাকিতেই চাহি। আমি যখন দেখিলাম, এই পৃথিবীর চিকিৎসকেরা তাঁহাদের পার্থিব শক্তির দ্বারা আমার কিছুই করিতে পারিলেন না, তখন আমি স্বর্গীয় চিকিৎসকের অর্থাৎ পরলোকবাসী সাধু জোসেফের আত্মার শরণাপন্ন হইলাম। আমার বিশ্বাস, তাঁহার কৃপাতেই আমি পক্ষাঘাত রোগ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছিলাম।"

সন্ন্যাসিনী টেরেসার এই যে তিন বৎসর রোগশয্যায় কাটিয়া গেল, ইহাকে তাঁহার ধর্ম্মজীবনের উন্মেষের অবস্থা বলা যাইতে পারে। ইহার পর, ক্রমাগত আঠার বৎসর তাঁহার জীবনে শ্রেয়ঃ প্রেয় এই উভয়ের সংগ্রাম চলিয়াছিল। উহাকে তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় অবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাধনা ও সিদ্ধি

সন্ন্যাসিনী টেরেসা ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে গিয়া, উঠিয়া পড়িয়া ঠেকিয়া শিখিয়া, এইবার তিনি অতিশয় সতর্ক হইলেন। তাঁহার আত্ম-দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার যোগ স্থাপন করিবার জন্য সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুদিন পূর্ব্বেই সৌভাগ্যবতী টেরেসা কয়েকজন সাধুপুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ঐ সকল

সাধুদিগের সুনির্ম্মল চরিত্র, সুগভীর বিশ্বাস ও সুপবিত্র প্রেম দর্শন করিয়া, ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সাধুদিগের জ্বলন্ত উপদেশ তাঁহার অন্তরে জীবন্ত ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। টেরেসা নিজেই লিখিয়াছেন—

"এই দুই সাধুপুরুষের মধ্যে একজনের সংস্পর্শে আমার অন্তরে এক আশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবেশ করিল। মনে হইতে লাগিল, এ জগতে এমন কিছু নাই, যাহা আমি করিতে পারি না।"

এই সময় হইতেই টেরেসা কৃচ্ছ্রসাধন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই কঠোর সাধনের কথা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। তিনি পথের কীটের ন্যায় আপনার প্রবৃত্তি পদতলে নিস্পেষিত করিতে চেষ্টা করিতেন। সেজন্য টিনের জামা তৈরী করিয়া গায়ে দিতেন; কণ্টকলতা বিছানার উপর রাখিয়া শয়ন করিতেন; তাঁহার শরীর ক্ষত বিক্ষত ও রক্তে রঞ্জিত হইয়া যাইত। টেরেসা যৎসামান্য আহার করিয়া কোন রকমে শরীরটা রক্ষা করিতেন। সুরা পান করা দূরে থাকুক, তিনি উহা স্পর্শও করিতেন না। ঘোড়ার ব্যবহারের জন্য যে নিকৃষ্ট কম্বল ক্রয় করা হয়, টেরেসা সেই কম্বলের জামা তৈরী করিয়া গায়ে দিতেন। তিনি যে তৎকালের ভ্রান্ত মতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই; আমরা পরে দেখিতে পাইব, তাঁহাকে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল; তিনি উপাসনা, ধ্যান ও প্রার্থনা করিয়াই ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ধর্ম্মশীলা নারীর প্রাণ সাধনের একটি উচ্চতম অবস্থায় উপনীত হইবার জন্য যে কি রকম ব্যাকুল হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার কৃচ্ছ্রসাধনের বিষয় চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

টেরেসা কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিলেন।

তাঁহার অন্তরের সংগ্রাম অনেক পরিমাণে থামিয়া গেল। তিনি আপনার জীবন নিরাপদ মনে করিতে লাগিলেন। এখন তাঁহার পদস্খলন হইবার আর কোনই সম্ভাবনা নাই। টেরেসার জীবনচরিত রচয়িত্রী তাঁহার এই অবস্থাকে ধর্ম্মজীবনের প্রথম সোপান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অতঃপর সাধিকা নারী সাধনের আর একটি সোপানে উঠিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই সময়ের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি স্বয়ং লিখিয়াছেন—"প্রভু পরমেশ্বর আমার ভিতরে তাঁহার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ করিতে পারেন, এজন্য আমি ঈশ্বরের হস্তেই আত্ম-সমর্পণ করিলাম। তাহা ছাড়া পরলোকবাসী সাধুপুরুষদিগের নিকট শক্তি ভিক্ষা করিতে লাগিলাম। তাঁহাদের সাহায্যে আমি যেন ঈশ্বরের প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। আমার দুই বৎসর শুধু প্রার্থনাতেই কাটিয়া গেল।"

টেরেসা প্রার্থনা ও ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ্যের আর একটি সোপানে আরোহণ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় প্রেমের আবির্ভাব হইল। এই প্রেমের শক্তি শুধু যে তাঁহার আত্মাতেই প্রকাশ পাইত, তাহা নহে; তিনি তাঁহার শরীরের মধ্যেও উহার আশ্চর্য্য ক্রিয়া অনুভব করিতেন। ঈশ্বরের প্রেম যেন বৈদ্যুতিক শক্তির মত টেরেসার হৃৎপিণ্ড স্পর্শ করিত, তাঁহার সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

টেরেসা ঈশ্বরের প্রেম লাভ করিলেন, তাঁহার চিত্ত পবিত্র হইল, হৃদয় অমৃতে ভরিয়া উঠিল; কিন্তু তাহাতেই বা তপস্বিনীর তৃপ্তি কোথায়? তিনি সাধনের অফুরন্ত পথে অতি দ্রুতবেগে চলিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষাও কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরীর থাকে থা'ক, যায় যা'ক, তাঁহাকে জীবনের পূর্ণতা লাভ করিতেই হইবে।

টেরেসার এই সংকল্পের কথা শুনিয়া আশ্রমের সন্ন্যাসিনীগণ বলিলেন, তিনি যে ব্রত পালন করিতে চাহিতেছেন, তাহা বড়ই কঠিন।

কিন্তু শক্তিশালিনী নারী সেই কঠোর-ব্রত পালন করিবার জন্যই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি এই ব্রত উদযাপনের জন্য পাঁচ বৎসর দুষ্কর তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার আচার্য্য তাঁহাকে কঠোর-ব্রত ও কৃচ্ছ্রসাধন ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। এই সময় হইতে তিনি আর শরীরকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধন করেন নাই। ভক্তিমতী নারী ঈশ্বরের করুণার উপর নির্ভর করিয়া ধ্যান, প্রার্থনা ও নামজপ করিতেন। এই সাধনায় তপস্বিনীর মনোরথ পূর্ণ হইল। সৌভাগ্যবতী আপনার চির-আকাঙ্ক্ষিত উচ্চতম ধর্ম্মজীবন লাভ করিলেন। তাঁহার নারীজন্ম সার্থক হইয়া গেল।

সন্ন্যাসিনী তাঁহার এই ধর্ম্মসাধনের ও ধর্ম্মজীবনের নিগূঢ় কথা আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা উহার অল্প কয়েকটি কথার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"আমার জীবনে চারিটি অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। তাহার মধ্য-দিয়াই আমাকে চলিতে হইয়াছে। প্রথম অবস্থায় পাপ আসিয়া আক্রমণ করে। পাপের হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। এই সময় কাহারো বিশ্রাম নাই। এ অবস্থায় শরীরকেও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। তাহা করিলে ভগ্নদেহই ধর্ম্মপথের বিঘ্ন হইয়া দাঁড়ায়। তাই পরিমিত আহার ও পরিমিত নিদ্রার প্রয়োজন।"

"দ্বিতীয় অবস্থায় অত্যন্ত কঠোর ভাব অবলম্বন করিতে হয় না। মন আপনা আপনি ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন হইয়া যায়। সহজেই ঈশ্বরের করুণা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। সেজন্য মনের সমস্ত গ্লানি

দূর হয়। সকল মনোবৃত্তিগুলি যেন ঈশ্বরের মধ্যেই ডুবিয়া যায়। এই সময়ে মনোবৃত্তিগুলি যে নষ্ট হয়, তাহা নহে। তখন ইচ্ছা তাহার স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করে। প্রেম যেমন প্রেমাস্পদের আজ্ঞানুবর্ত্তী হওয়া কষ্টকর বলিয়া মনে করে না, তেমনি ইচ্ছাও ঈশ্বরের অধীন হইয়া কোন রকম ক্লেশ অনুভব করে না।"

"হে ঈশ্বর, তোমার প্রেমের কি অপূর্ব্ব শক্তি! তোমার প্রেম আমার মনোবৃত্তিগুলিকে আশ্চর্য্যভাবে শৃঙ্খলিত করিয়াছে। এখন ত তুমি ভিন্ন আর কাহারো কথা চিন্তা করিতেও ভালবাসি না। আমার ইচ্ছা তোমারই অমৃতরস পান করে, সে বিষয়ে আমার কল্পনা ও বুদ্ধি ইচ্ছাকেই সাহায্য করে।"

"তৃতীয় অবস্থায় অন্তরে নিয়ত ঈশ্বরের কৃপাস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের শুধুই আত্মার মুখ সেই করুণার দিকে ফিরাইয়া দিতে হয়। এই সময়ে আমাদের মনোবৃত্তি ঈশ্বরের চরণতলে লুটাইয়া পড়ে। তখন ঐ সকল মনোবৃত্তি যে, কি রকম ভাবে চালিত হয়, তাহা আমরা নিজেরাই বুঝিতে পারি না। এ অবস্থায় আত্মার আনন্দ, মধুরতা ও শান্তি পূর্ব্বাপেক্ষা কতই যে বেশী হয়, তাহা বলাই যায় না। মনে হয় যেন ভগবান বলপূর্ব্বক তাঁহার করুণার সুধারস পান করাইয়া আত্মাকে আকর্ষণ করিতেছেন। তখন মানবাত্মার পশ্চাতে অথবা সম্মুখে যাইবারও শক্তি থাকে না; আত্মা এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের মধ্যে অবস্থিতি করে।"

"চতুর্থ অবস্থার কথা বলাই দুঃসাধ্য। তবে এ বিষয়ে আমি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিতেছি। আমার এই অবস্থাতে আমি ঈশ্বরের বাণী শুনিতে পাইলাম। ঈশ্বর আমাকে বলিলেন—'বৎসে, তোমার আত্মা আমাতে মিশিতেছে, আমার সঙ্গে যুক্ত হইয়া

যাইতেছে, এখন তোমাতে আর তুমি থাকিবে না, আমিই থাকিব।"

"এইরূপ অবস্থায় মানুষকে চেষ্টা করিয়া কিছুই করিতে হয় না। ঈশ্বরের করুণা সর্ব্বদাই আত্মাকে আবেষ্টন করিয়া রাখে। মানবাত্মা আনন্দে শান্তিতে বাস করে। অন্তরে চিরবসন্ত বিরাজিত থাকে। হৃদয়োদ্যান পুষ্পে সুশোভিত হইয়া উঠে। তখন আমাদের নিশ্বাস যেন আর বহে না, হাত যেন আর উঠে না, নয়ন আপনা আপনি নিমীলিত হয়; কর্ণে শব্দ প্রবেশ করে না, মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় না, শরীরের স্পন্দন যেন থামিয়া যায়, দেহের শক্তি আত্মার শক্তিতে পর্য্যবসিত হয়। উহাতে আত্মার আনন্দ আরো বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

"কিন্তু আত্মার এইরূপ অবস্থা অল্পক্ষণই স্থায়ী হয়। তাহার পরে কি রকম মনে হয়? তখন ঈশ্বর হইতে আপনার মধ্যে গিয়াই পড়ি। মনে কেমন একটা উদাস ভাব জাগিয়া উঠে। আর সংসারের কাজ ভাল লাগে না। প্রাণের মধ্যে সাধু সঙ্কল্পই জাগ্রত হয়। সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য স্বয়ং ঈশ্বরই শক্তি প্রদান করেন। তখন ঐশীশক্তি আশ্চর্য্যভাবে আত্মাকে বলিষ্ঠ করে। মানুষের সবল আত্মা পরমেশ্বরের নামে কোন কার্য্য করিতেই পশ্চাৎপদ হয় না।

"হায়, আমি এত ক্ষুদ্র যে, এই অবস্থায় আমার কি কাজ করিতে হইবে, তাহা এখনো স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি না। এই জন্যই আমার ক্লেশ।"

"হে আমার পরম সম্পদ, তুমি আমাকে দয়া কর। তোমার নিকট আমি যে ঋণী, সেই ঋণ কিছু শোধ করিতে পারি—এমন শুভ-মুহূর্ত্ত আনিয়া দাও। হে প্রভু, তোমার সেবিকা যাহাতে তোমারই ইচ্ছানুরূপ কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে, তুমি তাহাকে সেইরূপ আদেশ কর।

আমার ন্যায় দুর্ব্বলা নারী শুধু তোমার প্রেমের শক্তিতেই শক্তিশালিনী হইয়া অনেক মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। * * হে আমার পরমধন, আমার প্রাণে বল দাও, আমার আত্মাকে কার্য্যে নিয়োজিত কর। এই লও আমার জীবন, এই লও আমার ইচ্ছা; আমার সর্ব্বপ্রকার মর্য্যাদা তোমাকেই অর্পণ করিতেছি। আমি তোমারই। তোমার ইচ্ছানুসারেই আমার ব্যবস্থা কর।"

তপস্বিনী টেরেসা কোন বই পড়িয়া অথবা কোন আচার্য্যের উপদেশ শুনিয়া এই সকল চিত্তাকর্ষক ধর্ম্মকথা লিখিয়া রাখেন নাই। তিনি সাধন করিয়া যাহা বুঝিয়াছেন, ধ্যানদৃষ্টিতে যাহা দেখিয়াছেন, আত্মায় যাহা লাভ করিয়াছেন,—যাহা সম্ভোগ করাতে তাঁহার বাসনানল নির্ব্বাপিত হইয়াছে, নারীজীবন সার্থক হইয়া গিয়াছে;—তাহাই অকৃত্রিম প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা উহা পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, তিনি যথার্থই ধর্ম্মের উচ্চতম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।



চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কার্য্য

তপস্বিনী টেরেসা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন; এখন ঈশ্বরের বাণী শুনিয়া এবং তাঁহারই সেবিকা হইয়া, জগতের কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

এই কর্ম্মবিষয়ে সন্ন্যাসিনীর যে একটি বিশেষ মত ছিল, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলিতেন, বাহিরের কর্ম্মের দ্বারাই অন্তরের ধর্ম্মভাবের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মবিহীন ধর্ম্ম হৃদয়ের ভাবোচ্ছ্বাসের মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়। টেরেসা লিখিয়াছেন—

"প্রার্থনা যতই সুন্দর হউক তাহার সহিত যদি কর্ম্মের যোগ না থাকে, তবে তাহা কখনই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এবং সম্পূর্ণ হয় না। হায়, কর্ম্মহীন ভক্তিবিহ্বলতা,প্রেমের উচ্ছ্বাস, সঙ্গীতের মোহ, পূজার উপচার, আড়ম্বর, আয়োজন সমস্তই নিতান্ত ব্যর্থ। প্রেম-ভক্তিতে গদগদ হইয়া যেমন একান্ত মনে সেই দেবাদিদেবের স্তবস্তুতি করিবে, তেমনি পূজাবসানে কঠোর হইতে কঠোরতর কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে—নতুবা সে পূজা ব্যর্থ, সে ভক্তির উচ্ছ্বাস মত্ত হৃদয়ের উত্তেজনা মাত্র, মত্ততার অবসানে কোথায় অন্তর্ধান হইয়া যায়। কেবলমাত্র উপাসনার দ্বারা আত্মার উর্দ্ধরতা ও সম্পূর্ণতা সাধিত হয় না, প্রেমই তাহাকে সম্পূর্ণ বিকশিত করে। এই প্রেমের পরিচয় বাক্যে নয়, কার্য্যে; কেবল স্তবস্তুতি দ্বারা নয়, অনেক দুঃখ বহন করিয়া, অনেক স্বার্থ বিসর্জ্জন করিয়া এই প্রেম সপ্রমাণ করিতে হয়। আমি বহুকাল হইতে বহু বন্দনা করিয়াছি, আমি আর কিছুই চাহি না, কেবলমাত্র এই প্রার্থনা, আমি যেন দিনে দিনে প্রেমের অধিকারী হই এবং উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি। ফলের দ্বারা আমার প্রেম সার্থক হউক।" *

টেরেসার কর্ম্মবিষয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা যে কি, এইবার তিনি তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাকে দেশের প্রচলিত খ্রীষ্টানধর্ম্মের দূষিত

* এই বঙ্গানুবাদ "ভক্তবাণী" হইতে উদ্ধৃত হইল।

রীতিনীতি দূর করিয়া, লোকের সম্মুখে ভক্তি ও কর্ম্ম সমন্বিত ধর্ম্ম-জীবনের একটি আদর্শ উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। এজন্য সর্ব্বাগ্রে তাঁহার উচ্চ আদর্শের অনুরূপ একটি আশ্রম স্থাপন করা প্রয়োজন। টেরেসা একদিন নিশীথকালে এই আশ্রম-সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিলেন। স্বপ্নের ভিতর স্বয়ং যিশুখ্রীষ্টই তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"তুমি তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত কর।" একবার নয়, দুবার নয় টেরেসা স্বপ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ খ্রীষ্টের আদেশবাণী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে একটি নূতন আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে সঙ্কল্পের উদয় হইল।

এই সময়ে ইউরোপে ঘোর ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে জর্ম্মানদেশে মহাত্মা মার্টিন লুথার যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন, এখন সর্ব্বত্রই সেই আন্দোলনের ঝড় বহিতেছিল। স্পেনের দুর্দ্দান্ত সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ জর্ম্মানীরও সম্রাট ছিলেন। সেজন্য লুথারের বিচারের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি লুথারের প্রচারিত ধর্ম্মমতের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কাজেই স্পেনের লোকেরা লুথারের প্রবর্ত্তিত প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। বরঞ্চ তাঁহারা পুরাতন কুসংস্কার বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়াছিলেন।

স্পেনবাসিনী টেরেসাও মার্টিন লুথারের সংস্কৃত ধর্ম্মমত গ্রহণ করেন নাই। তিনি আপনাকে অনেক অসত্য ও কুসংস্কারের হস্ত হইতেও রক্ষা করিতে পারেন নাই। মনস্বিনী টেরেসা ভক্তিরসাত্মক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তিনি প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারিণী ছিলেন; সাহিত্যরসে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল; কিন্তু তিনি জ্ঞানোজ্জ্বল সত্যের

ভূমিতে দাঁড়াইয়া স্পেনদেশে ধর্ম্মের এক মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তবুও তিনি অনেকগুলি আশ্রম স্থাপন করিয়া, স্বদেশের ধর্ম্মের দূষিত রীতিনীতি দূর করিয়া, তন্মধ্যে যে নূতন আলোক ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাই আমি টেরেসার আশ্রমসংক্রান্ত কয়েকটি কাজের বিষয়েই খুব সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

যে সময়ের কথা লিখিতেছি, তখন ধর্ম্মযাজক, ধর্ম্মসাধক ও সাধিকা নারীগণ প্রায়ই আশ্রমে বাস করিতেন। এজন্য সর্ব্বত্র আশ্রমগুলির উপরই লোকের ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখা যাইত। আশ্রমগুলির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক বায়ু উৎপন্ন হইত, তাহাই নগরে ও গ্রামে প্রবাহিত হইয়া নরনারীর আত্মার স্বাস্থ্যরক্ষা করিত। কিন্তু এই আশ্রমগুলির অবস্থা খুবই খারাপ হইয়াছিল। আশ্রমের যে সকল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী মানুষের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবেন, তাঁহাদের অনেকের মধ্যেই জ্ঞানের অভাব দেখা যাইত। কেহ কেহ মনের মধ্যে হিংসা, দ্বেষ, বিষয়াসক্তি ও অধর্ম্ম পোষণ করিতেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই সন্ন্যাসিনী টেরেসার মনে নূতন আশ্রম স্থাপনের সংকল্প জাগ্রত হইয়াছে। এখন তিনি হৃদয়ে মহৎ উদ্দেশ্য ও অন্তরে নব আদর্শ লইয়া একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক শ্রেণীর রক্ষণশীল লোক তাঁহার নূতন আশ্রমের কথা শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিলেন। মার্টিন লুথার একটা কিছু নূতন করিতে গিয়াই ইউরোপে আগুন জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন; আবার টেরেসাও একটা নূতন কাণ্ড করিতে চাহিতেছেন! তাঁহারা সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য হুঙ্কার দিয়া দাঁড়াইলেন। হয় ত তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, যে সকল মূরজাতীয় লোক স্পেনদেশ আক্রমণ

করিয়াছিল, এবার তাহাদেরই প্রেতাত্মা নারীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দেশের ধর্ম্ম আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছে।

দেশের ঐ সকল রক্ষণশীল লোক টেরেসাকে জব্দ করিবার জন্য একদিন এক বৃহৎ সভা করিলেন। কিন্তু একজন চিন্তাশীল যুবকের জন্য সভার সমস্ত কাজ পণ্ড হইয়া গেল। তিনি টেরেসার পক্ষে দাঁড়াইয়া এমন তেজের সহিত বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন যে, সভায় অগ্নিবর্ষণ হইতে লাগিল। কাহার সাধ্য যে সেই যুবকের যুক্তি খণ্ডন করিয়া তাঁহার কথার উত্তর প্রদান করে?

তেজস্বিনী নারী টেরেসা সহস্র বাধাবিঘ্নের মধ্যেও স্বীয় সংকল্প বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া, আপনার উচ্চ আদর্শের অনুরূপ একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চারিজন সন্ন্যাসিনী সেই আশ্রমে প্রবেশ করিয়া নূতন ভাবে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চিত্ত সত্যের জন্য ও ধর্ম্মের জন্য তৃষিত হইয়াছিল। তাই তাঁহারা মানুষের ভ্রুকুটির প্রতি দৃকপাত না করিয়া শুধুই ঈশ্বরের পানে চাহিয়া টেরেসার সঙ্গিনী হইলেন। তাঁহাদের নূতন আশ্রমে কি কি নিয়ম স্থাপিত হইল, এখানে তাহারও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতেছি।

(১) যাঁহারা আশ্রমে প্রবেশ করিবেন, তাঁহাদের নিজের কোন সম্পত্তি থাকিবে না, সকলই আশ্রমের হইবে। আশ্রমবাসিনীগণ মাংস আহার করিতে পারিবেন না। তাঁহারা খুব কম দামের মোটা কাপড়ের তৈরী পোষাক ব্যবহার করিবেন। তাঁহাদের মাথার চুল কাটিয়া ছোট করিতে হইবে।

(২) আশ্রমবাসিনীগণ প্রাতে ছয়টার সময় শয্যা হইতে উঠিবেন। তাহার পরে আটটা পর্য্যন্ত উপাসনা। আহারের সময়ের কোন নিয়ম নাই। ঈশ্বরের করুণায় আশ্রমে খাদ্যসামগ্রী আসিলে ঘণ্টা পড়িবে;

তখনই সকলে আহার করিবেন। রুটি, মাছ. পণির—সাধারণত ইহাই আশ্রমবাসিনীদিগের আহারের সামগ্রী। ভোজনান্তে এক ঘণ্টা বিশ্রাম। দুইটা বাজিলেই সকলে মিলিত হইয়া গ্রন্থ পাঠ করিবেন। ছয়টার সময় শেষ প্রার্থনা।

(৩) আশ্রমের মটো—"যদি কেহ কাজ না করে, তবে তাহার পক্ষে আহার করা উচিত নয়।"

(৪) আশ্রমবাসিনীদিগের অর্থের প্রতি কোন রকম আসক্তি থাকিবে না। আত্মত্যাগ ও বৈরাগ্যই আশ্রমের মূলমন্ত্র।

চতুর্থ নিয়মটির বিষয়ে টেরেসা লিখিয়াছেন—"দারিদ্র্য, বৈরাগ্য ও আত্মত্যাগের শক্তি মানুষের অমূল্য সম্পত্তি। যিনি এই সম্পত্তির অধিকারী, তিনি সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। * * আমি আমার নিজের অভিজ্ঞতা হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, অর্থ ও পদমর্য্যাদাই ধর্ম্মপথের প্রধান বিঘ্ন। আমি আমার আশ্রম হইতে ঐ দুইটি সমূলে উৎপাটন করিব। বৈরাগ্যের উপরেই আমার আশ্রম স্থাপিত হইবে। আমরা যেন প্রভু যিশুর আদর্শ বিস্মৃত না হই। তিনি আস্তাবলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জগতে তাঁহার আপনার বলিবার কিছুই ছিল না।

আমার ক্ষুদ্র রচনার মধ্যে স্থান অতি অল্প। তাই সন্ন্যাসিনীর আশ্রমের অনেকগুলি নিয়মের মধ্যে সংক্ষেপে শুধু চারিটি নিয়মের উল্লেখ করিলাম। টেরেসা এখন এই আশ্রমের উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাহা ছাড়া বিরোধী লোকদিগের সহিত তাঁহার ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাহারা টেরেসার নামে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করিল। টেরেসার অপরাধ, তিনি দেশের শাসনকর্ত্তাদিগের অনুমতি গ্রহণ করেন নাই, অথচ নূতন রকমের

একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাঁহার এই আশ্রমের ধর্ম্মমতের সঙ্গে দেশপ্রচলিত ধর্ম্মমতেরও অনেকটা অনৈক্য আছে। অনেক গোলমালের পর সন্ন্যাসিনী টেরেসাই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিলেন। অবশেষে যাহা হইবার নয়, তাহাও হইল ; টেরেসা বিস্তর পরিশ্রম ও চেষ্টা করিয়া পোপের আদেশ-লিপি প্রাপ্ত হইলেন ; তাঁহাদের ধর্ম্মের যিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষ, তিনিই আশ্রম স্থাপন করিতে অনুমতি দিলেন। এখন আশ্রম-বিরোধী লোকেরা মনে মনে জ্বলিতে লাগিল ; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে টেরেসার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার ও করিবার পথ একবারেই বন্ধ হইয়া গেল। স্বয়ং রোমের পোপ যে কাজ সমর্থন করিতেছেন, কে সাহস করিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবে ?

তবুও দেশের মধ্যে দুইটি দল হইল। একদল পুরাতন রীতিনীতির পক্ষপাতী হইয়া টেরেসাকে জব্দ করিবার জন্য নানা রকম ফিকির-ফন্দি ও তাঁহার আশ্রমের কুৎসা রটনা করিত। আবার অন্য দলের অনেক শিক্ষিত লোক টেরেসার সহায় হইয়া, তাঁহার সদনুষ্ঠানের জন্য প্রচুর অর্থ সাহায্য করিতেন।

তপস্বিনী টেরেসার কর্ম্মক্ষেত্র ক্রমশঃই প্রসারিত হইতে লাগিল। তিনি নানা স্থানে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশের ধর্ম্মকে উন্নত করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যোগ ও চেষ্টায় একটি কলেজও স্থাপিত হইল। কিছুদিন পরেই নারীশক্তির সম্মুখে শত শত লোক মস্তক অবনত করিল। সাহসী যোদ্ধা যেমন সম্মুখের বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করিয়া সবেগে লক্ষ্যস্থানে উপনীত হয় ; তেমনি তেজস্বিনী নারী বিরোধী-লোকদিগের আস্ফালনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, দ্রুতগতিতে আপনার আদর্শের দিকে অগ্রসর হইলেন। অবশেষে মহীয়সী নারী আপনার মুক্তসম্ ধর্ম্মজীবন, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও দুর্জ্জয় মানসিক শক্তির দ্বারা

স্পেনদেশে যেন ভেল্কীবাজি খেলিতে লাগিলেন। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক শক্তির প্রভাবে পড়িয়া ধনীলোকেরা আশ্রমের জন্য অজস্র অর্থ দান করিতেন, জ্ঞানীরা তাঁহার কাজের সহায় হইতেন; ধার্ম্মিকেরা তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে প্রবেশ করিতেন। সন্ন্যাসিনী একাই একশত লোকের শক্তিলাভ করিয়া প্রবল উৎসাহের সহিত মহৎকার্য্য সকল সম্পন্ন করিতেন। তাঁহার জীবনচরিত রচয়িত্রী ঐ সকল কাজের উল্লেখ করিয়া অল্প কয়েকটি কথায় কর্ম্মিষ্ঠা রমণীর জীবনের বেশ সুন্দর একখানি ছবি আঁকিয়াছেন। লেখিকার কয়েকটি কথার মর্ম্মানুবাদ এই :—

"“টেরেসা বীররমণী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ভিন্ন ভিন্ন গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি যখন ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন, তখন তাঁহার অন্তরে ভূমানন্দ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িত; যখন সংসারের কোন কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন, তখন সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অসাধারণ শক্তির দ্বারা সেই কাজটিকে এরূপ সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতেন যে, ভবিষ্যতে প্রবঞ্চিত হইবার কোনই আশঙ্কা থাকিত না। টেরেসার সম্বন্ধে ইহা বলিতে পারা যায় যে, ধ্যানের সময় তাঁহার অন্তরে যে চিন্তা ও ভাব তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, তাহা লইয়াই তিনি মানবের সেবাতে প্রবৃত্ত হইতেন ও মহৎকার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন। সেই জন্যই তিনি তাঁহার সকল কাজ উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন করিতে পারিয়াছিলেন।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

জীবনের প্রভাব

যিনি তপস্যার দ্বারা প্রচুর আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয় করেন ও সেই শক্তির দ্বারা সহস্র লোকের কল্যাণসাধন করিতে পারেন, মানুষ তাঁহার নিকট মস্তক নত করিবেই—তা আজই করুক আর পঁচিশ বৎসর পরেই করুক। স্পেনদেশের কত লোকই ত তপস্বিনী টেরেসার কাজের বিরোধী হইয়াছিলেন; কিন্তু মানুষের মনের কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এখন কত পুরুষ ও স্ত্রীলোক তাঁহাকে দেবী মনে করিয়া, তাঁহার চরণতলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতেছেন। কত ধনী ও জ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া উপকৃত হন; তাঁহার কোন সদনুষ্ঠানের জন্য অর্থ সাহায্য করিতে পারিলে, পুণ্য সঞ্চয় হইল বলিয়া তাঁহারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। টেরেসা এখন স্পেনদেশের নানা জায়গায় আশ্রম স্থাপন করিয়া নানাপ্রকারে মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অথচ তাঁহার টাকার কোনই অভাব নাই। তিনি একটা খুব ভাল কাজ করিবেন; এইরূপ সংকল্প করিলেই, ধনীলোকেরা যেন বাতাসের মুখে তাহার খবর পান; এবং যাদুকরের মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াই যেন তাঁহাকে অর্থ যোগাইতে থাকেন।

সন্ন্যাসিনী টেরেসার সৎকাজের জন্য কত বড় বড় লোকই ত তাঁহাকে অর্থ যোগাইতেন, কিন্তু তিনি কাহারো মন যোগাইবার জন্য একদিনের জন্যও আপনার আদর্শকে খর্ব্ব করেন নাই—আপনার কাছে আপনি ছোট হন নাই। এই মহিমান্বিতা নারী আপনার চরিত্র-মাহাত্ম্যে আপনার জন্য এমন এক উচ্চ আসন রচনা করিয়াছিলেন যে,

স্বয়ং স্পেনের সম্রাটও সে আসন হইতে তাঁহাকে নীচে নামাইতে পারেন নাই। সম্রাট কোন অন্যায় কাজ করিলে, এই তেজস্বিনী নারী নির্ভীক-চিত্তে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। এই সাহসের জন্যই সম্রাট তাঁহাকে ভয়ও করিতেন, ভক্তিও করিতেন।

টেরেসা যখন বর্ষীয়সী রমণী, তখন দেশের লোক তাঁহাকে যেন ধর্ম্ম রাজ্যের রাণী মনে করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তিনি আশ্রম হইতে বাহির হইয়াছেন, প্রকাশ্য রাজপথ দিয়া কোথাও যাইতেছেন; এই কথা সহরে রাষ্ট্র হইলেই রাস্তার দুধারে লোকের অত্যন্ত ভিড় হইত। ধনী, দরিদ্র, বালক, বৃদ্ধ সকলেই তাঁহাকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার জন্য পথে দণ্ডায়মান হইতেন। বিস্তর লোক তপস্বিনীর গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিয়া যাইতেন। তাঁহার শক্তির উপরে লোকের আশ্চর্য্য বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। ভিলানিউবা সহরে অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই; টেরেসা হঠাৎ সেই স্থানেই উপস্থিত হইলেন। তাহার পরেই প্রচুর বৃষ্টি হইল। সকলেই মনে করিল, পুণ্যশীলা নারী নগরে পদার্পণ করিয়াছেন তাই এতদিন পরে বৃষ্টি দেখা দিয়াছে।

টেরেসার জীবনচরিত রচয়িত্রী লিখিয়াছেন—"সেণ্ট টেরেসা দেশের লোকের নিকট যে রকম ভক্তি ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন, রাজা ফিলিপ অথবা তাঁহার প্রধান সেনাপতি মানুষের কাছে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও সমাদর পাইয়াছেন কি না, সে বিষয়ে আমার খুব সন্দেহ আছে।"

অবশেষে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দ আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এল্‌বার ডিউকপত্নী তপস্বিনী টেরেসাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার তখন সন্তান হইবার সম্ভাবনা; তাই মনে একান্ত অভিলাষ, একবার টেরেসা তাঁহার কাছে আসিয়া প্রার্থনা

করেন। হয় ত ডিউকপত্নীর মনে মনে বিশ্বাস ছিল, পুণ্যশীলা নারী প্রার্থনা এবং তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তিনি সুসন্তান লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু টেরেসার তখন বৃদ্ধাবস্থা, শরীরও খুব খারাপ, দূরে যাইবার মত অবস্থাই নয়; তবুও ডিউকপত্নীর ভক্তির আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন। সেই জায়গায় উপস্থিত হইয়াই তাঁহাকে রুগ্নশয্যায় শয়ন করিতে হইল। তিনি তাঁহার প্রভু পরমেশ্বরের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রশান্তচিত্তে রোগের যন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন।

টেরেসার মৃত্যুর তিন দিন পূর্ব্বে তাঁহার (Confession) স্বীকারোক্তি শুনিবার জন্য একজন ধর্ম্মযাজক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসিনীর প্রতি তাঁহার অতিশয় ভক্তি ও ভালবাসা ছিল। তিনি বরণীয়া নারীকে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িতা দেখিয়া আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"মা, তুমি এখনই কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ? ঈশ্বর তোমাকে আরো কিছুদিন এই পৃথিবীতে রাখুন।"

সন্ন্যাসিনী কহিলেন—"পিতা, আপনার মুখে এ কথা কি শোভা পায়? আমার কাজ শেষ হইয়াছে, আর এই সংসারে থাকিবার কোনই প্রয়োজন নাই; এখন আমি প্রভু পরমেশ্বরের কাছে যাইবার জন্যই প্রস্তুত হইয়াছি।"

তপস্বিনী তাঁহার আশ্রমের সন্ন্যাসিনীদিগকে বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে অনেক কুদৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি, সেজন্য আজ আমাকে মার্জ্জনা কর। তোমরা আমার অন্যায় কার্য্যের অনুসরণ করিও না। আমার অনেক পাপ। আমি কি আশ্রমের নিয়ম প্রতিপালন করিতে

পারিয়াছি? তাহা ত পারি নাই। আমি ঈশ্বরের নাম করিয়া তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা আশ্রমগুলিকে উহার মহৎ আদর্শের অনুরূপ গঠন করিয়া তোল। তোমরা আশ্রমকর্ত্রীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া চল।"

মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিকালে ভক্তিমতী নারী দুর্ব্বল শরীর লইয়াই শয্যার উপরে উঠিয়া বসিলেন। সহসা তাঁহার মুখমণ্ডল দিব্যালোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি প্রেমার্দ্রহৃদয়ে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—

"হে আমার প্রভু, হে আমার স্বামি, এই ত আমার সেই চির-অভিলষিত সময় আসিয়া উপস্থিত; এখনই ত তুমি আমাকে দেখিবে, আমিও তোমায় দেখিব। হে আমার প্রভু, এই ত আমার যাত্রার সময়। তবে তুমি এস, তোমার সঙ্গেই শুভ-যাত্রা করি। তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। হে প্রভু, এই ত আমার অরণ্যবাস ত্যাগ করিবার সময় উপস্থিত; আমার চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা যে তোমার সঙ্গে মিলন, এখন ত সেই মিলনই হইবে।"

রাত্রি প্রভাত হইল। সন্ন্যাসিনী তখন বুকে ক্রুশ ধারণ করিয়া একপাশে শয়ন করিলেন। এই অবস্থায় ১৪ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় নড়িতেছিল। তিনি যেন নয়ন নিমীলিত করিয়া কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন।

অবশেষে ৪ঠা অক্টোবর আসিয়া উপস্থিত হইল। রাত্রি নয়টার সময়ে তপস্বিনীর মূর্ত্তি এক অনুপম জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিকটস্থ লোকেরা অনুভব করিলেন, টেরেসা তখনও ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। এই অবস্থাতেই জ্যোতির্ম্ময়ী নারীর আত্মা দেহ ত্যাগ করিয়া চিরদিনের জন্য ঈশ্বরের অসীম প্রেমের মধ্যে ডুবিয়া গেল।

১৫৮২ সালের ৪ঠা অক্টোবর সন্ন্যাসিনী টেরেসা দেহত্যাগ করিলেন। ১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে রোমের পোপ পরলোকবাসিনী টেরেসাকে স্বর্গসুখভোগের অধিকারিণী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সংবাদ যখন স্পেনদেশে আসিয়া পৌঁছিল, তখন দেশের সর্ব্বশ্রেণীর লোক আনন্দোৎসবে প্রমত্ত হইয়া উঠিলেন। ১৬২২ সালের ১২ই মে রোমের পোপ পুণ্যবতী টেরেসাকে সাধুদের দলভুক্ত করিয়া, তাহাকে সেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিলেন।

এখন আমরা বরণীয়া নারীর জীবনচরিত রচয়িত্রী শ্রীমতী গ্রাহামের কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিয়া রচনাটি সমাপ্ত করিব। তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন—

"টেরেসা যে ধর্ম্মসংস্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেটি যে খুব সহজ কাজ, তাহা কেহই মনে করিবেন না। তিনি একাকিনী প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে ঘোর সংগ্রাম করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নারীজীবনের শ্রেষ্ঠ গৌরব। তিনি স্বীয় জীবনে ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের সমন্বয় করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার জীবন আলোচনা করিয়া * * বুঝিতে পারা যায়, মানুষের মধ্যে কল্পনা বা স্বপ্নের অতীত ধর্ম্মের একটি সত্য আদর্শ আছে।"

জয়পুরের রাণী

ভক্তমালগ্রন্থের লেখক বলিতেছেন :—

"জয়পুরের রাজা মানসিংহের কনিষ্ঠ।
মাধোসিংহ নাম রাজ্যশাসনে বরিষ্ঠ॥
তাঁর পাটরাণী অতি সুন্দরী সুশীলা।
সুবুদ্ধি সুমতি সতী শুন তার লীলা॥"

আমি এই ভক্তমালগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই জয়পুরের ভক্তিমতী রাণীর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত রচনা করিব। কিন্তু এই বহিখানিতে সত্যের সঙ্গে বিস্তর কল্পনা মিশ্রিত আছে। সেই জন্য অনেক অসম্ভব কথা বাদ দিয়া, রাণীর বৈরাগ্যের ও ভক্তির কাহিনীই আমাকে বর্ণনা করিতে হইবে।

জয়পুরের মহারাণী রাজা মাধবসিংহের পত্নী; রাজপরিবারে তাঁহার রূপগুণ উভয়েরই অত্যন্ত প্রশংসা ছিল। বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেই তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রত্নালঙ্কারেই বিভূষিত ছিল; বিস্তর দাসদাসী তাঁহার সেবা করিত, রাজপ্রাসাদে তাঁহার কোন প্রকার সুখেরই অভাব ছিল না। কিন্তু এই ভোগসুখের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও রাণীর অন্তরে যেন ভক্তির উৎস লুক্কায়িত ছিল। একটি আকস্মিক ঘটনায় সেই উৎসের মুখ খুলিয়া গেল, তাঁহার নারীহৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ প্রবাহিত হইল। সেই ঘটনাটি এই :—

একদিন রাণী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, পরিচারিকা তাঁহার পার্শ্বেই বসিয়া আছে; এই সময়ে তিনি তাহাকে পদসেবা করিতে

আদেশ করিলেন। পরিচারিকা রাণীর সুন্দর রাঙা পা-দুখানি টিপিয়া দিতে লাগিল। এইরূপে পদসেবা করিতে করিতে পরিচারিকার ললাটে দিব্যজ্যোতি স্ফুরিত হইল, গণ্ডদ্বয় অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া গেল, অবশেষে তাহার অন্তরের ভক্তির উচ্ছ্বাস বাহিরে অশ্রু, পুলক ও ক্রন্দনের আকারে প্রকাশিত হইল। রাণী মানুষের মুখশ্রীতে আর ত কখনো এরূপ অপার্থিব ভাব দর্শন করেন নাই; তাই তিনি বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পরিচারিকার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

এই পরিচারিকা অভাবে পড়িয়া সামান্য দাসীর কার্য্যই করিতেছে বটে, কিন্তু তাহার নারীজীবন অসামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে; সে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ভক্তিলাভ করিয়াছে, তাহার প্রাণের দেবতা শ্রীহরিকেই হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছে, সে ত তাহার জীবনসর্ব্বস্ব দেবতার প্রেম ভিন্ন আর কিছুই জানে না; ভগবানের দর্শন ভিন্ন আর তাহার পাইবার ও আকাঙ্ক্ষা করিবার কোন বস্তুই নাই। এই ভক্তিমতী নারী হস্তদ্বারা রাণীর পদসেবা করিতেছিল বটে, কিন্তু অন্তরে তাহার আরাধ্য দেবতার নামটিই জপ করিতেছিল; সেই জন্যই চোখেমুখে ভাবের উচ্ছ্বাস হইয়াছে এবং গভীর ভক্তি প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। রাণী উহা নিরীক্ষণ করিয়া আকুলস্বরে কহিলেন,—"পরিচারিকা, তোমার চোখেমুখে কেন এ ভাবের উচ্ছ্বাস? কিসের জন্যই বা পুলকের উদয়? কেনই বা তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছ?"

পরিচারিকা কহিল "রাজরাজেশ্বরি, আমি যে ভগবানকেই আমার নারীজীবন অর্পণ করিয়াছি, তাঁহারই নাম জপ করিতে করিতে হৃদয়ে ভক্তি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে; সেই ভক্তির আনন্দই দুই চক্ষু হইতে অশ্রুরূপে ঝরিয়া পড়িতেছে।"

রাণী পরিচারিকার নিকট তাহার ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম এবং সাধনের কাহিনী জানিতে চাহিলেন। পরিচারিকা ভক্তিবিগলিত মধুরকণ্ঠে তাহার সাধনা ও সাধ্য দেবতার বিষয় বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। উহা শুনিতে শুনিতে রাণীর চিত্ত এক অপূর্ব্ব ভাবরসে ডুবিয়া গেল; তিনি পরিচারিকাকে কহিলেন, "বল, বল, তোমার ভক্তির কাহিনী আমাকে বার বার বল; তোমার অমৃতময়ী বাণী পুনঃ পুনঃ শুনিয়া আমার কঠোর চিত্ত ভক্তিরসে আর্দ্র হইয়া যাউক।"

ভক্তমাল গ্রন্থের বর্ণনা এই :—

"কহে পুনঃ পুনঃ কহ আহা বল বল,
শুনিতে শুনিতে রাণী মগন হইল।
দাসীর প্রশংসা করি কহিতে লাগিল॥
তুমি ত আমার পদসেবা যোগ্য নহ।
দাসী যে তোমাবে বলি অপরাধ সেহ॥
অতএব তুমি মোর পদ ছাড়ি দেহ।
শিয়রে আসিয়া শিরে চরণ ধরহ॥"

বুদ্ধিমতী পরিচারিকা বুঝিতে পারিল, ভোগবিলাসপরায়ণা রাণীর মস্তকে ঈশ্বরের করুণা নামিয়া আসিয়াছে, তাঁহার ভক্তিলাভের শুভমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইয়াছে; তাই সে রাণীর অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত করিবার জন্য কহিল—"ঠাকুরাণি, এতদিন ত রাজান্তঃপুরে বাস করিয়া বিষয়ের সহস্র প্রকারের সুখই উপভোগ করিয়াছেন, এখন একবার ভক্তির সাধনায় প্রবৃত্ত হউন, ভগবানকে প্রেমের দেবতারূপে বরণ করুন, মধুর ভক্তিরসে আপনার মনপ্রাণ মধুময় হইয়া যাউক। যদি ভগবানের কৃপায় ভক্তিরসেই আপনার মনপ্রাণ মধুময় হইয়া যায়, তবে

অন্তরে যে অপার আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, তাহার সঙ্গে কি তুচ্ছ বিষয় সুখের তুলনা হয়?"

রাণী কহিলেন, "তোমার ভক্তিপূর্ণ অপূর্ব্ব বাণী শুনিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছি, ভগবানকে হৃদয় সমর্পণ করিলে এবং ভক্তিলাভ করিতে পারিলে, এই নারীজন্ম সার্থক হইবে; আনন্দে ও পুলকে আমার চিত্ত ভরিয়া উঠিবে। তাই তোমাকেই গুরুরূপে বরণ করিতেছি; তুমি ভক্তির রহস্যকথা আমার নিকট প্রকাশ কর; আমি দুর্লভ ভক্তি ও প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হই।"

পরিচারিকার সংসর্গে রাণীর চিত্ত যথার্থই ভক্তির জন্য ব্যাকুল হইল; তিনি ধরণীর ধূলায় লুটাইয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। রাণী প্রতিদিন পুষ্পমালা রচনা করিতেন; উহা তাঁহার উপাস্য দেবতার গলায় পরাইয়া দিতেন; তাহার পরে দিবারাত্রি ভগবানের নামগান ও তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়াই কাটাইতেন। তিনি একটি রাজ্যের রাণী হইয়াও বিষয় সুখের কামনা ত্যাগ করিলেন, আপনার উপাস্য দেবতার যে প্রেমের অনুভূতি,—তাহাতেই আনন্দ লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন।

অবশেষে রাণীর স্বর্ণখচিত বসন ও রত্নাদি ভূষণ—সমস্তই কোথায় পড়িয়া রহিল; তিনি ভক্তিকেই হৃদয়ের অমূল্য ভূষণ করিয়া তুলিলেন। দিনের পরে দিন শ্রীহরির প্রেম তাঁহাকে যেন পাগলিনী করিয়া তুলিল। এই প্রেমে রাজান্তঃপুরের এতদিনের অবরোধপ্রথাও যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। রাণী স্বাধীন ভাবে বৈষ্ণব সাধুদিগের সঙ্গে মিশিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা, নামগান এবং ভক্তদিগের সেবায় সময় কাটাইতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বয়ং রাজা মাধব সিংহ রাজকার্য্য উপলক্ষে কাবুল গমন

করিয়াছিলেন। দেওয়ানের হস্তেই রাজ্যের সমস্ত ভার অর্পিত হইয়াছিল। রাজা রাজপুরীতে উপস্থিত থাকিলে বুঝি বা অন্তঃপুরে এমন একটা ব্যাপার সহজে ঘটিয়া উঠিতে পারিত না। দেওয়ান রাণীর কার্য্যে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনি রাজ্যের মহারাণী হইয়াও অনেক অন্যায় কার্য্য করিতেছেন। আপনি অন্তঃপুরের পর্দ্দা তুলিয়া দিলেন কেন? কতকগুলি বৈষ্ণবের সঙ্গেই বা মিশিতেছেন কেন?"

রাণী দেওয়ানকে বলিয়া পাঠাইলেন—"তুমি কাহাকে মহারাণী বলিতেছ? এখন কি আর আমি মহারাণী আছি? আমি যে এখন ভগবানের দাসী; তাঁহার দাসী বলিয়াই আমার নাম লিখাইয়াছি। আমার জাতি কোথায়? আমার লজ্জা মানই বা কোথায়? আমি যে শ্রীহরির দর্শন পাইবার জন্য ধন-জন-প্রাণ সকলই তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়াছি। আমি আমার প্রেমের দেবতার জন্য জাতি পাঁতি চতুর্ব্বর্গ ফল সকলই ত্যাগ করিয়াছি। আমি বাসনাকামনার হস্ত হইতেও মুক্তিলাভ করিয়াছি। এখন আমি কাহাকেই বা ভয় করিব?"

"রাণী বলে রাণী নাম না কহিও মোরে।
দাসী নাম লিখে দিনু যুগল-কিশোরে॥

* * * *

সরম ধরম মান ধন জন প্রাণ।
শ্রীহরির প্রেমে আমি সব ত্যজিলাম॥" *

দেওয়ান নিরুপায় হইয়া রাণীর পরিবর্ত্তনের কাহিনী রাজাকে লিখিয়া পাঠাইলেন। পত্র পাঠ করিয়া রাজার মন ক্রোধে উদ্দীপ্ত

* এই নীচের ছত্রটির ভাব বজায় রাখিয়া কয়েকটি শব্দের একটু পরিবর্ত্তন করিলাম।

হইয়া উঠিল। তিনি রাণীকে হত্যা করিবার জন্য আপনার রাজ-প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎপরে তাঁহার আদেশে, রাণীকে বধ করিবার জন্য রাজবাড়ীর পোষা বাঘের মুখে ফেলিয়া দেওয়া হইল। কিন্তু বাঘ রাণীকে স্পর্শও করিল না। এই ঘটনায় রাজার যেন দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, রাণী এখন আর আগের সেই রাণী নাই, তাঁহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তিনি ভক্তির সাধনায় অনুপম অধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। ইহার পরে আরো কয়েকটি ঘটনায় রাজা রাণীর বিচিত্র ধর্ম্মজীবনের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন এবং ভাবিতে লাগিলেন, রাণী ত এখন আর মানবী নহেন, তিনি যে দেবী। তাই রাজা আপনার পত্নীর পায়ের কাছেই মস্তক নত করিয়া অপরাধের জন্য মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। এ বিষয়ে ভক্তমাল রচয়িতা লিখিয়াছেন—

"এই অপরাধে মোর না জানি কি হয়।
বিচারিলা অপরাধ-ভঞ্জন-উপায়॥
পাত্র মিত্র সভাসদ সমভিব্যাহারে।
রাণীর নিকটে গেলা বিনীত অন্তরে॥
নিকটে যাইয়া রাজা অষ্টাঙ্গে পড়িল।
নিজ-স্ত্রী বলি অভিমান নাহি কৈল॥"

পতিব্রতা রাণী রাজার অপরাধের কথা মনেও করিলেন না; তিনি নম্রবচনে স্বামীকে কহিলেন—"আমি সম্পূর্ণরূপে তোমারই অধীন, তুমি কখনই তোমার দয়া হইতে আমাকে বঞ্চিত করিও না। আমার একান্ত অনুরোধ, তুমিও ভগবানের শরণাপন্ন হও এবং ভক্তির সহিত তাঁহারই নাম কীর্ত্তন কর, তাহা হইলেই তোমার যথার্থ কল্যাণ হইবে।"



রাণী লুইসা

রাজা কহিলেন—"তুমি কোন মানুষেরই অধীন নও, যাঁহার অধীন এই জগৎসংসার, তুমি শুধু তাঁহারই অধীন। এখন আমি তোমাকে এই অনুরোধ করি, তুমি সকল কার্য্যে আমার সহায় হও, আমি তোমার সাহায্যেই রাজ্যশাসন ও রাজকার্য্য সম্পন্ন করি।"

রাণী লুইসা

(১)

প্রুসিয়ার মনস্বিনী রাণী লুইসা যদিও ঠিক তপস্বিনী নহেন, তবুও তাঁহার দয়া ধর্ম্মের ও মহৎ কর্ম্মের কথা স্মরণ করিলে অন্তরে শ্রদ্ধার উদয় হয়; স্বয়ং বিধাতা লুইসার মুখশ্রীতে আপন মাধুরী ঢালিয়া দিয়া যেমন তাঁহার নারীমূর্ত্তি অনুপম সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার মহৎ হৃদয়ের তলদেশে করুণার প্রস্রবণ লুক্কায়িত রাখিয়া, দয়াধর্ম্মে তাঁহাকে দেবী করিয়াছিলেন। সেই জন্যই আমি এই দয়াবতী রাণীর অতি ক্ষুদ্র একটি জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

রাণী লুইসা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মানীর একটি সম্ভ্রান্ত ও ধার্ম্মিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার মাতা অতিশয় বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা নারী ছিলেন। তিনি, কন্যার শারীরিক সৌন্দর্য্যের সঙ্গে হৃদয়ের মাধুর্য্য, নম্রতা, এবং স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার শৈশবকালেই সুশিক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করিতে

লাগিলেন। কিন্তু লুইসা যখন ছয় বৎসরের বালিকা, তখন তাঁহার এই স্নেহময়ী ও পুণ্যশীলা জননীর মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় লুইসার কোমল হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিল। পাছে বা মাতৃহীনা বালিকার সুশিক্ষার ব্যাঘাত হয়, অথবা যত্ন আদরের কোন রকম ত্রুটি হয়, সেই জন্য তাঁহার পিতামহী পৌত্রীর শিক্ষা ও প্রতিপালনের সমস্ত ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। এই সম্ভ্রান্ত গৃহের মহিলার ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস এবং ধর্ম্মের প্রতি অন্তরের গভীর অনুরাগ ছিল। তিনি জানিতেন, নারীর মনোবৃত্তি সকলের বিকাশ ও জীবনের উন্নতির জন্য অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত এবং স্নেহ ও দয়ার বিকাশ করা যেরূপ প্রয়োজন, এমন আর কিছুই নহে। তাই তাঁহার যত্ন, আদর ও উৎকৃষ্ট শিক্ষার গুণে লুইসার অল্প বয়সেই আত্মার ধর্ম্মভাব যেন প্রস্ফুটিত ফুলের মত ফুটিয়া উঠিল, মনের মধ্যে স্নেহ ও দয়ার আশ্চর্য্য বিকাশ হইল। মানুষের দুঃখ দেখিলে বালিকার মন করুণায় আর্দ্র হইত, দুঃখীর চোখের জল মুছাইবার জন্য তাঁহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত; তিনি অনেক সময় রোগযন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বালকবালিকাদিগের পার্শ্বে বসিয়া সুমধুর স্নেহ ও সেবার দ্বারা তাহাদের ক্লেশ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। এ বিষয়ে লুইসার বাল্যজীবনের দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

এক সময়ে বালিকা লুইসার একটি মূল্যবান দ্রব্য কিনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অত টাকা কোথায় যে, তিনি সেই জিনিসটি ক্রয় করিবেন? তাই বালিকা প্রতিদিন কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া অনেকগুলি টাকা জমা করিলেন। তাহার পরে যখন মূল্যবান সামগ্রীটি ক্রয় করিবেন, তখনই এক ভিখারিণী বিধবা নারী তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। বিধবা

ধীরে ধীরে আপনার দুঃখের মর্ম্মান্তিক কাহিনী লুইসার নিকট বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইল; উহা শুনিতে শুনিতে কোমলহৃদয়া বালিকার প্রাণ ব্যথায় ভরিয়া উঠিল, চোখের জলে তাঁহার নয়নপল্লব সিক্ত হইল, তিনি অন্তরের উচ্ছ্বসিত করুণার আবেগে তাঁহার এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ ঐ দুঃখিনী ভিখারিণীর হস্তেই অর্পণ করিলেন। ভিখারিণী আশার অতীত অর্থ লাভ করিয়া লুইসার কল্যাণ কামনা করিতে করিতে আপনার গৃহে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় ঘটনাটিও বড় সুন্দর। একদিন লুইসার পিতামহী ও শিক্ষয়িত্রী তন্ন তন্ন করিয়া বাড়ীর ঘরগুলি খুঁজিয়া দেখিলেন, কিন্তু কোথায় লুইসা? কোন জায়গায়ই যে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পরে দেখা গেল, লুইসা পাড়ার একটি পিতৃমাতৃহীনা পীড়িতা বালিকার শয্যার পাশে বসিয়া আছেন। মেয়েটির কঠিন রোগ, রোগের বড় যন্ত্রণা; লুইসা সেই যন্ত্রণা নিবারণের জন্য মেয়েটিকে ধর্ম্মগ্রন্থের চিত্তাকর্ষক অংশগুলি পড়িয়া শুনাইতেছেন। এই সময়ে লুইসার বয়স সবেমাত্র ত্রয়োদশ বৎসর।

এই বালিকার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মধুর লাবণ্যে ভরিয়া উঠিল, অনুপম মুখশ্রীতে একটি স্বর্গের সুষমা বিকশিত হইল; এই শরীরের সৌন্দর্য্যের চেয়েও হৃদয়ের মাধুর্য্য, অন্তরের কোমলতা, আত্মার বিশ্বাস ও পবিত্রতা এবং নারীপ্রকৃতির সদ্গুণ সকল লুইসার জীবনকে গৌরবে মণ্ডিত করিয়া তুলিল। এই সময়ে সর্ব্বত্র লোকের মুখে শুধু লুইসার প্রশংসার কথাই শুনা যাইত। এমন কি, প্রুসিয়ার রাজ-পরিবারেও লুইসার রূপগুণের কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। স্বয়ং রাজ-কুমার লুইসার সৌন্দর্য্যে, সদ্গুণে, সরলতায় ও দয়াধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তাঁহার অন্তরে পবিত্র প্রেমের সঞ্চার হইল। তিনি

মনের ভিতরে আর পরিণয়ের ইচ্ছা গোপন করিয়া রাখিতে পারিলেন না। এইরূপ বিবাহে লুইসার আপত্তির কোন যে কারণ ছিল, তাহাও নয়। তাই ১৭৯৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রুসিয়ার রাজকুমারের সঙ্গে লুইসার শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। লুইসা যে দিন পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া রাজভবনে স্বামীর প্রাসাদে যাত্রা করিলেন, সে দিন পিত্রালয়ের বিস্তর পুরুষ ও নারী তাঁহার দয়াধর্ম্ম এবং মধুর ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া শুধুই অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

আশ্চর্য্যভাবে লুইসার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল, তিনি রাজরাণী হইলেন; রত্নমুকুট তাঁহার মস্তকের ভূষণ ও স্বর্ণ-সিংহাসন তাঁহার বসিবার আসন হইল; বিস্তর দাসদাসী তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিল, রাজপরিবারের সম্মান ও স্বামীর অপার্থিব প্রেম তাহাকে মহীয়সী করিয়া তুলিল, তবুও তাঁহার মনে একটুকু অহঙ্কারের উদয় হইল না, রাজপুরীর ভোগবিলাসের বাসনা মোটেই তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইল না; তিনি স্বাভাবিক ধর্ম্মবিশ্বাসে অন্তর সবল করিয়া এবং ঈশ্বরকে জীবনে বরণ করিয়া লইয়া শুদ্ধসংযতমনে ধর্ম্মানুষ্ঠান, দরিদ্রকে দান ও রাণীর সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন।

রাণী লুইসা বিবাহের সময়ে রত্ন-মণি-হীরা-হার প্রভৃতি বিস্তর মূল্যবান দ্রব্য উপহার পাইয়াছিলেন। প্রায় সকল রমণীই এই সকল বহুমূল্য উপহারের সামগ্রী জীবনের বিশেষ দিনের স্মৃতি রক্ষার জন্য যত্নের সহিত রাখিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু লুইসার ঐ সমস্ত জিনিষে আসক্তি এতই অল্প ছিল এবং দুঃখীর দুঃখ দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহার করুণা এরূপভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তিনি বিবাহের মূল্যবান সামগ্রী অম্লানবদনে দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছিলেন।

লুইসার পবিত্র প্রেমে এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে ও সেবায় তাঁহার

স্বামীর মন এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিল ও হৃদয় এরূপ তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল যে, তিনি রাণীকে নিত্য নূতন নূতন সুখে সুখী করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন। এজন্য তাঁহার মাথায় এক খেয়াল চাপিল। তিনি মনে করিলেন, রাণীকে লইয়া খুব সমারোহের সহিত রাজপথে বাহির হইবেন। সে দিন এমন মিছিল বাহির হইবে যে, দেখিয়া লোকের তাক্ লাগিয়া যাইবে। নিশ্চয়ই তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা তুড়ি মারিয়া উড়াইয়া দিতে হইত। কিন্তু বুদ্ধিমতী, সংযতচিত্ত ও দয়াবতী লুইসা স্বামীকে কহিলেন—"এরূপ আড়ম্বর করিয়া রাজপথে বাহির হইবার প্রয়োজন কি? ইহাতে রাশি রাশি অর্থ জলের মত খরচ হইয়া যাইবে। তুমি যদি আমার সন্তোষের জন্যই এই অনুষ্ঠানের সংকল্প করিয়া থাক, তাহা হইলে মিছিল বাহির না করিয়া, উহাতে যে অর্থ ব্যয় হইত, তাহা আমার হস্তে অর্পণ কর; সেই অর্থের দ্বারা দরিদ্রের দুঃখ দূর করিতে পারিলেই আমার প্রাণে আনন্দ ও পুলক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে।"

টাকাওয়ালা ধনীর ও রাজার ঘরের সকলেই স্ত্রীর জন্মদিনে, তাঁহাকে অত্যন্ত আনন্দের সহিত রত্নালঙ্কার অথবা অন্য কোন অধিক মূল্যের বস্তু উপহার দিয়া থাকেন। লুইসার স্বামীও আপনার গুণবতী ও সাধ্বীসতী পত্নীর জন্মদিনের উৎসবে, তাঁহার জন্য একটি সুচারু-কারু-কার্য্য-খচিত মনোরম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাহা ছাড়া তিনি পত্নীর মনের মত কোন একটি উৎকৃষ্ট জিনিস উপহার দিবার জন্য কহিলেন—"বল ত লুইসা, তোমার জন্মদিনে আমি কোন্ জিনিস তোমাকে উপহার দিব? কি পাইলে তোমার হাসিমাখা মুখখানি পুলকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে?"

স্বামীর এই প্রীতিপূর্ণ সুধামাখা বাক্যে পতিব্রতা নারীর হৃদয় প্রেমে আপ্লুত হইল। তিনি তাঁহার মুখখানি মধুর হাস্যে রঞ্জিত করিয়া কহিলেন—"রাজকুমার, গরীব দুঃখীকে দান করিবার জন্য আমার হস্তে যদি প্রচুর অর্থ অর্পণ কর, তাহা হইলে উহাই তোমার শ্রেষ্ঠ উপহার বলিয়া আমি গ্রহণ করিব।"

তৎক্ষণাৎ রাজা কহিলেন—"লুইসা, তুমি কত টাকা চাও?"

লুইসা বলিলেন—"একজন দয়ালু রাজার হৃদয়খানি যত বড়, আমি সেই পরিমাণ টাকা চাই।"

রাজা অত্যন্ত খুসী হইয়া রাজকোষ হইতে রাণীকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। রাণী মনের আনন্দে দীনদুঃখীকে সেই অর্থ বিতরণ করিয়া অন্তরে অনুপম তৃপ্তিলাভ করিলেন।

---

(২)

রাজা এবং রাণী লুইসা কিছুদিন রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীভবনে বাস করিয়াছিলেন। ঐ পল্লীভবন যে গ্রামে শোভা পাইত, সেই গ্রামটি বড়ই সুন্দর ছিল। ঐ গ্রামের হরিতপত্রাবৃত শত শত বৃক্ষ, পুষ্প এবং পল্লব শোভিত লতা, কুসুমোদ্যান এবং স্বচ্ছ বারিপূর্ণ স্রোতস্বিনী, রাজা ও রাণীর অন্তরে আনন্দের তরঙ্গ তুলিত। তাঁহারা কত সময় মাঠে হরিত বর্ণ শস্য ও বৃক্ষশাখায় নানা রকম পাখীর নৃত্য এবং আরো নানা প্রকার গ্রাম্যদৃশ্য দেখিয়া সৌন্দর্য্যরসে মগ্ন হইয়া যাইতেন। শুধু একখানি গ্রামের

নয়, পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের অসংখ্য পুরুষ ও মহিলা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া রাজা ও রাণীকে দর্শন করিতে আসিত; তাঁহারা আপনাদের রাজগৌরবের কথা বিস্মৃত হইয়া আত্মীয়ের মত ঐ সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিশিতেন, আলাপ করিতেন, তাহাদের অবস্থা ও রীতিনীতি অবগত হইতেন; সকলেই রাজা ও রাণীর সুমিষ্ট ব্যবহারে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিত। রাণী লুইসা আপনার মহৎ হৃদয় মাতৃভাবে পূর্ণ করিয়া গ্রামের ছেলেমেয়েদের কাছে ডাকিতেন, স্নেহ প্রকাশ করিতেন; সেই গ্রাম্য-বালক-বালিকাদিগের সরল চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠিত।

১৭৯৭ সালে জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিন সহরে বৃহৎ একটি মেলা হইয়াছিল। রাজ্যের নানা জায়গা হইতে নানা শ্রেণীর লোক মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। রাণী লুইসা এবং তাঁহার স্বামী সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সেই মেলায় উপস্থিত হইতেন এবং আপনাদের অসামান্য মানমর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হইয়া বহু লোকের সঙ্গে মিশিতেন। একদিন একটি স্ত্রীলোক এক দোকানে প্রবেশ করিয়া জিনিস কিনিতেছিলেন; সেই সময়ে রাজা ও রাণী সেই দোকানেই উপস্থিত হইলেন। স্ত্রীলোকটি রাজা ও রাণীকে দোকানে আসিতে দেখিয়াই নত মস্তকে দোকানের বাহিরে যাইতেছিলেন; রাণী লুইসা স্ত্রীলোকটির কাছে গিয়া কহিলেন—"আপনার জিনিসটি ত কেনা হয় নাই, আপনি আমাদের দেখিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছেন কেন? এম্‌নি করিয়া সকলেই যদি আমাদের দেখিয়া দোকানের বাহিরে গিয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে দোকানদারের ত বিস্তর ক্ষতি হইবে।"

রাণী লুইসা মহিলাটিকে শুধুই কয়েকটি মুখের কথা বলিয়া নিবৃত্ত

হইতে পারিলেন না, তিনি আলাপ করিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার বাড়ীতে ছোট একটি ছেলে আছে। তাই রাণী দোকান হইতে কয়েকখানি সুন্দর খেল্‌না কিনিয়া মহিলাটির হস্তে অর্পণ করিলেন এবং কহিলেন, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আপনার ছেলের কাছে বলিবেন, আমি ভালবাসিয়া তাহাকে এই সামান্য খেল্‌নাগুলি উপহার দিয়াছি।"

রাণী লুইসা প্রত্যহ রাজপথে ভ্রমণ করিতে বাহির হইতেন, ঐ সময়ে পথের ছোট ছোট ছেলেদের কোলে লইয়া আদর করিতেন, জিনিসপত্র উপহার দিতেন, তাহাদের সঙ্গের মহিলাদিগের সহিত আলাপ করিতেন।

রাজা যখন সৈন্যসামন্ত লইয়া খুব আড়ম্বরের সহিত রাজপথে বাহির হইতেন, তখন রাস্তার দুই ধারের শত শত পুরুষ ও নারী রাণীকে দেখিবার জন্য ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। রাণী গাড়ী হইতে নামিয়া মধুর হাসিতে মুখখানি মধুর করিয়া রাস্তার লোকের কাছে যাইতেন, তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেন; যাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহাদিগকে অর্থ দান করিতেন। শুধু তাহা নহে; রাণী সময় সময় দরিদ্র কৃষক-দিগের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের সামান্য খাদ্যসামগ্রীই তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। প্রজাগণ এই দৃশ্য দর্শন করিয়া আনন্দে অশ্রু বর্ষণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। রাণীর আশ্চর্য্য ব্যবহার ও দয়াধর্ম্মের জন্য রাজ্যের অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। রাণী একবার পিতামহীর নিকট একখানি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন—

"ঠাকুর মা, রাণী হওয়ার পরে আমি যে বিস্তর দীনদুঃখীর সহিত মিশিয়া তাহাদের দুঃখ দূর ও অভাব মোচন করিতে পারিতেছি,

আমার স্নেহে ও অর্থ সাহায্যে শত শত লোকের যে দারিদ্র্য দূর হইতেছে, দুঃখ চলিয়া যাইতেছে, ইহাই আমার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ।”

রাণী লুইসা প্রতিদিন উৎকৃষ্ট গ্রন্থসকল পাঠ করিতেন। সাহিত্য তাঁহার অতি প্রিয় সামগ্রী ছিল। তিনি অনেকগুলি চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ এবং সুমিষ্ট সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। রাণী যখন সু-স্বরে স্ব-রচিত সঙ্গীত গাহিতেন, তখন অনেকেরই মন মোহিত হইত।

রাণীর হৃদয়ের মহত্ত্ব এবং মাতৃভাবের মূলেই ছিল অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব, ঈশ্বরে অটল বিশ্বাস, তাঁহার করুণার উপরে একান্ত নির্ভর, তাঁহার সেবিকা কন্যা হইবার জন্য মনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা। তিনি যথার্থই ঈশ্বরের প্রিয় কন্যা ছিলেন, সকলের চেয়ে ঈশ্বরকেই অধিক ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেন। ঈশ্বরের প্রেমমধুর মূর্ত্তিখানি তাঁহার নারীহৃদয় অধিকার করিয়াছিল, তাই তাঁহার নির্ম্মলচিত্তে পাপের স্পর্শও লাগে নাই, তাঁহার সরল মন ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যেও ম্লান হইতে পারে নাই; তিনি রাণী হইয়াছেন, সিংহাসনে বসিয়াছেন, রাজ্যরক্ষার জন্য সন্তান-দিগের অন্তরে বীরত্বের গর্ব্ব জাগ্রত করিয়াছেন; অথচ দরিদ্রের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের চোখের জলের সঙ্গে চোখের জল বিনিময় করিতে একদিনের জন্যও কুণ্ঠিত হন নাই; প্রাণে ঈশ্বরের প্রেম ছিল বলিয়াই তিনি সমস্ত জীবন করুণার প্লাবনে দীনদুঃখীর অন্তর প্লাবিত করিয়াছেন।

রাণী লুইসার শেষ জীবনে, রাজ্যের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ, পরাজয় ও লোক-ক্ষয়ের জন্য তাঁহাকে অতিশয় মনোবেদনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। প্রুশিয়া, ফ্রান্সের দিগ্বিজয়ী সেনাপতি নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হইল। ঐ সময়ে রাণীর বড় ছেলে উইলিয়মের সবেমাত্র এগার বৎসর বয়স হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং সেই ছেলের হস্তে একখানি তরবারি অর্পণ

করিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রিয়পুত্র, রণক্ষেত্রে গমন কর, শত্রুর হস্ত হইতে স্বদেশ রক্ষা করিয়া পিতৃপুরুষদের সুযশ অক্ষুণ্ণ রাখ।"

রাজকুমার জননীর এই বাক্যে উৎসাহিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কাহার সাধ্য মহাবীর নেপোলিয়নকে যুদ্ধে পরাস্ত করে? দ্বিতীয় যুদ্ধে জার্ম্মানীই হারিয়া গেল, হাজার হাজার মানুষের রক্তের নদী প্রবাহিত হইল; রাণী লুইসা সজলনয়নে শুধু ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মনের কষ্টে রাণীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িল, কঠিন রোগ তাঁহাকে আক্রমণ করিল; অবশেষে সংসার হইতে তাঁহার বিদায়ের দিন নিকট হইয়া আসিল। রাণী অতি প্রাণস্পর্শী ভাষায় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার করুণাময় পিতা, আমি আমার সন্তানদিগকে তোমারই মঙ্গলহস্তে অর্পণ করিতেছি; তুমি ইহাদের সহায় হও।" রোগযন্ত্রণার মধ্যেও রাণী প্রার্থনা করিতেছিলেন—"হে ঈশ্বর, তুমি আমার যন্ত্রণা দূর কর, আমাকে শান্তি দান কর।"

ঈশ্বর যেন যথার্থই তাঁহার প্রিয় কন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; প্রার্থনার পরেই রাণীর যন্ত্রণার লাঘব হইল, মুখখানি এক অপার্থিব জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে রাণী তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর হাতের মধ্যে নিজের হাতদুখানি রাখিয়া বলিলেন—

"স্বামি, এখন বিদায়—বিদায়! ঐ শুন, স্বর্গের পিতা আমাকে ডাকিতেছেন। তবে আমি যাই—বিদায়! বিদায়!"

ধর্ম্মশীলা ও দয়াবতী নারীর আত্মা পরলোকে ঈশ্বরের নিকটে প্রস্থান করিল। অগণ্য অসংখ্য লোক রাণীর দয়াধর্ম্মের কথা স্মরণ করিয়া, তাঁহার আত্মার উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল।

রাণী শরৎসুন্দরী

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিণয়

পুঁটিয়ার রাণী শরৎসুন্দরী দেবীর জীবনের পবিত্র কাহিনী ও দয়ার কথা আমরা কোন দিনই বিস্মৃত হইতে পারিব না। তাঁহাকে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের কাহিনী স্মরণ করিলেও হৃদয় নির্ম্মল হয়। সেই জন্য এই ধর্ম্মপরায়ণা নারীর একটি ক্ষুদ্র জীবনচরিত রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

শরৎসুন্দরী ১২৫৬ সালের ২৩শে আশ্বিন পুঁটিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামটি রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। শরৎসুন্দরীর পিতার নাম ভৈরবনাথ সান্যাল। তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি ছিল। দেবার্চ্চনায় ও অতিথি সেবায় সান্যাল মহাশয়ের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। শরৎসুন্দরীর মাতা ধর্ম্মপরায়ণা ও সাধ্বী মহিলা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ের মাধুর্য্য, কোমলতা ও ধর্ম্মভাব কন্যার অন্তরে বিকশিত হইয়াছিল। কন্যা মাতৃদেবীর ছবিখানি মনের মধ্যে আঁকিয়া রাখিয়াছিলেন এবং সেই ছবির পানে চাহিয়াই নারী জীবনের পবিত্র আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতেন।

শরৎসুন্দরী যখন বালিকা, তখনই তাঁহার ধর্ম্মভাবের আভাস পাওয়া গেল। তিনি শৈশবকালে আর সকল খেলার চেয়ে ঠাকুরপূজার খেলা খেলিয়াই অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিতেন। সেজন্য তিনি মৃত্তিকা

লইয়া ঠাকুর গড়িতেন, উদ্যানের পুষ্প চয়ন করিয়া সেই ঠাকুরকে সাজাইতেন। তাঁহার ঠাকুরপূজারবিষয়ে একটি বড় মজার গল্প আছে। গল্পটির উল্লেখ করিতেছি। একদিন তাঁহার পিতা ঠাকুর পূজা করিয়া গৃহ হইতে অন্যত্র গমন করিলেন। বালিকা ঘরে কাহাকেও না দেখিয়া, ধীরে ধীরে পিতার আসনখানি জুড়িয়া বসিলেন। ঠাকুরপূজাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু পূজার বড় বিঘ্ন উপস্থিত হইল। বালিকার পাশেই একটি প্রদীপ জ্বলিতেছিল। অথচ তাঁহার সে বিষয়ে খেয়ালই ছিল না; তাই হঠাৎ দীপশিখায় পরণের কাপড়খানি জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু শরৎ-সুন্দরীর প্রত্যুৎপন্নমতির জন্য ব্যাপারটা বেশী দূর গড়াইতে পারিল না। তিনি চট করিয়া কাপড়খানি নির্ম্মাল্যের জলে ডুবাইয়া রাখিলেন; তখনই আগুন নিবিয়া গেল। বালিকা তাঁহার কচি মুখখানি একটি হাস্যশ্রীতে মধুর করিয়া মাতার নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন—"তাই ত, আমার সুন্দর কাপড়খানা যে পুড়িয়া গেল।" শরৎসুন্দরী শৈশবকালে খেলার জন্য যে দেবতার অর্চ্চনা করিতেন, অধিক বয়সে সেই জীবনদেবতাই তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়াছিল; তিনি তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তি অর্পণ করিয়া সংযত ও শুদ্ধ মনে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেন।

শরৎসুন্দরী যখন খুব ছোট মেয়ে, তখনই লোকের দুঃখ সহিতে পারিতেন না; মানুষের কষ্ট দেখিলে তাঁহার সুকুমার হৃদয়ে করুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত; কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে, তাঁহারও চোখের জল ঝরিয়া যাইত। এ বিষয়ে কয়েকটি সুন্দর গল্প প্রচলিত আছে। বালিকার পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে, একদিন তাঁহার পিতা একটি প্রজাকে মারিতে উদ্যত হন। তখন বালিকা পিতার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া-ছিলেন। তাঁহার দুই চোখ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

পিতা কন্যার কান্না থামাইবার জন্য প্রজার অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, আর তাহাকে মারিতে পারিলেন না। আর একবার শরৎসুন্দরীর পিতা বাড়ীর পাচক ব্রাহ্মণের দোষক্রটির জন্য পাঁচ টাকা জরিমানা করিয়াছিলেন। সে বেচারা একেবারেই গরিব। তাহার চোখের জল সহিতে না পারিয়া বালিকা গোপনে তাহাকে পাঁচটি টাকা অর্পণ করিয়াছিলেন।

১২৬২ সালে শরৎসুন্দরীর ছয় বৎসর বয়সের সময়ে, পুঁটিয়ার জমিদার কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের সঙ্গে তাঁহার শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হইল। তখন কুমারের বয়স এগার কি বার বৎসর মাত্র। দিদিশাশুড়ী সম্পর্কীয়া মহিলাগণ প্রায়ই বালিকা বধূকে লইয়া ভারি কৌতুক করিতেন। বালিকা তখন স্বামীর সম্মুখে যাইতেও লজ্জা-বোধ করিতেন না; স্বামীকে "লালপাত্র" বলিয়া ডাকিতেন। এক এক বার মেয়েরা তামাসা করিয়া বউটিকে কাঁদাইতেন। কিন্তু বালক স্বামী স্ত্রীর কান্না সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া মেয়েদের বলিতেন—"অমন করিয়া যেন বালিকাকে কাঁদানো না হয়।" যোগেন্দ্রনারায়ণ স্ত্রীকে বড়ই ভালবাসিতেন; বালিকার স্বচ্ছ ও সরল মুখখানি দেখিয়া তাঁহার অন্তরে প্রীতি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত।

কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ পিতৃহীন। তাঁহার বয়স অতি অল্প। তাই জমিদারী কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন—অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল। তিনি শিক্ষার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন। হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি তাঁহার যে বিশ্বাস ছিল, তাহা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই শিথিল হইয়া পড়িল। তিনি নব্যতন্ত্রের সংস্কারপ্রিয় যুবকদিগের মত হাব-ভাব লইয়া দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন কুমার বাহাদুর

সাবালক। তাই তাঁহার হস্তেই জমিদারীর ভার অর্পিত হইল। গৃহ-পরিবারে ও গৃহের বাহিরে, সর্ব্বত্রই তিনি কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তৎকালে রাণী শরৎসুন্দরীর বয়স সবে তের বৎসর মাত্র। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুদ্ধিমতী বলিয়া লোকের প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নানারূপ সদ্‌গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। তাঁহার হৃদয়-মাধুর্য্যে মানুষ মুগ্ধ হইয়া যাইত। এ সকল সত্ত্বেও রাণী যৎসামান্য লেখাপড়াও শিক্ষা করিতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবেন? কেই বা তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইবে? পুঁটিয়া পল্লীগ্রাম, ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান; প্রায় সকলেই প্রাচীন ভাবের লোক। মেয়েদের লেখাপড়া শিখানো তাঁহারা ত অন্যায় বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু রাণী লেখাপড়া শিখেন নাই বলিয়া রাজা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাই রাজার অভিপ্রায় অনুসারে এই সময় হইতেই রাণীর শিক্ষা আরম্ভ হইল।

শিক্ষাবিষয়ে মনস্বিনী রাণীর একটি স্বাভাবিক শক্তি ছিল। এখন সেই শক্তি উন্মেষিত হইতে লাগিল। তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। ছয় মাসের মধ্যেই রাণী এক রকম লিখিতে ও পড়িতে শিখিলেন। সাহিত্যের রসগ্রহণ করিবার শক্তিটিও ধীরে ধীরে তাঁহার মধ্যে পরিস্ফুট হইল। তিনি অনেক ভাল ভাল বই পড়িয়া মোটামুটি তাহার ভাবটি আয়ত্ত করিয়া লইতেন। রাণী এখন উত্তম রূপেই বুঝিতে পারিলেন, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করার চেয়ে অন্যায় কাজ আর কিছুই নাই। তাই তিনি উৎসাহের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্তাক্ষর অতিশয় সুন্দর হইল; কোন লেখায় বানান ভুল না হয়, সে বিষয়ে তিনি খুব সতর্ক হইলেন। এক এক দিন দেখা যাইত,

রাত্রিকালে বাড়ীর প্রায় সকলেই ঘুমাইতেছেন, শুধুই তরুণী রাণী আলো জ্বালিয়া পড়িতেছেন ও লিখিতেছেন। কোন কোন দিন রাণী জ্যোৎস্না-ময়ী রজনীতে চন্দ্রালোকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত বাঙ্গালা সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র পাঠ করিতেন। এইরূপ পড়াশুনা করার জন্য তিনি বাঙ্গলা ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ভাষাতেও সামান্য অধিকার জন্মিয়াছিল। রাণীর গ্রন্থাগারে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে শুধু এই বইগুলির উপরেই তাঁহার যা কিছু আসক্তি ছিল। তিনি এক একখানি ভাল বইকে আপনার দেহের এক বিন্দু রক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার সময়ে যত রকম উৎকৃষ্ট পুস্তক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত, সমস্তই তিনি পড়িতেন, পড়িয়া চিন্তা করিতেন, সে বিষয়ে রস-গ্রাহী সাহিত্যিকের মত মতামত প্রকাশ করিতে পারিতেন। সুলেখক পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পিতা রাণীর প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সেইজন্য শ্রীশবাবুর প্রতি তাঁহার সন্তানের মত বাৎসল্য ছিল। প্রায়ই শ্রীশবাবুর সহিত রাণীর সাহিত্য ও কাব্য সম্বন্ধে আলো-চনা হইত। রাণী সুলেখকদিগকে অর্থ সাহায্য করিতেন। কিন্তু হায়, তাঁহার যে প্রিয়তম স্বামী লেখাপড়া শিখিবার জন্য তাঁহাকে উপদেশ দিতেন, উৎসাহিত করিতেন; তিনি এ সময়ে কোথায়? রাণী যে নিজের অধ্যবসায়ের গুণে শিক্ষার কতকটা উন্নতি করিয়াছিলেন, রাজার আর তাহা দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

রাণী স্বামীর আগ্রহে লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সমস্ত অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবেন? এখনো তিনি বালিকা; শৈশবকাল হইতে হিন্দুসমাজের প্রাচীন রীতিনীতির মধ্যেই বর্দ্ধিতা; পুরাতন সংস্কার তাঁহার অস্থিমজ্জায়

প্রবেশ করিয়াছে; তিনি কি সহজে চিরন্তন সামাজিক প্রথার প্রতি অবহেলা করিতে পারেন? তাঁহার স্বামী বলিতেন, প্রকাশ্যভাবেই তাঁহার সহিত তাঁহাকে মিশিতে ও কথা বলিতে হইবে। তিনি কিছুতেই তাহা পারিতেন না। লজ্জায় তাঁহার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিত। স্বামী নিজে ত আহারের সময়ে খাদ্যাদির কোন বিচারই করিতেন না; তাহা ছাড়াও তিনি ইচ্ছা করিতেন, রাণী ঠিক তাঁহারই মত আহারাদি করিবেন। তাহাও কি সম্ভব? রাণী তাহা পারিতেন না। এজন্য রাজা বড়ই অসন্তুষ্ট হইতেন। এ বিষয়ে শ্রীশ বাবুর "রাজ-তপস্বিনী' গ্রন্থে অনেক কথা লিপিবদ্ধ আছে। আমরা উহার একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি:—"একদিন রাজার কেমন সখ হইল, নিজের ভুক্তাবশিষ্ট রাণীকে খাইতে বলিবেন। * * ত্রয়োদশ বর্ষের বালিকা দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিল 'আপনার ভুক্তাবশিষ্ট আমি অবশ্য খাইব, কিন্তু আমার সাক্ষাতে এই অন্দরমধ্যে পাচিকা পাক করিয়া দিবে। তাহাই আপনি আহার করিলে খাইতে পারি। নচেৎ বাহিরের প্রস্তুত কিছুই ছুঁইব না'।"

রাণীর সঙ্কল্প দৃঢ়। তিনি অটল প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা কিছুতেই বালিকাপত্নীকে সংকল্পচ্যুত করিয়া আপনার অন্যায় আদেশের অনুবর্ত্তিনী করিতে পারিলেন না। শরৎ-- সুন্দরীর মনটি কোমল বটে; কিন্তু সেই মনের শক্তি যে কত অধিক, তাহা এই একটি ঘটনাতেই বেশ বুঝা গেল। সাধ্বী নারী অন্য শত কার্য্যে স্বামীর আদেশের নীচে মস্তক নত করিতে পারেন; কিন্তু যেখানে ধর্ম্ম লইয়া কথা, সেখানে আপনার বিশ্বাস রক্ষা করা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?

এ সকল ঘটনাসত্ত্বেও রাণী রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। তিনি

বিধবা হওয়ার পরে রাজার ছবির দিকে চাহিতে পারিতেন না, চাহিলেই দুই চোখ দিয়া শিশিরবিন্দুর মত অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। স্বামীর কথা উঠিলেই অব্যক্ত বেদনায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিত, তিনি কিছুতেই কান্না থামাইতে পারিতেন না। পতিব্রতা নারী আজীবন নিভৃত-মর্ম্মস্থানে স্বামীর সুপবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিয়াছিলেন এবং স্বামীর আত্মার উদ্দেশেই অন্তরের প্রীতিকুসুম অর্পণ করিয়া প্রাণের প্রেম চরিতার্থ করিতেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বৈরাগ্য ও দান

ঈশ্বরের বিচিত্র লীলারহস্য কে বুঝিতে পারে? তিনি মানুষের মনের উপর দুঃখের আঘাত করিয়াই অন্তরে দয়াধর্ম্ম ও দেবভাব ফুটাইয়া তোলেন। রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনে তাঁহার সেই লীলাই দেখিতে পাওয়া যায়। রাণীর প্রিয়তম স্বামী যোগেন্দ্রনারায়ণ কতদিনের পরে শিক্ষালাভ করিয়া, সাবালক হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, স্বহস্তে জমিদারীর ভার গ্রহণ করিয়াছেন; এখন রাণীর সম্মুখে সুখের শত দ্বার উন্মুক্ত হইবে, তিনি ধনৈশ্বর্য্যের রত্নবেদীতে বসিয়া স্বামীর সঙ্গে সংসারের অতুল সুখ উপভোগ করিবেন। কিন্তু হায়, দুই বৎসর যাইতে না যাইতেই বিপদ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ১২৬৭ সালে তাঁহার স্বামী স্বহস্তে জমিদারীর ভার গ্রহণ

করিলেন; ১২৬৯ সালের ২৯শে বৈশাখই তাঁহাকে বিষয়সম্পদ ও রাজসম্মান পৃথিবীতে ফেলিয়া, সতীসাধ্বী পত্নীকে অকুল সাগরে ভাসাইয়া, পরলোকে প্রস্থান করিতে হইল। তখন রাণীর বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরও পূর্ণ হয় নাই। এই সময়েই মৃত্যু দানবের মত রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিয়া নারীহৃদয় ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। তরুণী রাণী এই সঙ্কটের মধ্যে আপনাকে যে সামলাইতে পারিবেন, হয় ত অনেকেই তাহা মনে ভাবিতে পারেন নাই। কিন্তু বালিকাকে দুঃখের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে বলিয়াই, সর্ব্বজ্ঞপুরুষ তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মের জীবন্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন। এই বিপদের মধ্যে রাণীর সেই আধ্যাত্মিক শক্তিরই উন্মেষ হইতে লাগিল; সেই শক্তিই দুর্ব্বলা নারীকে শক্তিশালিনী করিয়া তুলিল; তিনি তাঁহার অন্তরস্থিত ধর্ম্মের সাহায্যেই বিপদের অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া, জীবনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মনস্বিনী নারী সর্ব্বাগ্রে সতী রমণীর একটি পরম পবিত্র আদর্শমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়া, ব্রহ্মচারিণীর মত কঠোর বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সতীত্বের তেজের কাছে রাজান্তঃপুরের কোন সুখের প্রলোভনই অগ্রসর হইতে পারিল না। মানুষ যেমন রাজপথের ধূলি-কণা চরণে দলিত ও নিষ্পেষিত করিয়া সম্মুখের দিকে চলিয়া যায়, তেমনি এই বিধবা রাণী তরুণ বয়সের ভোগস্পৃহা পদদ্বারা দলিত করিয়া, ত্যাগের পথে চলিতে লাগিলেন। তাঁহার যে সুকুমার অঙ্গ মূল্যবান বস্ত্রে ও স্বর্ণাভরণে ভূষিত ছিল, এখন সেই সোণার অঙ্গে মোটা থানের একখানি সামান্য বস্ত্র লক্ষিত হইত; যে গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণ কেশ-রাশি পৃষ্ঠে বিলম্বিত হইয়া দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি করিত, এখন তিনি সেই কেশগুচ্ছ কাটিয়া ছোট করিলেন। যাঁহার আহারের জন্য পরিপাটিরূপে

উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী রন্ধন করা হইত, তিনি এখন স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিতেন এবং কলার পাতা পাতিয়া, তাহাতেই তৃপ্তির সহিত আহার করিতেন। তাঁহার জমিদারীর আয় যথেষ্ট, স্বর্ণে রৌপ্যে ভাণ্ডার পূর্ণ; তবুও এই ব্রহ্মচারিণী রাণী বিধবা হইয়া স্বর্ণ স্পর্শ করেন নাই। এ যুগের একটি অল্পবয়স্কা রাণীর জীবনের এই সমস্ত ঘটনা কল্পিত কাহিনী বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু এই রচনার মধ্যে অতিরঞ্জিত বর্ণনা মোটেই নাই। পরলোকগত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন—

"প্রকাণ্ড দরদালানের মধ্যস্থলে শীতের সময় দেখিতাম, হর্ম্মতলে একখানি মাদুরের উপর সামান্য পাতলা তোষক বৃহৎ একখণ্ড চাদরে আবৃত, তাহাতে একটি মাত্র লেপ ও উপাধান। গ্রীষ্মের দিনে একটি শীতল পাটিমাত্র। চারিদিকে আশ্রিতা আত্মীয়া ও অনাথা ব্রাহ্মণ বিধবাদের শয্যা পাড়িত। কি শীত কি গ্রীষ্মে পরিধেয় একমাত্র বার হাতের মোটা থান।"

রাণী রাজান্তঃপুরের সহস্র প্রকার সুখের উপর হইতে চিত্ত প্রত্যাহার করিয়া হৃদয়ের মধ্যে যেন বৈরাগ্যের ও ত্যাগের মায়ামন্ত্র রচনা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি সেই মন্ত্রশক্তিতে পৃথিবীর ধূলা হইতে কতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারিয়াছিলেন, এখন সেই বিষয়ে একটুকু বর্ণনা করিব। রাণীর জীবনের বিশেষত্বই দয়া। দেশের শত শত লোকের দুঃখ ও দারিদ্র্য যেন তাঁহারই মনের উপর আঘাত করিত এবং হৃদয়ে বেদনা জাগাইয়া দিত। তাই তিনি দরিদ্রের জননী হইয়া তাঁহাদের দুঃখ ও যাতনা দূর করিতে প্রয়াসী হইতেন। হিন্দুঘরের দুঃখিনী বিধবাদিগের হৃদয়ের জ্বালা যে কি তীব্র, বেদনা কি অসহনীয়, তাহা তিনি ত বেশ ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই বিস্তর অসহায় বিধবাকে আপনার গৃহে আশ্রয় দিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে এক জায়গায় খাইতেন, এক ঘরে

শুইতেন ; কলিকাতায় গঙ্গাস্নানে যাইবার সময়, সেই দুঃখিনীদিগকেই সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহাদের চোখের জলের সঙ্গে আপনার চোখের জল মিশাইয়া দিতে একটি মুহূর্ত্তের জন্যও কুণ্ঠিত হইতেন না। এক এক সময় রাণীর গৃহে বিধবার সংখ্যা প্রায় একশত হইয়া দাঁড়াইত।

রাণী বিধবা হওয়ার পরে, তাঁহার বিপুল সম্পত্তি কোর্ট অফ্ ওয়ার্ডের অধীন হইল। তৎপরে ১২৭১ সালে রাণীর হস্তেই সেই সম্পত্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি জমিদারীর কর্ত্রী হইয়া সকল কার্য্যই সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতেন। রাণী বিস্তর বাঙ্গালা বই, সাপ্তাহিক ও মাসিকপত্র পাঠ করায়, তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত হইয়াছিল ; তিনি নানা বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এজন্য রাজকর্ম্মচারিগণ প্রতিদিনই সরকারি চিঠি, খাতা ও হিসাবপত্র অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিতেন। রাণী আহারান্তে সেই সকল কাগজ ও হিসাবপত্র দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া, যে কাজটি যে রকম ভাবে করা প্রয়োজন, তাহা করিতেই কর্ম্ম-চারীদিগকে আদেশ প্রদান করিতেন।

এই সময়েই তিনি দয়াময়ী হইয়া দেশের নানা প্রকার সৎকার্য্যে দুই হাত ভরিয়া অর্থ দান করিতে আরম্ভ করিলেন। রাণীর বিষয়কার্য্যে তৎপরতা, প্রজাপালনে সহৃদয়তা, লোকের সঙ্গে ব্যবহারে উদারতা এবং তাঁহার মহনীয় চরিত্র, কমনীয় প্রকৃতি ও সৎকাজে প্রচুর দান—এই সকলই রাজপুরুষেরা লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। এজন্য জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট, বিভাগের কমিসনার ও রেভেনিউ বোর্ডের মেম্বরগণ রাণীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন। তাঁহারা অনেকেই বিধবা রাণীর সংবাদ জানিবার জন্য উৎসুক হইতেন। একবার রাজসাহীর ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েলস্ সাহেব সস্ত্রীক পুঁটিয়ায় গমন করিয়াছিলেন। মেম সাহেব রাণীর সুপবিত্র মূর্ত্তির মধ্যে একটি স্বর্গীয় ভাব দর্শন করিয়া ও তাঁহার হৃদয়-

মাধুরীতে আকৃষ্ট হইয়া আনন্দোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন। রাণীর প্রতি তাঁহার একটি অকৃত্রিম স্নেহের উদয় হওয়ায়, তিনি প্রাণের আবেগ সংবরণ করিতে পারিলেন না; সরলভাবেই বলিয়া ফেলিলেন—"রাণী, আপনার বয়স ত অল্প; আপনি কেন আবার বিবাহ করুন না।"

বুদ্ধিমতী রাণী কোনরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন না; বরং তিনি হাসিতে মুখখানি রঞ্জিত করিয়া বিদেশিনীকে বুঝাইয়া দিলেন, হিন্দুনারী বিধবা হইয়া বিবাহের চিন্তা করিলেও তাহার পাপ হয়।

রাজপুরুষেরা শরৎসুন্দরীর মহত্ত্বের ও সদ্‌গুণের কথা সমস্তই গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়া জানাইতেন। তাই ১৮৭৪ সালে দিল্লির দরবারের সময়ে, গবর্ণমেণ্ট এই যশস্বিনী রমণীকে রাণী উপাধিতে ভূষিত করিলেন। প্রায়ই দেখা যায়, বড় লোকেরা এই রকম একটা উপাধি পাইলেই খুব ঘটা করিয়া আনন্দোৎসব করেন। শরৎসুন্দরী আমোদ-উৎসব কিছুই করিলেন না; কিছুদিন পূর্ব্বে প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, শুধু তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য এক হাজার টাকার কম্বল কিনিয়া গরীবদিগকে বিতরণ করিলেন।

রাণীর দানসম্বন্ধে সকল কথা উত্তমরূপে জানিবারও উপায় নাই। যাহা জানিবার সুবিধা আছে, তাহাও এই সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে বর্ণনা করিবার স্থান নাই। সেজন্য তাঁহার সৎকার্য্য ও দানের কথা খুব সংক্ষেপেই বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব।

একবার বর্ষাকালে জলপ্লাবন হইল। চারিদিকে জল থৈ থৈ করিতে লাগিল। পুঁটিয়া অঞ্চলের লোকের আর দুর্গতির সীমা রহিল না। সেখানে আরো জমিদার আছেন। কিন্তু দুঃখীর আর্ত্তনাদ শুনিয়া রাণী শরৎসুন্দরীরই প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কে আপনার প্রজা, কেই বা

অপরের প্রজা, এই চিন্তাই তাঁহার মনে স্থান পাইল না। তিনি অর্থ দ্বারা সমস্ত লোকেরই অভাব মোচন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে পুঁটিয়া গ্রামে আগুন লাগিল। বিস্তর লোকের ঘর দরজা পুড়িয়া গেল। মানুষের কষ্টের কথা শুনিয়া রাণী আর অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি যথার্থই লোকের দয়াময়ী জননী হইয়া বিপন্নদিগকে অর্থ সাহায্য করিতে লাগিলেন।

সম্প্রতি "সতীচরিত" শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক আমাদের হস্তগত হইয়াছে। উহার লেখক রাণী শরৎসুন্দরীর দান ও সৎকার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"গত ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় রাণী তিন মাসাধিক দরিদ্রদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। এক এক দিন সহস্র সহস্র কাঙ্গাল তাঁহার ভাণ্ডার হইতে অন্ন লাভ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। * * দুঃখিনী স্ত্রীলোক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিলে দুই চারি টাকা গ্রহণ না করিয়া ফিরিয়া আসিত না। যে ব্যক্তি তাঁহাকে স্বীয় দৈন্য জানাইতে পারিয়াছে, সে কখন বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া আসে নাই। অতিথি সৎকারের জন্য তাঁহার ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত ছিল। তিনি অতিশয় আদর ও যত্নসহকারে অতিথিসেবা করিতেন। * * বিদ্যালয় ও দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেন।"

রাণী যে শুধু দরিদ্রদিগকেই দান করিতেন, তাহা নহে। মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকেরাও তাঁহার সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন নাই। এই শ্রেণীর লোকের পীড়া আছে, বিপদ আছে, যথেষ্ট অভাব আছে; অথচ তাঁহারা রাণীর দ্বারস্থ হইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে পারিতেন না;—বড়ই সঙ্কোচ বোধ হইত। কিন্তু এইরূপ বিপন্ন ভদ্রলোকদিগের সঙ্কটের সময়ে রাণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন। পুঁটিয়া গ্রামে

কোন ভদ্রলোকের গৃহে কঠিন পীড়া হইয়াছে, অথচ তাঁহার ডাক্তার ডাকিবার সামর্থ্য নাই, ঔষধ কিনিবার মতও অর্থ নাই ;—এই সংবাদটি রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেই, তিনি সেই পীড়িত লোকের গৃহে আপনার বাড়ীর ডাক্তার পাঠাইয়া দিতেন এবং তাঁহার সুচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেন। কোন রোগীর সুপথ্য জুটিতেছে না, রাণী তাহা জানিতে পারিলেই তাহার গৃহে সাগু, মিছরি, বেদনা ও অন্যান্য সামগ্রী প্রেরণ করিতেন। আমার মনে হয়, রাণীর বড় বড় দানের চেয়েও এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজেই তাঁহার স্নেহ ও করুণার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাইত।

"রাজতপস্বিনী" গ্রন্থরচয়িতা লিখিয়াছেন, রাণী যে দরিদ্র ছাত্রদিগের পড়ার খরচ যোগাইতেন, তাহাতে তাঁহার মাতৃভাবই ফুটিয়া উঠিত। মানুষের শিক্ষার যে কত প্রয়োজন, তিনি তাহা উত্তমরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই লোকের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কখনই হস্ত সঙ্কুচিত করিতেন না। স্ত্রী-শিক্ষার প্রতি তাঁহার বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। রাণী রাজসাহী কলেজের উন্নতির জন্য প্রচুর অর্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত অর্থসাহায্যেই কয়েকটি স্কুলের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইত। অনেক ছাত্রের স্কুল ও কলেজের পড়ার খরচ তিনিই প্রদান করিতেন। ঐ সকল ছাত্র-দিগের মধ্যে কতকগুলি বালক ও যুবক ছুটির সময়ে পুঁটিয়াতে গমন করিতেন এবং রাণীর সুমিষ্ট স্নেহ প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহারা ঐ সময়ে একবার পুঁটিয়ায় গমন না করিলে রাণীর বড়ই ক্লেশ হইত।

রাণীর নিকট যে সকল ছাত্র যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে শরচ্চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে আমার খুব আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। তিনি গ্রন্থকার ও সুলেখক। তাঁহার বাড়ী রাজসাহী জেলাতেও নয়—

শ্রীহট্টে। শরৎবাবু বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষকের কার্য্য করিতেছিলেন। আমি তাঁহার পুঁটিয়ার বাসায় অতিথি হইয়াছিলাম। তখন শুনিয়াছি, তিনি অসহায় অবস্থায় পুঁটিয়ায় আসিয়া রাণীর স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাণী তাঁহাকে সন্তানের মত ভালবাসিতেন। তাঁহার স্নেহ, দয়া ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াই শরৎবাবু স্কুলে ও কলেজে অধ্যয়ন করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন।

রাণী একবার কলিকাতায় গমন করিয়া গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছিলেন। ঐ সময় অর্থের জন্য বিস্তর লোক তাঁহার কাছে উপস্থিত হইতেন। কেহ বা বলিতেন, দৈবদুর্ব্বিপাকে আমি বড় বিপন্ন; রাণীর নাম শুনিয়া তাঁহার কাছে আসিয়াছি; আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতেই হইবে। কেহ বা বলিতেন, আমি কন্যাদায়গ্রস্ত। কেহ বা বলিতেন, আমি ভিখারী ব্রাহ্মণ। কে বা বলিতেন, দেশের মধ্যে একটি সদনুষ্ঠানের সূচনা করিতেছি, এজন্য রাণীর কাছে অর্থ সাহায্য চাই। এইরূপ নানা লোক নানা প্রকার অভাব জানাইয়া রাণীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। ঐ সকল লোকের মধ্যে কেহই রাণীর নিকট হইতে রিক্তহস্তে ফিরিয়া যান নাই। তখন একটি বিষয়ে ভারি মজা হইত। রাণী দেশের কোন সদনুষ্ঠানের জন্য হয় ত পাঁচশত টাকা দান করিতেন, কিন্তু খবরের কাগজে ছাপা হইত হাজার টাকা। যাঁহারা চাঁদা আদায় করেন, তাঁহারা আসিয়া আরো পাঁচ শত টাকার দাবি উপস্থিত করিতেন। রাণীর ত বিস্ময়ের আর সীমাই থাকিত না।

রাণীর দান দিনের পর দিন বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। কোষাধ্যক্ষ ভাবিলেন, এইরূপ দানের ব্যবস্থা থাকিলে হয় ত শেষকালে আর টাকায় কুলাইবে না, সেজন্য দান কিছু কমাইতেই হইবে। দান কমাইবার

জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। রাণী অভাবগ্রস্ত লোক-দিগকে যত টাকা দিতে আদেশ করিতেন, খাজাঞ্চী তহবিল হইতে টাকা দিবার সময়, তাহার চেয়ে অনেক কম দিতেন। কিন্তু দৈবাৎ সে কথা রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিলেই মুস্কিল হইয়া দাঁড়াইত, তিনি আর ধৈর্য্য-রক্ষা করিতে পারিতেন না। এই করুণহৃদয়া নারী আর কোন অপ-রাধের জন্যই কর্ম্মচারীদিগকে কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিতেন না; তাঁহার এমনই কোমল প্রকৃতি ছিল যে, মানুষের মনে ব্যথা দিতেই পারিতেন না। কিন্তু কর্ম্মচারিগণ দরিদ্রদিগকে বঞ্চিত করিতেছে, এ কথা শুনিলেই তাঁহাদিগকে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করিতেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মজীবন

তিনটি বিষয়ে মানুষের যথার্থ ধর্ম্মভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; পবিত্র চরিত্রে, পরোপকারে ও ঈশ্বরার্চ্চনায়। সংসারের পাপ প্রলোভনের মধ্যেও যাঁহার চরিত্র পবিত্র থাকে, যিনি আপনার স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া অপরের কল্যাণসাধন করেন এবং যিনি ভক্তির সহিত আরাধ্য দেবতার অর্চ্চনা করিতে সমর্থ হন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক। রাণী শরৎসুন্দরীর চরিত্র যে প্রস্ফুটিত শতদলের মত শুভ্র ও নির্ম্মল, তিনি যে দুঃখী ও বিপন্ন লোকের ক্লেশ নিবারণ করিতেন, সে বিষয়ে অনেক কথাই ত লিখিয়াছি; এখন রাণীর ঈশ্বরার্চ্চনাসম্বন্ধে সংক্ষেপে গুটিকয়েক কথা লিপিবদ্ধ করিব।

রাণীর প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের প্রতিই অত্যন্ত ভক্তি ছিল। সেজন্য তিনি দেবার্চ্চনা, ব্রত, উপবাস ও দানধ্যান ত করিতেনই; তাহা ছাড়া

ধর্ম্মের আরো অনেক কঠোর নিয়ম প্রতিপালন করিতেন। 'রাজ-তপস্বিনী' গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন, রাণী ধর্ম্মনিয়ম পালনের জন্য ভয়ানক ক্লেশ সহ্য করিতেন; সেই জন্যই তাঁহার দেহ ভগ্ন হইয়া গেল।

রাণী খাদ্যদ্রব্য-সম্ভারে নৈবেদ্য রচনা করিতেন, তাহার পরে স্বীয় দেবতার অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইতেন। এই ভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়া যাইত। অর্চ্চনা শেষ হইলে পরে, নৈবেদ্যের প্রচুর সামগ্রী অতিথিদিগের কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

রাণী যে শুধুই মনের একটা অন্ধ সংস্কারের জন্য, ধর্ম্মের কতকগুলি প্রাণহীন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতেন, তাহা নহে। তাঁহার আরাধ্য দেবতার প্রতি ভক্তিও ছিল, ভালবাসাও ছিল। এই জন্য যখন নব বসন্তের আবির্ভাব হইত, তরুবৃন্তে রাশি রাশি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিত, মধুর বায়ু-হিল্লোলে পুষ্পগন্ধ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত, পাখীর সুস্বরে হৃদয়ে কেমন এক করুণ ও মধুর ভাব জাগিয়া উঠিত; তখন রাণী উচ্ছ্বসিত প্রীতির আবেগে, উদ্যানের পুষ্প চয়ন করিয়া স্বহস্তে সুচিক্কণ মাল্য রচনা করিতেন; সেই পুষ্পমালা গৃহদেবতা গোবিন্দজীর গলায় পরাইয়া দিতেন। তাহাতে রাণীর কোমল অন্তরে অপূর্ব্ব পুলকের সঞ্চার হইত ও তাঁহার নারীহৃদয় তৃপ্তিলাভ করিত।

রাণী ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত তীর্থস্থানই ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মাকাজ্ক্ষা চরিতার্থ হইয়াছিল। তিনি এক একটি তীর্থে গমন করিয়াই সংকল্প করিতেন, তাঁহার যে ফলটি খাইতে বড়ই ভাল লাগে, সে ফল আর খাইবেন না। এজন্য রাণীর অনেক উৎকৃষ্ট ফলই খাইবার সুবিধা হয় নাই; সকলই তাঁহার জীবনদেবতার প্রীতির জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় স্বরচিত 'রাজতপস্বিনী' গ্রন্থে লিখিয়াছেন —"জগদ্ধাত্রী পূজার বাড়ী নাম দিয়া তিনি একখানি মাটির বাড়ী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন এবং পূজা উপলক্ষে কয়েকদিন আত্মীয় ও আশ্রিতগণ-সহ সেখানে বাস করিতেন। মনে পড়িতেছে, সেই সময়ে সে গৃহে শ্বেত-কৌশিকবস্ত্র-পরিহিতা তাঁহার গৌরাঙ্গী সুদীর্ঘ মাতৃমূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে কতবার আমাদের মনে হইয়াছে, এই ত জীবন্ত জগদ্ধাত্রী-মূর্ত্তি ! আবার পৃথক পূজা কেন ?

রাণীর আপনার ধর্ম্মের উপরে ত গভীর ভক্তি ও অনুরাগ ছিল; আবার অন্য ধর্ম্মের প্রতিও তাঁহার অতিশয় শ্রদ্ধা দেখা যাইত। সামাজিক বিষয়ে তাঁহার অনেক মতই উদার এবং উন্নত ছিল। রাণী অনেক সময়েই পড়াশুনা করিতেন, দেশের কোথায় কি হইতেছে, সেই বিষয়েও খবর রাখিতেন; এজন্য তাঁহার মধ্যে সেকাল ও এ-কালের সময় হইয়াছিল। তিনি আত্মোন্নতির জন্য প্রায়ই ডায়েরি লিখিতেন। স্ত্রী-শিক্ষা তাঁহার এমনই আবশ্যক বলিয়া মনে হইত, শিক্ষিত লোকেরাও সে বিষয়ে কেন যে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেন না। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ত একজন সমাজ-সংস্কারক ছিলেন; অথচ তাঁহার প্রতি রাণীর অত্যন্ত ভক্তি ছিল। তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট চিঠি লিখিতেও লজ্জাবোধ করিতেন না। রাণী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়েরই পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। একবার শ্রীশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাণীর একখানি চিঠি লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তিনি কথা-প্রসঙ্গে শ্রীশ বাবুকে বলিলেন— "কথাটা হয় ত তোমাদের বেশি মনে হইবে, কিন্তু এ কথা সত্য যে শরৎসুন্দরীকে আমি নিজের কন্যার চেয়েও বেশি স্নেহ করি।" স্নেহ

করিবারই ত কথা। রাণী যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতই দয়া-ভরা হৃদয়টি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই উদারচিত্ত বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মপরায়ণা নারীর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতি অতিশয় ভক্তি ছিল। তিনি শ্রীশবাবুর নিকট মহর্ষির জীবনের কাহিনী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। একবার মহর্ষি শ্রীশ বাবুর নিকট রাণীর সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া হাস্যমুখে বলিয়াছিলেন, "শরৎকুমারী আমার এক কন্যা ছিলেন।" এই সামান্য কথাটি রাণীর কর্ণে প্রবেশ করায়, তিনি আপনাকে মহর্ষির কন্যা স্থানীয়া মনে করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। শ্রীশ বাবু রাণীর বিষয়ে লিখিয়াছেন—"মাঝে মাঝে তিনি কথা-প্রসঙ্গে আমাদিগকে ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেন—ব্রাহ্মধর্ম্ম কি, তাহার কয়টি সম্প্রদায়, কোন্ সম্প্রদায় কি কাজ করিতেছে? * * বলা বাহুল্য উপনিষদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবাদ স্বভাবতঃই তাঁহাকে বেশি আকৃষ্ট করিত।"

রাণীর মনটা যে কত বড় ছিল, সেই মনের মধ্যে যে কিরূপ পবিত্র, উদার ও মহৎ ভাব ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও বিস্ময়ের উদ্রেক হয়। একবার ব্রাহ্মসমাজের একজন প্রচারক পুঁটিয়াগ্রামে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সেখানে সকলেই প্রাচীন ধর্ম্মের অত্যন্ত পক্ষপাতী; কে তাঁহার প্রচারকার্য্যের সাহায্য করিবে? কেই বা তাঁহার বক্তৃতা শুনিবে? কিন্তু কথাটা যখন রাণীর কর্ণে প্রবেশ করিল, তখন তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া রাজবাড়ীর প্রাঙ্গণে বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কে কি বলিবে, রাণী সে কথা চিন্তাও করিলেন না; নিজেই চিকের আড়ালে বসিয়া বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। শুধু তাহাই নয়। একদিন আহারের জন্য তিনি সেই

প্রচারক মহাশয়কে রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভদ্রলোকটি নিরামিষ খান, এজন্য রাণী স্বহস্তেই গুটিকয়েক নিরামিষ তরকারি রান্না করিলেন। প্রচারক মহাশয় যখন আহার করিতে বসিলেন, তখন সারি সারি খাদ্যসামগ্রী দেখিয়া তাঁহার ত চক্ষু স্থির! তাঁহার সম্মুখেই শ্বেতপাথরের প্রকাণ্ড থালা, তাহাতে সরুচালের ভাত; থালার চারিদিকে একশত পাথরের বাটি। তাহার কোনটায় স্বক্তা, কোনটায় ডাল, কোনটায় তরকারি, কোনটায় টক, কোনটায় মিষ্টান্ন! রেকাবে নানা রকম ভাজা! প্রচারক মহাশয় কোন্ দ্রব্যটি রাখিয়া কোনটি যে খাইবেন, হয় ত কিছুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে সেই ভাবনাই করিতে হইয়াছিল। রাণী সকল সম্প্রদায়ের অতিথিদিগকেই সমাদর-পূর্ব্বক আহার করাইতেন, ইহাতে তাঁহার নারীপ্রকৃতি চরিতার্থ হইত।

রাণী সংবাদপত্র পড়িতেন, দেশের সমস্ত সংবাদই জানিতে পারিতেন। তিনি স্বদেশের কল্যাণ চিন্তা করিতেন। স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় যখন কিছুদিনের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তখন রাণীর এতই আনন্দ হইয়াছিল যে, তিনি মনের পুলকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিবার জন্য স্থানীয় ভদ্রলোক-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া এক ভোজের আয়োজন করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রাণী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার নাম কুমার যতীন্দ্রনারায়ণ। ১২৯০ সালে রাণী ইহারই হস্তে জমিদারীর ভারার্পণ করিয়া কাশী গমন করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই যতীন্দ্রনারায়ণের মৃত্যু হইল। তখন আবার রাণী স্বয়ং জমিদারীর কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন।

বাঙ্গালা ১২৯৩ সালে রাণী রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার জ্বর

হইল। এই রোগেই ২৫শে ফাল্গুন মঙ্গলবার পুণ্যশীলা নারী ঈশ্বরের নাম জপ করিতে করিতে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলেন। সেদিন তাঁহার জন্য যে অশ্রুবিসর্জ্জন করিবে, এমন পুত্রকন্যা কেহই ছিল না, কিন্তু যে সকল দরিদ্র ও অনাথাদিগকে তিনি পুত্রকন্যার মতই প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহাদের ক্রন্দনধ্বনিতে বৃহৎ রাজভবন পূর্ণ হইয়া গেল।

দেবী অঘোরকামিনী

—:*:—

প্রথম পরিচ্ছেদ

জন্ম ও পরিণয়

দেবী অঘোরকামিনী ভক্তিমতী নারী এবং তাঁহার স্বামী প্রকাশচন্দ্র রায় পরম ভক্ত ছিলেন। প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন। বাঁকিপুরে তাঁহার বাসগৃহ, সাধনের স্থান ও সেবার ক্ষেত্র ছিল। প্রকাশচন্দ্র আমাদিগকে তাঁহার প্রেমের আকর্ষণে আকৃষ্ট করিয়াছিলেন; আমরা তাঁহার চরণতলে বসিয়া ভক্তির সুমধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছি।

এই প্রকাশচন্দ্র পূর্ণ যৌবনে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সেই তপস্যার ফল যেন অগ্রেই প্রদান করিয়াছিলেন। তাই প্রথম জীবনেই তাঁহার স্ত্রীরত্ন লাভ হইয়াছিল। এ সংসারে কোন কোন ধার্ম্মিক লোকের স্ত্রী-সম্বন্ধে বড় দুর্ভাগ্য দেখা যায়। উদ্যানের যে লতা তরুকে আশ্রয় করে, অনেক সময়ে সেই লতাই যেমন তাহাকে শ্রীহীন ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে; তেমনি অনেক ধর্ম্মহীনা নারী ধার্ম্মিক

স্বামীকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শক্তিই হরণ করেন ; তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করিয়া, ধর্ম্ম হইতে বিষয়ের দিকেই লইয়া যান। কিন্তু উদ্যানে আবার এমন দৃশ্য ত কতই দেখা যায় যে, কুসুমিত লতাটি তরুকে আশ্রয় করিয়া আপনার পুষ্প ও কিশলয়ের দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যই বর্দ্ধিত করিয়া তুলিয়াছে। তেমনি সংসারে ধর্ম্মশীলা নারীও বিস্তর। তাঁহারা হৃদয়ের মাধুর্য্য, অন্তরের ভক্তি ও জীবনের শক্তির দ্বারা স্বামীর জীবন সুন্দর ও সবল করিয়াই তোলেন। দেবী অঘোরকামিনী তাঁহাদের মতনই ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী ছিলেন। তিনি আপনার হৃদয়মাহাত্ম্যে ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে স্বামীকে সৌভাগ্যবান করিয়া তুলিয়াছিলেন।

অঘোরকামিনী ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে শ্রীপুর নামক একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ গ্রামটি চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত। তাঁহার পিতার নাম বিপিনচন্দ্র বসু। তিনি দেশের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তাই তাঁহার কন্যার জন্য সুপাত্র সংগ্রহ করিতে কোন রকম ক্লেশস্বীকার করিতে হইল না। অঘোরকামিনীর দশ বৎসর বয়সের সময়েই প্রকাশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইল। তখন প্রকাশ-চন্দ্রের বয়স আঠার বৎসর। তিনি হেয়ার স্কুল হইতে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতেছিলেন।

বিবাহের পূর্ব্বে একটি বড় কৌতুকজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। অঘোরকামিনীর বিবাহ ত স্থির হইয়া গেল ; কিন্তু বরকে দেখিবার কোনই সুবিধা হইল না। অথচ তাঁহাকে দেখিবার জন্য বালিকার মন চঞ্চল। তাঁহার সে মনের কথা কাহারো কাছে মুখফুটিয়া বলিবারও যো নাই। বলিলেই লোকেরা বলিবে, মাগো মা ! মেয়ের যে একটুকু লজ্জা নাই। কাজেই লোকচক্ষুর অন্তরালে দূরে দাঁড়াইয়া, গোপনে বরকে দেখা ভিন্ন তাঁহার আর কোনই উপায় ছিল না। তাই তিনি একদিন

বরকে দেখিবার জন্য দালানের ছাদের উপর উঠিলেন। সে দিন প্রকাশ-চন্দ্র তাঁহাদের দালানের কাছ দিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন। বরের পানে চাহিয়া বালিকার মন যে কি রকম হইয়াছিল, তাহা কে বলিবে? দালানের ছাদ যে কোন্‌খানে গিয়া শেষ হইয়াছে, বালিকার সে খেয়ালই রহিল না। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া চলিতে চলিতে, ছাদের উপর হইতে একটি বাগানের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। লজ্জায় বালিকার মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল! ভাগ্যে তাঁহার আঘাত গুরুতর হয় নাই।

বিবাহের পরে অঘোরকামিনী স্বামীর গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গৃহের অনেক কার্য্য তাঁহাকেই করিতে হইত। তাহার পরে প্রকাশচন্দ্রের মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন ধর্ম্মের মহাশক্তিতে শক্তিশালী; তিনি যুবকদিগের অন্তরে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিতেছিলেন। প্রকাশচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া ও উপাসনায় যোগদান করিয়া, ব্রাহ্মদিগের মতই জীবন যাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। সেই সময়ে অঘোরকামিনীর মনের মধ্যে এই নব ধর্ম্মের রশ্মিরেখাই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। প্রকাশচন্দ্র কলিকাতা হইতে দেশে যাইতেন এবং রাত্রিকালে গোপনে পত্নীকে লইয়া প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার স্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস যাহাতে বুঝিতে পারেন, সে বিষয়েও তাঁহার চেষ্টা দেখা যাইত। তখন অঘোরকামিনীর বয়স অল্প, শিক্ষা ত অতি সামান্য। কিন্তু তাহা হইলেও এই নারীর মধ্যে যে বলিষ্ঠ আত্মা বিরাজ করিতেছিল, তাহার শক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কথা শুনিয়া উহার মোটামুটি ভাবটি এক রকম বুঝিতে পারিলেন। স্বামীর মতন তাঁহারও ব্রাহ্মধর্ম্মের রীতিনীতি পালন করিতে অভিলাষ জন্মিল। কিন্তু একটি ভদ্র পরিবারের কুলবধূর পক্ষে প্রচলিত সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে কিছু করা বড় সহজ ব্যাপার

নয়। অঘোরকামিনী দেশপ্রচলিত দুই একটি লোকাচারের বিরুদ্ধে চলিতে গিয়াই বাড়ীর মেয়েদের কাছে বড় গঞ্জনা সহ্য করিলেন। এ বিষয়ে তাঁহাকে বড়ই মুস্কিলে পড়িতে হইত। বাড়ীতে প্রকাশচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ। ঐ বিবাহে "জলসওয়া" নামক একটি মেয়েলী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইবে। অনুষ্ঠানের গানগুলি অশ্লীল। তাই প্রকাশচন্দ্র পত্নীকে "জলসওয়া" ব্যাপারে যোগ দিতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বাড়ীর মেয়েরা তাঁহাকে সেই অনুষ্ঠানের ভিতর লইয়া যাইবার জন্যই টানাটানি করিতে লাগিলেন। এ অবস্থায় স্বামীর অনুরোধ রক্ষা না করিলেও মনের ক্লেশ, আবার বাড়ীর মেয়েদের কথা না শুনিলেও লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা।

অঘোরকামিনী ধর্ম্মবিশ্বাস ও স্বামীর অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য দেশের দুই একটি পুরাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতেন বটে; কিন্তু তিনি গৃহকর্ত্রীদিগের মন রাখিবার জন্য ঘরের কোন রকম কাজ করিতেই আপত্তি করিতেন না। রান্না করা, বাসন মাজা, ঘরঝাঁট-দেওয়া, গরুর জাব কাটা, চিঁড়ে কোটা, এ সকলই তিনি করিতেন। তাঁহার বয়সের হিসাবে কাজের চাপ বড়ই বেশি হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভালই হইয়াছিল। তিনি তরুণ বয়সে দিনরাত ঘরের কাজ করিয়া দুরন্ত পরিশ্রমের অভ্যাস না করিলে, পরিণত বয়সে লোকের সেবায় রক্তদান করিতেন কেমন করিয়া?



দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উপাসনা, বৈরাগ্য ও আধ্যাত্মিক বিবাহ

প্রকাশচন্দ্র গভর্ণমেণ্টের কর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মতিহারি গমন করিলেন এইখানেই অঘোরকামিনীর অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল প্রকাশচন্দ্রই তাঁহার প্রাণে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিয়া তুলিলেন। এ বিষয়ে অঘোরকামিনী বড়ই সৌভাগ্যবতী। প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রীজাতির প্রতি অটল শ্রদ্ধা, নারী-জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা, পতি-পত্নীর-সম্পর্ক বিষয়ে অতি উন্নত ভাব এবং তাঁহার স্ত্রীর প্রতি গভীর প্রেম ছিল। তিনি নিজেও দেবজীবন লাভের প্রয়াসী ছিলেন, পত্নীকেও দেবীর মত গড়িয়া তুলিবেন—তাহাই তাঁহার সংকল্প ছিল। তিনি পত্নীর ঘাড়ে ঘরের কাজ ও ছেলেমেয়ের ভার সমস্তই চাপাইয়া দিয়া, নিজে ধর্ম্মকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার নিজের আত্মার উন্নতির জন্য যেমনই প্রবল চেষ্টা ছিল, তেমনই তিনি আত্মার সঙ্গিনী অঘোর কামিনীর অন্তরে ধর্ম্মভাব পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন।

মতিহারিতে শুভক্ষণে সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত আগমন করিয়াছিলেন। অঘোরনাথ ও স্বর্গীয় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, এই দুইজনেরই বাড়ী শান্তিপুর, দুইজনেই দুজনের পরম বন্ধু, দুজনেই ব্রাহ্মসমাজের দুই শক্তিশালী প্রচারক। বিজয়কৃষ্ণ ঈশ্বরের প্রেমরসে ডুবিয়া থাকিতেন, অঘোরনাথ ঈশ্বরের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিতেন। বিজয়কৃষ্ণ ভাবোন্মত্ত ভক্ত; অঘোরনাথ প্রশান্তচিত্ত যোগী। প্রকাশচন্দ্রের

গৃহে এই যোগী পুরুষ আগমন করিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য, সাধনা, ত্যাগ ও উন্নত ধর্ম্মজীবন দর্শন করিয়া তুই স্বামী-স্ত্রী বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা কিরূপে এই সাধুর ন্যায় ধর্ম্মজীবন লাভ করিবেন, সেই চিন্তায় তাঁহাদের চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। অঘোরকামিনী সাধু অঘোরনাথের নিকটই ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

এই সময় হইতে দেবী অঘোরকামিনী স্বামীর সহিত একপ্রাণ হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং আপনাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অধীন করিবার জন্যই দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের জীবনদেবতার প্রভাব গৃহপরিবারের সর্ব্বত্র যাহাতে ব্যাপ্ত হয়, সেজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান আরম্ভ হইল। তাঁহারা ঈশ্বরের করুণা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা না করিয়া সংসারের কোন কাজেই হস্তার্পণ করিতেন না। প্রকাশচন্দ্র প্রতিমাসে যে বেতন পাইতেন, সেই টাকা লইয়া অগ্রে উপাসনাগৃহে প্রবেশ করিতেন। সেখানে উপাসনা হইত। স্বামী স্ত্রী দুজনে ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। তাহার পরে সেই টাকা সংসারের কার্য্যে ব্যয় হইত। এইরূপ ছোট বড় সকল কাজেই তাঁহারা ঈশ্বরকেই জীবনের প্রভু মনে করিয়া ও তাঁহার চরণতলে মস্তক নত রাখিয়া, ঈশ্বরময় জীবন যাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেন।

তাহার পরে অঘোরকামিনী অনুভব করিলেন, তাঁহাকে আসক্তি ও মোহ হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে, সুখস্পৃহা খর্ব্ব করিতে হইবে; নচেৎ কিছুতেই ধর্ম্মসাধন ও ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবেন না। তাই তিনি সর্ব্বাগ্রে রমণীর আসক্তির সামগ্রী মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ত্যাগ করিলেন; অঙ্গের অতি যত্নের স্বর্ণাভরণখানি দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকদিগের সাহায্যের জন্য দান করিলেন এবং বেহারের তাঁতের তৈরী "মুটিয়া"

নামক অত্যন্ত মোটা বস্ত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই যে তাঁহার পরণে অল্পদামের কাপড় দেখা গেল, ইহার পরে আর কেহই তাঁহাকে জমকালো পোষাক পরিতে দেখে নাই। তিনি যখন সেবাব্রত গ্রহণ করিয়া, বাঁকিপুরের কমিসনারের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন; তখনো পরণে সেই বেহারের তৈরী মোটা শাড়ী।

প্রকাশচন্দ্র মতিহারি হইতে বদলি হইয়া বাঁকিপুরে গমন করিলেন। অঘোরকামিনী দেবীকেও বাঁকিপুরেই যাইতে হইল। এইখানেই তাঁহাদের প্রকৃত তপস্যা আরম্ভ হইল। অঘোরকামিনী পূর্ব্বে যেটুকু আসক্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন আর তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তার সাহায্যেই বুঝিতে পারিলেন, সংসারের কুসুমোদ্যান ও ভক্তির অমৃত-নির্ঝর, ইহার মাঝখানে তপস্যার একটা মরুভূমি আছে। দৃঢ় সংকল্প, সংযম ও সহিষ্ণুতার সহিত সেই মরুভূমি পার হইতে না পারিলে যথার্থ ভক্তিলাভ করা যায় না। সেজন্য তিনি তাঁহার স্বামীর সহিত মিলিত হইয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিলেন। দিনের পরে দিন তাঁহার সুখস্পৃহা খর্ব্ব হইতে লাগিল। তিনি তাঁহার অঙ্গের আভরণ আগেই উন্মোচন করিয়াছিলেন। এইবার তিনি মস্তকের কৃষ্ণকেশগুচ্ছ কাটিয়া ছোট করিলেন। ধর্ম্মপথের যে সকল শত্রু আত্মগোপন করিয়া তাঁহার মনের মাঝখানে বাস করিত, সেগুলিও ধরা পড়িল এবং বৈরাগ্যের আগুনে পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল।

কিন্তু এইটুকু বৈরাগ্যসাধনে অঘোরকামিনী ও তাঁহার স্বামীর তৃপ্তি কোথায়? এইবার তাঁহারা যথার্থ তপস্বীর ন্যায় রক্তমাংসের শরীরের উপর জয়লাভ করিবার জন্য কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা গৃহের সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিবেন, জনসমাজের সেবাতেও

তাঁহাদের হস্ত দুখানি নিযুক্ত থাকিবে ; পতিপত্নীর মধ্যে যে আত্মায় আত্মায় নিগূঢ় প্রেমের সম্পর্ক, তাহা আরো গভীর হইবে ; অথচ দুজনের মধ্যে কোনরূপ দেহের সম্বন্ধ থাকিবে না, আর তাঁহাদের সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে না। এই কঠিন ব্রতের অন্তরালে পতিপত্নীর যে সংগ্রাম, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতা রহিয়াছে, তাহা অনুভব-করাই সম্ভব, বর্ণনা করা সম্ভব নহে। এই সময়ে প্রকাশচন্দ্রের বয়স পঁয়ত্রিশ ও অঘোরকামিনীর বয়স ছাব্বিশ বৎসর মাত্র।

অবশেষে ১২৯১ সালের মাঘ মাস উপস্থিত হইল। তখন অঘোর-কামিনী দেবী ও তাঁহার স্বামী রাজগৃহে গমন করিলেন। রাজগৃহ বৌদ্ধদিগের তীর্থস্থান। মহাত্মা বুদ্ধদেবের চরণস্পর্শে ঐ স্থানটি পবিত্র হইয়া রহিয়াছে। ঐ স্থানেই অঘোরকামিনী ও প্রকাশচন্দ্র তাঁহাদের জীবনের মহদ্‌ব্রত স্থায়ী করিবার জন্য আর একটি পবিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করিলেন। অনুষ্ঠানটির নাম আধ্যাত্মিক-বিবাহ।

আধ্যাত্মিক-বিবাহ ব্যাপারটা যে কি, তাহা একটু স্পষ্ট করিয়া বলা প্রয়োজন। খৃষ্টানদিগের রোমাণ ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্মিক বিবাহের রীতি প্রচলিত আছে। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন স্বরচিত নবসংহিতা গ্রন্থে আধ্যাত্মিক বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। উহা যে খৃষ্টানসম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক বিবাহ হইতে স্বতন্ত্র, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। এই বিবাহের পরে পতি ও পত্নী আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের চরণে আত্মোৎসর্গ করিবেন। এজন্য এই অনুষ্ঠানে অধিকারী ভেদ আছে। যাঁহারা প্রবৃত্তির উপর জয়লাভ করিয়া পবিত্রচিত্তে ব্রহ্মচর্য্যব্রত-পালনে সমর্থ, তাঁহাদের পক্ষেই এই ব্রত গ্রহণীয়, অন্যের পক্ষে নহে।

প্রকাশচন্দ্র ও অঘোরকামিনী আজ এই কঠোর ব্রতই গ্রহণ

করিবেন—তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিবাহ সম্পন্ন হইবে। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরই আজ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের হৃদয় স্পর্শ করিলেন। দুজনের আত্মা কিছুক্ষণের জন্য সমস্ত পার্থিব ভাবের অতীত হইল। তাঁহারা মস্তক মুণ্ডন করিলেন। তাহার পরেই গভীর উপাসনা। উপাসনান্তে তাঁহাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের সুপবিত্র অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

আধ্যাত্মিক বিবাহের পরে দেবী অঘোরকামিনীর পার্থিব সুখের লালসা যেন চরণতলে ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে লাগিল। তিনি বৈরাগ্য ও পবিত্রতার আলোকে ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এই সময়ে তিনি গৃহে সন্তানদিগের কাছে ও গৃহের বাহিরে বন্ধুদিগের সঙ্গে প্রতিদিনের ব্যবহারে, কতটা বৈরাগ্য, অনাসক্তি ও নিস্বার্থভাবের পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন, সে বিষয়ে দুই একটি ঘটনার উল্লেখ করিব।

অঘোরকামিনীর কনিষ্ঠা কন্যার নাম সরোজিনী। তাঁহার বয়স এগার বৎসর। এই অল্পবয়স্কা বালিকার কঠিন পীড়া হইল। তাঁহার বাঁচিবার আর কোন আশাই রহিল না। তাই জননী তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন—"বল ত মা, এখন তোমার কি ইচ্ছা হয়?" বালিকা বুঝিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর আর বেশি বিলম্ব নাই। তাই সে বলিল—"আমার যে একটি সোনার হার আছে, সেটি একবার গলায় পরাইয়া দাও।" মাতা কন্যার গলায় সোনার হার পরাইয়া দিলেন। কন্যা অতি অল্প সময় স্বর্ণহার গলায় রাখিয়া, আবার উহা জননীর হস্তে অর্পণ করিল এবং কহিল—"মা, এ হার তুমি রাখিয়া দাও, আমার ছোট ভায়েরা গলায় পরিবে।"

কন্যার কথা শুনিয়া প্রকাশচন্দ্রের চোখ-দিয়া এক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অঘোরকামিনী তাহা দর্শন করিয়া স্বামীকে তাঁহার

অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন এবং আড়ালে গিয়া কহিলেন—"এ সময় তুমি যদি দুর্ব্বলতা দেখাও, তাহা হইলে কন্যার প্রতি যে কর্ত্তব্য, তাহা ত পালন-করা হইবে না।" ধর্ম্মশীলা নারী তখনই স্বামীকে সঙ্গে লইয়া উপাসনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। উপাসনা ও প্রার্থনাতে দুজনেরই মন সবল হইয়া উঠিল। তাঁহারা অচঞ্চলচিত্তে কন্যার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। ঈশ্বরের করুণায় বিপদ কাটিয়া গেল।

এই সময়ে অঘোরকামিনীর বৈরাগ্য, সেবা ও অনাসক্তি এবং তৎসঙ্গে তাঁহার গৃহকার্য্যে নৈপুণ্য ও সন্তানদের প্রতিপালনে তৎপরতা দেখিয়া, প্রকাশচন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছেন—"গৃহস্থ-বৈরাগিনী।" প্রকাশ-চন্দ্রের যে ভাষা নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছিল, সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। তখন গৃহস্থ-বৈরাগিনী কি-রকম-ভাবে উপাসনা ও গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, সে বিষয়ে তাঁহার স্বামীর রচনা হইতেই গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিব। প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন—"দেবি, এই সময়ে আমাদের দৈনিক জীবন কিরূপ কার্য্যময় ছিল, তাহা কি স্মরণ কর না? প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পূর্ব্বে তুমি আমার সহিত মাতৃস্তোত্র পাঠ করিতে। তার পর তুমি স্বহস্তে উপাসনার ঘর প্রস্তুত করিতে। এ কাজ অন্যের উপর ফেলিয়া রাখিতে না। নিষ্ঠার সহিত আসন পাতিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিতে। উপাসনার পর প্রতিদিন একটি ছোট প্রার্থনা করিতে। তার পরেই রন্ধনশালার কাজে যাইতে। ছেলেদের আহার করাইতে ও পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। নিজেরই রন্ধন করিতে হইত। * * ইহার মধ্যেই কোন সময়ে প্রতিবেশী দুই তিনটি গৃহস্থের সংবাদ লইতে এবং সাধ্যমতে তাহাদের অভাব দূর করিতে চেষ্টা করিতে। বৈকালে কিছু পাঠ করিতে, কোথাও যাইবার হইলে যাইতে। সন্তানদের আহার পরিচ্ছদ তুমি

সর্ব্বদাই নিজে দেখিতে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই রাত্রির আহারের আয়োজন হইত এবং ছোটদের আহার করাইয়া পড়িবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে। তার পর আমরা দুজনে নামগান করিতাম। আহারাদির পর আবার প্রসঙ্গ হইত। ইহা ভিন্ন স্নানের বিশেষ নিয়ম ছিল।"

আমার এই রচনার মধ্যে সকলেই হয় ত একটি বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন। আমি সর্ব্বত্রই অঘোরকামিনীর কথা বলিতে গিয়া তাঁহার স্বামীর নামোল্লেখ করিতেছি। করাই প্রয়োজন। নির্ঝরিণী যেরূপ নদীর সঙ্গে আপনাকে মিশাইয়া ফেলে, আর তাহার স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব থাকে না। তেমনি অঘোরকামিনী যেন তাঁহার স্বামীর জীবনের সঙ্গে আপনার জীবন মিশাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার আর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না। তিনি ও তাঁহার স্বামী দুজনে এক সঙ্গেই ভক্তির সাধনা ও সেবার কার্য্য করিতেন। সুতরাং পতির সমস্ত কথা ত্যাগ করিয়া শুধুই পত্নীর কথা বলা এক রকম অসম্ভব। ইহা মোটেই কল্পনার বা ভাবের কথা নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আত্মোৎসর্গ

দেবী অঘোরকামিনী ঈশ্বরের ইঙ্গিতেই অনুভব করিয়াছিলেন যে, আরাধনা, ধ্যান, প্রার্থনা ও নামগানই বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। তাই তিনি আজীবন উপাসনা অবলম্বন করিয়াই সাধন করিয়াছেন। এখন সেই উপাসনা তাঁহার রক্তের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এজন্য একদিন সত্য উপাসনা না

হইলে তাঁহার আর দিন চলিত না। দৈবাৎ যে দিন তাঁহার এই উপাসনা নীরস হইত, আরাধনায় মন বসিত না, ধ্যানের মধ্যে আত্মা ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করিত না, মর্ম্মস্থান হইতে সরল ও অকৃত্রিম প্রার্থনা বাহির হইত না ; তিনি সে দিন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। কোন্ অপরাধের জন্য উপাসনা খাঁটি হইতেছে না, কেন অন্তর হইতে সরল প্রার্থনা বাহির হইতেছে না, তাহা ভাবিয়াই অধীর হইতেন।

অঘোরকামিনী দেবীর উপাসনার প্রতি এই যে অনুরাগ, ইহা স্বয়ং কেশবচন্দ্র লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। অঘোরকামিনী একবার কলকাতায় গমন করিয়া মাঘোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তখন আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে প্রচ্ছন্ন ধর্ম্মানুরাগ কেশবচন্দ্রের তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক-দৃষ্টির কাছে ধরা পড়িয়াছিল। তাই তিনি কলিকাতার কয়েকটি ব্রাহ্মমহিলাকে বলিয়াছিলেন—"নূতন যে মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনায় অনুরাগ শিক্ষা কর।" অঘোরকামিনী উৎসবান্তে কেশবচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া যখন বিদায় গ্রহণ করিলেন, তখন তিনি বলিলেন—"আমাকে ভুলিবেন না।" কেশবচন্দ্র কহিলেন—"আর কি ভোলা যায় ?"

ভক্তিমতী নারী যতই উপাসনার অতলস্পর্শ ভাবের মধ্যে ডুবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার জীবন বিশ্বাসে উজ্জ্বল ও হৃদয় প্রেমে মধুময় হইতে লাগিল। এই সময়ে তাঁহার ও প্রকাশচন্দ্রের ভক্তিরসোচ্ছ্বাসপূর্ণ শুদ্ধ-সুনির্ম্মল জীবনের কথা শুনিয়া অনেক ধর্ম্মপিপাসু লোক তাঁহাদের গৃহে উপস্থিত হইতেন। পতিপত্নী দুজনেই সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতেন। সময় সময় শোকার্ত্ত ও তাপিত নরনারী জুড়াইবার

আশায় তাঁহাদের গৃহে আসিয়া বাস করিত। প্রকাশচন্দ্র ও অঘোর-কামিনীর উপাসনায়, সান্ত্বনাবাক্য এবং সুমিষ্ট ব্যবহারে তাহাদের প্রাণ জুড়াইয়া যাইত।

অতঃপর দেবী অঘোরকামিনীর অন্তরে জগজ্জননীর আদেশবাণী আসিয়া পৌঁছিল। তাঁহাকে বিশ্বমাতার সেবিকা কন্যা হইয়া নারীজাতির কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি সেজন্য সংকল্প গ্রহণ করিলেন। বাঁকিপুরেই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট হইল। অঘোরকামিনী বেহার অঞ্চলের নারীদিগের সুশিক্ষার জন্য একটি বোর্ডিং ও ভাল একটি স্কুল করিবেন।

সকলেই জানেন, বেহার প্রদেশের স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা খুব ভাল নয়। তাঁহাদের চেয়ে বাঙ্গালাদেশের মেয়েদের অবস্থা অনেক উন্নত। এমন কি বেহার অঞ্চলে যে সকল বাঙ্গালী বাস করেন, তাঁহাদের মেয়ে-দিগের সুশিক্ষার জন্যও বিশেষ কোন আয়োজন দেখা যায় নাই। এখন বাঁকিপুর সহরে মেয়েদের যে উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি স্কুল দেখা যাইতেছে ও বৎসর বৎসর মেয়েরা যে সেই স্কুল হইতে ম্যাট্রিক্যুলেসন পরীক্ষা দিয়া পাশ হইতেছেন, তাহার মূলে এই ঈশ্বরের সেবিকা অঘোরকামিনী দেবীর সেবাব্রত।

কিন্তু তিনি যে স্কুল ও বোর্ডিং খুলিবেন, তাঁহার ত তেমন শিক্ষা নাই, বোর্ডিং সম্বন্ধে কোনই অভিজ্ঞতা নাই, অর্থেরও সংস্থান নাই;—স্কুল-বোর্ডিং চালাইবেন কেমন করিয়া? মনস্বিনী নারী এখন সংকল্প করিলেন, তিনি সেই প্রৌঢ়বয়সেই লক্ষ্ণৌ গমন করিয়া মিস্ থোবর্ণের স্কুলে ভর্ত্তি হইবেন এবং স্কুল ও বোর্ডিং চালাইবার মত শিক্ষা লাভ করিবেন; তৎপরে তাঁহার অভিলষিত স্কুল ও বোর্ডিংয়ের কার্য্য আরম্ভ হইবে।

ব্রতধারিণীর এই সংকল্পের কথা শুনিয়া সকলেই ত অবাক্। অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—"সে কি কথা? আপনার ঘর-সংসার ও ছেলেদের ফেলিয়া কোথায় যাইবেন? এই বয়সেও কি মেয়েদের কাছে গিয়া লেখাপড়া শিক্ষা করা সম্ভব?" তাঁহারা তখনো এই তেজস্বিনী মহিলাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই। তিনি বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে বটে; কিন্তু প্রকৃতিমাতা তাঁহাকে শক্তিদান করিতে কিছুমাত্র কৃপণতা করেন নাই। দেবী অঘোরকামিনী একবার স্বামীর সঙ্গে দেশভ্রমণে বাহির হইয়া, চিত্রকূট গমন করিয়াছিলেন। সেখানে চলিবার জন্য ঘোড়া পাওয়া গেল। তিনি তাহার পূর্ব্বে কোন-দিনই ঘোড়ায় চড়েন নাই। কিন্তু সে দিন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে, তিনি একটুকু ভীত বা সঙ্কুচিত হইলেন না;—বীরাঙ্গনার ন্যায় অশ্বা-রোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এই ধর্ম্মশীলা নারী এখন সুদূর লক্ষ্ণৌসহরে গমন করিয়া, যশস্বিনী কুমারী থোবর্ণের স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

কুমারী থোবর্ণের স্কুলের সঙ্গেই বোর্ডিং ছিল। অঘোরকামিনী বোর্ডিংয়েই বাস করিতে লাগিলেন। ইংরাজমহিলা থোবর্ণ এই নূতন রকমের বাঙ্গালী স্ত্রীলোকটির সংকল্পের বল, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মবিশ্বাস দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার নূতন ছাত্রীর প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—"মিসেস রায়, আপনি বোর্ডিংয়ে থাকিবেন বটে, কিন্তু আপনাকে এ বয়সে বোর্ডিংয়ের সমস্ত নিয়ম পালন করিবার কোন প্রয়োজন নাই। এ বিষয়ে আপনার স্বাধীনতা থাকিবে।" মিসেস্ রায় কহিলেন—"তাহা হইবে না। আমি যখন শিক্ষার্থিনী হইয়া আসিয়াছি, তখন আপনাদের প্রত্যেকটি নিয়মই পালন করিব।"

অঘোরকামিনী দেবী স্কুলে ইংরাজী ও হিন্দি শিক্ষা করিতেন। বেহার অঞ্চলে স্কুল ও বোর্ডিং চালাইতে হইলে এই দুইটি ভাষাই শিক্ষা করা প্রয়োজন। তিনি এই শিক্ষার জন্য প্রত্যহ চৌদ্দ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতেন। এই অনভ্যস্ত অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের জন্য তাঁহার শরীর ভাঙ্গিতে লাগিল। কিন্তু তিনি পরিশ্রম করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেই উপাসনার ঘরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে তাঁহার শক্তি-দায়িনী জগজ্জননীর একটুকু স্পর্শ পাইলেই দেহ ও মনের অবসাদ দূর হইত; তিনি আবার পরিশ্রম করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেন।

ভক্তিমতী নারী লক্ষ্ণৌ বাস করিয়া শুধু যে সেবার জন্যই প্রস্তুত হইতেছিলেন, তাহা নহে; তিনি আরো বিশ্বাস লাভ করিবার জন্য, আরো ভাল করিয়া ধর্ম্মসাধন করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তাঁহার একখানি উৎকৃষ্ট চিঠি আছে। আমরা সেই চিঠির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। তিনি প্রকাশচন্দ্রকে লিখিতেছেন—

"দেখ, মনে হইতেছে আরও খাঁটি বিশ্বাসী না হইলে জগৎ আমাদের বিশ্বাস করিবেন না। হাড়ের পরমাণু সকল যেন এখনও সেই খাঁটি সত্য বলিতে পারে না। কবে আমার হাড় বলিবে—"সত্যম্ সত্যম্" ? যে-দিন তাই হইবে, জগৎকে বিশ্বাস করিতেই হইবে। জননি, সেইদিন আনিয়া দাও, এই প্রার্থনা আজ ছিল। মায়ের কার্য্যের জন্য যে কাহারো নিকট ভিক্ষা কর নাই, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু ইচ্ছা করে মায়ের সেবার জন্য ভাইবোন সকলেই ধনপ্রাণ দান করেন। আহা, কবে আমি তোমার হইতে পারিব? এখনও প্রকাশ, তোমার উপযুক্ত হইতে পারি নাই। সত্যই বলিয়াছি, এবার দূর নিকট হইয়াছে; এ যদি না হইত, বিশেষ কষ্ট হইত। আর ত দূর নাই। প্রতিদিন ৪ ঘণ্টার সময় নাম জপ করি, আশ্চর্য্য লীলা দেখি।"

এই সময়ে কয়েকটি ঘটনায় অঘোরকামিনী দেবীর অটল বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞার বলের পরিচয় পাওয়া গেল। আমরা শুধুই একটি ঘটনা বিবৃত করিব। হঠাৎ খবর আসিল, তাঁহার বড় ছেলে স্থবোধের কঠিন পীড়া, অবস্থা বড়ই খারাপ। এই স্থবোধ এখন কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার মিষ্টার এস, সি, রায়। কিন্তু তখন তাঁহার অল্প বয়স। কোন জননীই ছেলের এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শুনিয়া দূরে থাকিতে পারেন না। কিন্তু অঘোরকামিনী দেবীর কথা স্বতন্ত্র। তিনি স্নেহের শত আকর্ষণেও সংকল্পচ্যুত হইতেন না। তাই তিনি প্রিয় পুত্রের সকল ভার ঈশ্বরের হস্তেই অর্পণ করিলেন; নিজে লক্ষ্ণৌসহরে বাস করিয়া আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মশীলা নারী তাঁহার ডায়েরিতে লিখিতেছেন—"স্থবোধের অস্থখের সংবাদে মা'র কোলে লুকাইলাম। বড়ই আরাম।"

তৎকালে অঘোরকামিনী দেবী লক্ষ্ণৌ হইতে স্বামীর নিকট যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহা তাঁহার হৃদয়ের স্থধাধারায় রসসিক্ত হইয়া উঠিত। ঐ সকল পত্র পাঠ করিলে সাধ্বী নারীর স্বামীর প্রতি যে কি ভক্তি, কি গভীর প্রেম ও বিশ্বজননীর সেবার জন্য যে তাঁহার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাহা সহজেই অনুভব করা যায়। একখানি চিঠির কিয়দংশ এই :—

"তুমি যাহা বলিয়া দিবে, এ দাসী প্রাণদিয়া তাহা করিতে চেষ্টা করিবে। এতদিন তবু ভিন্ন ছিলাম, এখন যে আমরা (আধ্যাত্মিক ভাবে) বিবাহিত হইয়া একটি হইয়াছি। আর কি কঠিন কাজ মা দিবেন যা আমরা পারিব না? না পারি, করিতে করিতে ত যাইতে পারিব? * * যদি আমার দ্বারা তাঁহার কাজ করাইতে ইচ্ছা হয়, অবশ্যই পারিব। * * সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে

না? * * তোমার সাধ পূর্ণ করিবার জন্য মা যে এ জীবন কিনেছেন যখন ভাবি, তখন যে কি সুখ পাই, তোমাকে কি বলিব। * * যতই নিকট হইতেছি ততই আরও নিকট হইতে ইচ্ছা হয়। নৈকট্যের কি শেষ নাই?"

"সমস্ত রক্ত দিলেও কি মার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না?" নারীর এই একটি কথা পড়িতে পড়িতে মনের মধ্যে যেন ভাবের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। এ দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণ যদি এইরূপে ঈশ্বরের কার্য্যে ও নরনারীর সেবায় শরীরের শক্তি অর্পণ করিতে চাহেন, তাহা হইলেই সমাজের যথার্থ কল্যাণ হইবে।

লক্ষ্ণৌ বোর্ডিংয়ের কর্ত্রী থোবর্ণ ঈশ্বরের কার্য্যে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন; ভারতবর্ষের নারীদিগের কল্যাণসাধনই তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি তাঁহার ছাত্রীর জ্বলন্ত বিশ্বাস, জীবন্ত ধর্ম্মভাব ও নিঃস্বার্থ সেবার আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। তাই সেই বিদেশিনী মহিলা এক একদিন প্রাণের আবেগে অঘোরকামিনী দেবীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিতেন।

পতিব্রতা নারী বোর্ডিংয়ে বাস করিবার সময়ে কোন রকম উৎকৃষ্ট দ্রব্যই খাইতেন না। খাওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবই নয়। তাঁহার নিয়মই ছিল, স্বামী না খাইলে তিনি কোন ভাল জিনিস খাইবেন না। একদিন একটি ইংরাজ মহিলা বড়ই ভালবাসিয়া তাঁহাকে অনেকগুলি সুমিষ্ট আঙ্গুর উপহার দিয়াছিলেন। তিনি সেই রমণীর সম্মান রক্ষা করিবার জন্য একটি আঙ্গুর একটু মুখে রাখিলেন মাত্র—খাইতে পারিলেন না। ইংরাজ মহিলা এই দৃশ্য দর্শন করিয়া বলিলেন—"মিসেস রায়, তুমি নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে পাইয়াছ, কিন্তু আমাকে ভুলিও না।"

শিক্ষার্থিনী অঘোরকামিনীর শিক্ষা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তিনি

কিছু ইংরাজী, কিছু হিন্দি শিখিয়াছেন এবং কিণ্ডারগার্টেন-শিক্ষাপ্রণালী-বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত শিক্ষার হিসাবে ইহা যে খুব সামান্য, তাহা খুব সত্য। কিন্তু তিনি বিদেশিনী রমণীদিগের সংসর্গে বাস করিয়া নানা বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে নিতান্ত সামান্য নয়। তাই তিনি বাঁকিপুরে আপনার কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই সময়ে ভবিষ্যতের কার্য্যকল্পনায় কর্ম্মিষ্ঠা নারীর প্রাণের ভাব উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

"এই ত কাজের বুনিয়াদ পড়িল। কত কাজ যে করিতে হইবে বলিতে পারি না। কেমন করিয়া হইবে, তাহাও জানি না; কিন্তু করিতেই হইবে। একটি উপসনার গৃহ, একটি মেয়েদের স্কুল, একটি পীড়িতাশ্রম, একটি ছাত্রাশ্রম স্থাপন করিতে হইবে। স্কুলটি ত অতি শীঘ্র করিতে হইবে। * * এখন বুঝিতেছি, জ্ঞানের কত প্রয়োজন। কত মেয়ে এই জ্ঞানের অভাবে ব্রাহ্মসমাজে জড়ের মত আহার নিদ্রায় দিন কাটাইতেছেন। টাকার জন্য আমরা কোনদিন ভাবি নাই, ভাবিবও না। যদি সত্য মায়ের কাজ অঘোর-প্রকাশ করিতে পারে, নিশ্চয় কোন অভাব থাকিবে না।"

অঘোরকামিনী দেবী লক্ষ্ণৌ হইতে বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলেন। একদল পুরুষ ও মহিলা তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ধর্ম্মশীলা নারীর চিত্ত কিসের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল? তিনি গৃহে আসিয়াই সর্ব্বাগ্রে আপনার প্রিয় উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে বিশ্বজননীর সেবার জন্য শিক্ষালাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন, ক্ষণকাল তাঁহারই আবির্ভাবের মধ্যে চিত্ত নিমগ্ন রাখিলেন। তাঁহার সমস্ত পরিশ্রমই সার্থক মনে হইতে

লাগিল। সে দিন উপাসনার ঘরখানি হরিদ্বর্ণ লতায়, সবুজ পত্রে ও প্রস্ফুটিত কুসুমরাশিতে সুসজ্জিত করা হইয়াছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পরীক্ষা ও পরসেবা

অঘোরকামিনী দেবী ত লক্ষ্ণৌ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু কে জানিত তাঁহার সম্মুখে ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে? সেই পরীক্ষার মর্ম্মান্তিক কাহিনী বিয়োগান্ত উপন্যাসের চেয়েও করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী। আমি খুব সংক্ষেপে সেই ঘটনাটি বর্ণনা করিব।

অঘোরকামিনীর বড় মেয়ের নাম সুসারবাসিনী। আমার সঙ্গে তাঁহার আলাপ ছিল। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। তিনি শ্রদ্ধারই যোগ্যপাত্রী। এই সুসারের যখন বিবাহের বয়স হইল, তখন পিতামাতা পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব জানিতে চাহিলেন। সুসার একটু কাগজে লিখিয়া দিলেন—

"আমি বৃন্দাবনকে ভাল বাসি।"

বৃন্দাবন একটি সচ্চরিত্র যুবক। সম্প্রতি হিন্দু সমাজ হইতে আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিয়াছে। প্রকাশচন্দ্র বৃন্দাবনকে বেশ ভাল ছেলে বলিয়াই জানিতেন। সুতরাং বৃন্দাবনের হস্তে কন্যা সমর্পণ করিতে তাঁহার কোন আপত্তি হইল না। দেবী অঘোরকামিনী কন্যার হৃদয়ের ভাবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া বিবাহের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু হিন্দু-সমাজের আত্মীয়েরা এই বিবাহের ভয়ানক বিরোধী। বিরোধী হইবার কারণ, বৃন্দাবন উচ্চ বংশের ছেলে নয়।

তবুও প্রকাশচন্দ্র ও তাঁহার পত্নী কোমলহৃদয়া কন্যার মনোবাসনাই পূর্ণ করিলেন। বৃন্দাবনের সঙ্গেই সুসারের বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু এই বিবাহের পরিণাম চিন্তা করিলে চোখে আর জল রাখা যায় না। বৃন্দাবন ব্রাহ্মসমাজ হইতে সরিয়া পড়িল, পতিপরায়ণা স্ত্রীকেও ত্যাগ করিল; পুনর্ব্বার একটি বিবাহ করিতেও লজ্জাবোধ করিল না।

অঘোরকামিনী লক্ষ্ণৌ হইতে ফিরিয়া আসার পরে, সুসার তাঁহার জীবনের এই দুর্ঘটনার কথা শুনিতে পাইলেন। তখন সুসারের প্রাণে যে কতখানি বাজিল, মর্ম্মের কোন্ শিরা ছিন্ন হইয়া যে রক্ত ঝরিতে লাগিল, তাহা স্নেহময়ী জননী ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারিবে? এই পরীক্ষার সময়ে জননী কন্যাকে হৃদয়ে লইয়া লোকমাতা ব্রহ্মময়ীর করুণার মধ্যে ডুবিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জগজ্জননী ব্যতীত কে আর উপেক্ষিতা নারীর জ্বালাময় হৃদয় জুড়াইয়া দিতে পারেন?

বৃন্দাবনের বিবাহ তিন আইন অনুসারে রেজিষ্ট্রারী হইয়াছিল। আদালতে নালিশ করিলেই তাঁহাকে জেলে যাইতে হইত। কিন্তু কে নালিশ করিবে? সুসার কি সেই রকমের মেয়ে? তিনি স্বামীর বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করিলেন না, নিজের অদৃষ্টকেও ধিক্কার দিলেন না; স্বামীর প্রতি যে প্রেম, সেই প্রেমের প্রতি উপেক্ষায় যে ক্লেশ—সুসার এই উভয়কেই মর্ম্মস্থানে চাপিয়া রাখিয়া বিশ্বজননীর সেবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। অবশেষে মাতার মৃত্যুর পরে তিনিই ব্রতধারিণী হইয়া তাঁহার অসমাপ্ত কার্য্যই সমাপ্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময়ে মৃত্যু আসিয়া সুসারের জীবনকুসুম ছিন্ন করিয়া ফেলিল; ত্রিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই তিনি পরলোকে প্রস্থান করিলেন।

আজ আর সুসারবাসিনী এ পৃথিবীতে নাই; তাঁহার ডায়েরিগুলিই পড়িয়া আছে। তিনি ডায়েরির এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

"আজ আমার জীবনের কি দিন! আজ বৈকালে জানিলাম, স্বামী পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন। কি আঘাত! ভাবিয়া দেখিলাম, আজ যদি আমার পরমজননীর সান্ত্বনা-ক্রোড় না পাইতাম, কাঁদিয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিতাম। কেবল জগজ্জননী আশ্রয় ভেবে আমি আজ খাড়া হয়ে রয়েছি।"

"১৯শে নবেম্বর ১৮৯১। আজ আমার স্বামীর জন্মদিন। মার চরণে শত শতবার কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দিলাম যে তিনি আজ ২৬ বৎসরে পড়িলেন। * * জগন্মাতা, অসহায়ের মাতা, দুর্ব্বলের মাতা কখনও সেই দুর্ব্বল এবং অসহায় সন্তানকে ছাড়িবেন না। তাঁর এই নবজীবনের দিনে তাঁকে মা আপনার দিকে টানিয়া লউন।"

নারীর কি বলিষ্ঠ প্রেম! যে স্বামী চারি বৎসর তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তিনি তাঁহারই কল্যাণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন!

অঘোরকামিনী এই পরীক্ষার পর ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া, তাঁহার করুণাই সম্বল করিয়া সেবার ক্ষেত্রে নামিয়া দাঁড়াইলেন। সর্ব্বাগ্রে বাঁকিপুরের পুরাতন বালিকা স্কুলটির ভারই তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। খ্যাতনামা উকিল গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু উহার অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়াছিল। শিক্ষয়িত্রী কাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, স্কুলে দশটির অধিক ছাত্রীও উপস্থিত হইত না। অথচ এই ভাঙ্গা স্কুলটি পাইয়াই অঘোরকামিনী দেবীর মনে আর আনন্দ ধরে না। তিনি বলিলেন—"টাকা নাই? আমি যেমন করিয়া পারি টাকার যোগাড় করিব। ছাত্রী নাই? আমি নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়া এবং দেশবিদেশে ঘুরিয়া ছাত্র সংগ্রহ করিব। আমার শিক্ষয়িত্রীরও অভাব হইবে না।"

যে নারীর এমনই উৎসাহ, এমনই সংকল্পের বল, ঈশ্বর যে তাঁহার সাধুকার্য্যের সহায় হইবেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। বাস্তবিক তাহাই হইল। অঘোরকামিনী দেবী ১৫ই ফেব্রুয়ারী স্কুলের ভার গ্রহণ করিলেন, মার্চ্চ মাস যাইতে না যাইতে স্কুলে ২৯টি ছাত্রী উপস্থিত হইতে লাগিল। তাঁহার প্রাণপণ চেষ্টায় পোনরটি হিন্দুস্থানী মেয়েও স্কুলে ভর্ত্তি হইল। এই সকল হিন্দুস্থানী মেয়ের স্কুলে আসা যে কঠিন ব্যাপার, বাঙ্গালাদেশের লোকেরা তাহা ধারণাও করিতে পারিবেন না।

সেবাপরায়ণা নারী স্কুলের কার্য্যে হস্তার্পণ [illegible] নিজের গৃহকেই মেয়েদের বোর্ডিংয়ে পরিণত করিলেন। মেয়েরা তাঁহার সংসর্গে বাস করিলে তাহাদের শিক্ষাও ভাল হইবে, জীবনও ভাল হইবে, এই জন্য বিদেশের অনেক পরিচিত ব্যক্তি তাঁহার বোর্ডিংয়ে মেয়ে পাঠাইতে লাগিলেন। অঘোরকামিনী আপনার কন্যাকেও বোর্ডিংয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। তিনি নিজে ইহাকে বোর্ডিং বলিতেন না, "পরিবার" বলিতেন। তাই তাঁহার মৃত্যুর পরে এই বোর্ডিং "অঘোর-পরিবার" নামে পরিচিত হইয়াছিল। ইহাকে বোর্ডিং বলাও বোধ হয় সঙ্গত হইত না। কারণ, মেয়েদের অভিভাবকেরা যিনি যাহা দিতেন, অঘোরকামিনী তাহাই ঈশ্বরের দান বলিয়া গ্রহণ করিতেন; টাকাকড়ির জন্য কাহারো উপর কোন রকম চাপ দেওয়া হইত না। বোর্ডিংয়ের খরচের জন্য যে টাকার অকুলন হইত, তাহা প্রকাশচন্দ্র আপনার উপার্জ্জিত অর্থ হইতেই পূরণ করিয়া দিতেন। এ সময়ে তিনি ও তাঁহার পত্নী আপনার গৃহকে বোর্ডিংয়ে পরিণত না করিলে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ব্যাপার কিছুতেই সুসম্পন্ন হইত না এবং বাঁকিপুরের বালিকা বিদ্যালয়টিকে এণ্ট্রেন্স স্কুলে পরিণত করাও অসম্ভব হইত।

স্কুলটির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই অঘোরকামিনী দেবীর পরিশ্রম অতিশয় বৃদ্ধি হইল। এই সময়ে তিনি যেন একাই দশজন হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে যে কত কাজই করিতে হইত, ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। পাছে বা সময় একটি মুহূর্ত্তের জন্যও ফাঁকি দিয়া চলিয়া যায়, সেজন্য তিনি ঘড়ির কাঁটা দেখিয়া কাজ করিতেন। তাঁহাকে বোর্ডিংয়ের বালিকাদের ও নিজের ছেলেদের পড়াশুনার ও আহারাদির তত্ত্বাবধান করিতে হইত, কাহারো অসুখ হইলে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার বন্দোবস্ত করিতে হইত। তিনি স্কুলে গমন করিয়া নিম্নশ্রেণীর বালিকাদিগকে পড়াইতেন, ছোট ছোট মেয়েদের খেলার সঙ্গিনী হইয়া কিণ্ডারগার্টেন-প্রণালী অনুসারে তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন, বড় মেয়েদের রান্না শিখাইতেন, হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকদিগের বাড়ী বাড়ী গিয়া অনেক বলিয়া কহিয়া মেয়ে সংগ্রহ করিতেন। তাহা ছাড়া স্কুলসংক্রান্ত সমুদয় বন্দোবস্ত তাঁহাকেই করিতে হইত। তবে এ বিষয়ে স্বদেশহিতৈষী গুরুপ্রসাদ সেন মহাশয় তাঁহার সাহায্য করিতেন এবং সকল কার্য্যেই তাঁহার ডান হাত ছিলেন স্বয়ং প্রকাশচন্দ্র।

অঘোরকামিনী দেবীর যে সকল কাজের উল্লেখ করা হইল, তাহা ছাড়া তাঁহার নিয়মিত সাধন ত ছিলই; উপাসনা, ধ্যান, আত্মচিন্তা, নামজপ, ধর্ম্মগ্রন্থপাঠ—এ সকল প্রতিদিনই তিনি নিষ্ঠার সহিত করিতেন। সে বিষয়ে তাঁহার একটুকু শৈথিল্য দেখা যায় নাই। তিনি তাঁহার প্রাণের ঈশ্বরের সঙ্গে প্রেমযোগে যুক্ত হইতেন এবং তাঁহার নিকট হইতেই শক্তিলাভ করিতেন। সেই শক্তিতেই তাঁহার প্রাণ সবল হইত, উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত, তিনি বহু কার্য্যে হস্তার্পণ করিতেন। কিন্তু তবুও তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। এজন্য প্রকাশচন্দ্র চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন অঘোরকামিনী স্বামীকে লিখিলেন—

"মা চিণ্ময়-যোগে যুক্ত করুন, আর কিছু চাই না। আমার জন্য ভাবিও না। যতদিন থাকিবার ও কাজ করিবার দরকার, ততদিন নিশ্চয় এ দেশে থাকিব। * * যখন কাজ আসে, তখন যেন কোথা হইতে বলও আসে। আমি ভাবিয়া আশ্চর্য্য হই যে আমি কেমন করিয়া এত পারি।"

হায়, আজ বিশ্বজননীর সেবিকা কন্যা অঘোরকামিনী দেবী কোথায়? তিনি বাঁচিয়া থাকিলে দেখিতে পাইতেন, যে স্কুলের জন্য তাঁহার শরীর ক্ষয় হইয়া গেল, এখন সেই স্কুলের অবস্থা কতই উন্নত। সমস্ত বেহার অঞ্চলের মধ্যে এখন উহাই মেয়েদের একমাত্র উচ্চশ্রেণীর ইংরাজি-বিদ্যালয়। সুবৃহৎ সহরের মধ্যে এখন ঐ স্কুল ও বোর্ডিং পুণ্যশীলা নারীর স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

অঘোরকামিনী দেবী যখন বাঁচিয়াছিলেন, তখনই সহরবাসী অনেক ভদ্রলোক ও কোন কোন রাজপুরুষ এই মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহার যশোকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরের কমিশনার মাননীয় বোল্টন সাহেব বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের চীফ্ সেক্রেটারী হইয়া কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে মেয়েদের স্কুলটি দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্কুল দেখিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে অঘোরকামিনী দেবীকে কহিলেন—"স্কুল দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। বিলাতে এ সকল কাজ কুমারী অথবা বিধবারাই করিয়া থাকেন। স্বামী পুত্র লইয়া এত কাজ যে হাতে লইয়াছেন, এমন আর দেখি না।" ইহার পরে গবর্ণমেণ্ট স্কুলটির জন্য মাসে মাসে অর্থসাহায্য করিতেন।

কিন্তু এই সকল কার্য্য করিয়াও অঘোরকামিনী দেবীর সেবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই। সহরের কোন বাঙ্গালীর অথবা হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের বাড়ীর কোন মেয়ে রোগের জ্বালা সহ্য করিতেছেন, অথচ

সেবাশুশ্রূষা হইতেছে না;—এ কথা শুনিলেই তিনি আর সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার বিশ্বজননীই সেবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন, ইহা মনে করিয়া তিনি পীড়িতা রমণীর গৃহে গমন করিতেন। ভক্ত প্রকাশচন্দ্র পত্নীর এই সেবা লক্ষ্য করিয়া লিখিয়াছেন—"তোমার কাছে এ সময় যেমন বড মানুষের বাড়ী, তেমনি দুঃখিনী বিধবার পর্ণকুটীর। সংবাদ পাইলেই দুঃখ দূর করিবার জন্য দৌড়িতে। শেষে যখন এই সেবার কাজ অনেক বাড়িয়া চলিল, আমার কাছে সব সময় জিজ্ঞাসা করিবারও অবসর পাইতে না। কতদিন আমার অজ্ঞাতসারে কত রোগীর সেবা করিতে চলিয়া গিয়াছ। একদিন রাত্রি দুইটার সময় আমার শয্যার পাশে দাঁড়াইয়া বলিলে—'আমি যাই।' চক্ষু খুলিয়া দেখি, তুমি আপনার মোটা সজ্জায় সজ্জিত। আমি বলিলাম, এই শীতের রাত্রিতে কোথায় যাইবে? তুমি বলিলে, "বিধবা ব্রাহ্মণীর পুত্র বড়ই পীড়িত, দেখিতে যাইব।" ব্রাহ্মণীর আর কেহই নাই, একমাত্র পুত্র এফ্-এ, পাশ করিয়াছিল। সেই পুত্র এখন, তখন যায় যায়। সন্ধ্যার সময় তুমি সেবা করিতে গিয়াছিলে। চিকিৎসার্থে পরেশ বাবুকে ডাকাইয়াছিলে। * * অনুমতি পাইবামাত্র অক্লেশে সেই ঘোর নিশাকালে পদব্রজে রোগীর সেবায় চলিয়া গেলে। সঙ্গে রোগীর বাটীর চাকর, তার হাতে লণ্ঠন। শেষরাত্রি চারিটার সময় রোগীর দেহান্ত হয়। শব গঙ্গাতীরে পাঠানো, বহনের জন্য ব্রাহ্মণ সংগ্রহ করা এ সব তোমাকেই করিতে হইল। বিধুরা মাতার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলে, একটু সরবত পান করাইয়া বাটী আসিলে। তখন বেলা ৯টা। বিদ্যালয়ে যাইবার সময় নিকটবর্ত্তী। উপাসনা করিয়া একটু দুধ খাইয়া বিদ্যালয়ে চলিয়া গেলে। আহারের সময় পাইলে না।"

বাঁকিপুরের একটি দরিদ্র যুবকের স্ত্রী সন্তান প্রসব করিয়া, সূতিকা-গৃহের মধ্যেই রোগে কাতর হইয়া পড়িলেন। এই মেয়েটি এক সময় স্কুলে পড়িতেন, অঘোরকামিনী দেবীরই ছাত্রী ছিলেন। তিনি ছাত্রীর রোগের সংবাদ শুনিয়া তাঁহার গৃহে গমন করিলেন। বালিকা তখন আঁতুড়ঘরের মধ্যেই জ্বরে কাতর হইয়া রোগে ছটফট করিতেছিল। ঘরখানি দুর্গন্ধময়, অপরিষ্কার ও সেঁতসেতে। অঘোরকামিনী দেবী সর্ব্বাগ্রে প্রসূতির গৃহ পরিষ্কার করিলেন; তাহার পরে ডাক্তার ডাকিলেন। কিন্তু চিকিৎসায় ও স্নেহময়ী নারীর শুশ্রূষায় কোনই ফল হইল না; বালিকার অন্তিম সময় উপস্থিত হইল। তখন বালিকা দেবী অঘোরকামিনীকে কহিলেন—

"মা, আমাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।"

দেবী। এখন ভগবানকে স্মরণ কর।

বালিকা। কাহাকে ডাকিব? কি বলিব?

দেবী। দয়াময় হরি, দয়াময় হরি—এই নাম কর।

বালিকার প্রাণ দেহপিঞ্জর শূন্য করিয়া অদৃশ্যরাজ্যে চলিয়া গেল।

দেশবিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্ম্মপ্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার প্রণীত "স্ত্রীচরিত্র-সংগঠন" গ্রন্থখানিতে লিখিয়াছেন—"অঘোর-কামিনী পরোপকার-ব্রতে এতাধিক অনুরাগিনী ও উৎসাহী হইয়া উঠিলেন যে অন্যের সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য হইয়া উঠিল। * * একদিন সমাচার আসিল বাঁকিপুরের কোন উচ্চ কর্ম্মচারীর পত্নী প্রসবশয্যায় পীড়িত অবস্থায় পড়িয়া আছেন, তাঁহাকে এবং তাঁহার রুগ্নশিশুকে সেবা করিবার কোন লোক নাই; কিন্তু শুনিবামাত্র তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। যদিও এই পরিবার তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি সমস্ত দিন ইঁহাদের সেবা করিলেন। কিন্তু

শিশুটিকে বাঁচাইতে পারিলেন না। * * অঘোরকামিনী প্রতি বৎসর অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু সঙ্গে করিয়া রাজগৃহ নামক বৌদ্ধতীর্থ পর্য্যটন করিতে যাইতেন। ধর্ম্মসাধন করাই এই পর্য্যটনের একমাত্র লক্ষ্য। দুই তিন দিন প্রবল উৎসাহে ধর্ম্মোৎসব করিতেন, গম্যপথে লোকদিগের নিকট প্রকাশ্য উপদেশ দান ও নগরসঙ্কীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে তিনি ধর্ম্মাত্মা স্বামীর সঙ্গে নিগূঢ় ভক্তি, নিষ্ঠা ও উচ্চতর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। ঈশ্বরোপাসনায় অঘোরকামিনীর অসামান্য ভক্তি দেখিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। * * তাঁহার পরসেবায় আত্মসমর্পণ, সৎকার্য্যে উৎসাহ, সংসারে বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি, পবিত্রতা, ধর্ম্মবিশ্বাস ও অসাধারণ ভক্তির কথা যে শুনিবে, তাহারই আহ্লাদ হইবে। শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় তাঁহাকে সহধর্ম্মিণীরূপে পাইয়া ধন্য হইয়াছেন, তিনি প্রকাশচন্দ্রকে পতিরূপে পাইয়া ধন্যা হইয়াছিলেন এবং আমরা তাহাদের উভয়কে শ্রদ্ধা প্রীতি অর্পণ করিয়া সুখী হইয়াছি, উপকৃত হইয়াছি, কৃতার্থ হইয়াছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মাতৃকোলে চির-বিশ্রাম

অঘোরকামিনী দেবীর শরীর ভগ্ন; কিন্তু তাঁহার মনে প্রবল উৎসাহ। তাই তিনি কিছুতেই কর্ম্মক্ষেত্র হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না। এ পৃথিবীতে তাঁহার আর বিশ্রাম করিবার সুবিধা হইল না। তিনি সেবার কার্য্য ত করিতেনই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সময় সময় ধর্ম্মপ্রচার করিতেন। একবার তিনি রাজগৃহ যাইবার পথে, বিহার নগরে ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে হিন্দিতেই বক্তৃতা

করিতে হইল। তাঁহার সেই প্রচারবিবরণ অঘোর-প্রকাশ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সেই পুস্তকের গুটিকয়েক কথা এখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—"তুমি (অঘোরকামিনী) বক্তৃতা দিলে, ভাই বলদেও নারায়ণও কিছু বলিলেন। তোমার বক্তৃতা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে। কিন্তু ভাবে ভরা; চক্ষের জল পড়িতেছিল। আমি দূর হইতে দেখিতেছিলাম, দেবী কিরূপে * * মানুষের জন্য ক্রন্দন করিতে পারেন।"

দেবী অঘোরকামিনীর ইহলোক হইতে প্রস্থানের দিন ক্রমশঃই নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। সকলেই মনে করিতেছিলেন, তাঁহার পক্ষে বিশ্রামই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু স্বর্গের জননী বোধ হয় মনে করিলেন, কন্যাকে পৃথিবীর কর্ম্মক্ষেত্র হইতে নিজের ক্রোড়ে ডাকিয়া না লইলে, তাঁহার আর বিশ্রামের সম্ভাবনা নাই। সেজন্য জগন্মাতা কন্যাকে পরলোকের দিকেই আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। মাতৃবৎসলা কন্যা সেই আকর্ষণ অনুভব করিয়াই আপনার ডায়েরিতে লিখিলেন—

"মনে হইতেছে আমার এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। আজকার প্রার্থনা ছিল, আর এ দেশের কিছু ভাল লাগিতেছে না। ঐ দেশে যাইতে হইবে, ঐখানকার জন্য মন ব্যস্ত হইয়াছে, ঐ দেশের আচার ব্যবহার, ঐ দেশের সকল আজ হইতে আমাকে শেখাও। এ দেশের মায়া কাট, ঐ দেশের মায়া বাড়াও, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।"

এইটুকু লেখার অল্প কয়েকদিন পরেই অর্থাৎ ১৮৯৬ সালের ২৭শে মে ভয়ঙ্কর ব্যাধি তাঁহাকে আক্রমণ করিল। ৩রা জুন তাঁহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিল। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"রিউ-ম্যাটিজ্‌ম্ অব দি হার্ট।" চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতে রোগের উপশম হইল না।

১৩ই জুন দেবী অঘোরকামিনী পুত্র সুবোধকে বলিলেন—"মায়ের কাছে যাইব, আর দেরি করিতে পারিতেছি না। সুবোধ, অসত্য-পথে যেও না। তোমাদের জন্য কিছু রেখে গেলাম না; এই সত্য নিও। আমার জন্য কেঁদ না। দেখ আমি কাঁদিতেছি না। সে দিন চোখে জল এসেছিল বলে এ কয়দিন দেরি হল।"

অবশেষে ১৫ই জুন আসিয়া উপস্থিত হইল। সেইদিনই বরণীয়া নারীর মহাযাত্রার দিন। সে দিন তিনি বড় মেয়ে সুসারকে ডাকিয়া আপনার সেবার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন। কন্যা জননীর চরণে মস্তক নত করিয়া তাঁহার কার্য্য হাত পাতিয়া গ্রহণ করিলেন। বেলা সাতটার সময়ে বন্ধু ও আত্মীয়গণ দেবীর শয্যার পাশে সমবেত হইলেন। উপাসনা আরম্ভ হইল। দেবী অঘোরকামিনী প্রার্থনা করিলেন—

"যেন বিশ্বাসের শেষ পরিচয় দিয়া যাইতে পারি।"

ইহাই দেবীর শেষ প্রার্থনা। বেলা দুইটা বার মিনিটের সময় লোকমাতা ব্রহ্মময়ী স্নেহে পূর্ণ হইয়া প্রিয় কন্যার জন্য প্রেমক্রোড় প্রসারিত করিয়া দিলেন; কন্যা দেহের গণ্ডী হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জননীর কোলে চিরদিনের জন্য বিশ্রামলাভ করিলেন।

দেবী অঘোরকামিনীর তিন পুত্র ও দুই কন্যা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহার বড় ছেলে শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র রায় কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার। মেজ ছেলে শ্রীযুক্ত সাধনচন্দ্র রায় বিলাতে সুশিক্ষা লাভ করিয়া কলিকাতায় আসিয়া কার্য্য করিতেছেন। ছোট ছেলে শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায় এম, ডি, কলিকাতার খ্যাতনামা ডাক্তার।

দেবী অঘোরকামিনীর মৃত্যুর পরে, শোক প্রকাশ করিবার জন্য বাঁকিপুরের সকল শ্রেণীর লোক মিলিত হইয়া একটি সভা করিয়া-

ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের নেতৃস্থানীয় মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুপ্রসাদ সেন এম-এ-বি-এল, মহাশয়কে সভাপতিপদে বরণ করা হইয়াছিল। তাঁহার ইংরাজি বক্তৃতার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই—

"বহু শতাব্দী পরে এই প্রকারের সভা এই প্রথম হইল; একটি মহিলার স্মৃতিরক্ষার জন্য আমরা এই সভায় মিলিত হইয়াছি। মিসেস্ রায়ের বিষয়ে বলিতে হইলে বলিতে হয়, তাঁহার জীবনের প্রভাব বিস্তৃতস্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। * * যে বালিকা বিদ্যালয়ে আমরা মিলিত হইয়াছি, তাহা অনেকদিন হইতেই ছিল, কিন্তু মিসেস্ রায় ইহাকে নবজীবন দান করিতে আসিয়াছিলেন। * * তিনি নিজের গৃহে নিজের ব্যয়ে একটি বোর্ডিং স্থাপন করিয়াছিলেন। বোর্ডিংয়ের বালিকাগণ তাঁহাকে মাতা বলিয়া মনে করিত। এই বোর্ডিংয়ের জন্য তাঁহার পারিবারিক আয়ের অধিকাংশ ব্যয় করিতেন। তাঁহার এইরূপ মানবপ্রীতি স্মরণ রাখিবার যোগ্য। তিনি তাঁহার প্রতিবেশীগণের নিকট দেবীর ন্যায় ছিলেন। তিনি যে শুধু ব্রাহ্মদিগের মধ্যেই কাজ করিতেন, তাহা নহে; হিন্দুদিগের ভিতরেও কার্য্য করিতেন।"

ডাক্তার জে, এন, ঘোষের বক্তৃতার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এই—

"তাঁহার অন্তঃকরণ আধ্যাত্মিকভাবে পূর্ণ ছিল। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বরের শক্তিতে চালিত হইতেন। বালিকাদিগকে সুখী করা ও ঈশ্বরের ভাবে হৃদয় পূর্ণ করাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কার্য্য ছিল। হিন্দু, ব্রাহ্ম, মুসলমান এ বিচার তাঁহার ছিল না। তিনি সকলের সেবার জন্যই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার সম্মুখে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলেই উহার মীমাংসার জন্য ঈশ্বরের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেন। এই জন্যই তিনি তাঁহার সকল কার্য্যে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন।"

ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কব

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাতৃভক্তি, শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চ্চা

কুমারী কব ১৮২২ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর ডবলিন সহরে জন্মগ্রহণ করেন। আয়র্লণ্ডের অন্তর্গত নিউব্রিজ তাঁহার পিত্রালয়। কুমারী কবের পিতা চার্লস কব খুব সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। তাঁহার অর্থের কোনরূপ অভাব ছিল না। তিনি শুধুই ভারতবর্ষ দেখিবার জন্য মান্দ্রাজে আগমন করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বিলাত গমন করিয়া বিবাহ করেন। কুমারী কবের মাতার নাম ফ্রান্সিস্ কণওয়ে। তাঁহার মুখখানি বড়ই সুন্দর ছিল। কুমারী কব এই পৃথিবীর মধ্যে মাতাকে যেমন ভালবাসিতেন, এমন আর কাহাকেও নহে। মাতার প্রতি তাঁহার যে ভক্তি ছিল, তাহা স্মরণ করিলেও অন্তরে পুলকের সঞ্চার হয়। কুমারী কব স্বয়ং আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—

"আমার মাতার নানারূপ সদগুণের জন্যই তাঁহার শক্তি আমার জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমি বলিতে পারি, সেই নিরুপম মাতৃমূর্ত্তি দর্শনেই সর্ব্বপ্রথমে আমার সৌন্দর্য্যানুভূতি হইয়াছিল। তাই এক এক সময় মাতার মুখের পানে চাহিয়া বলিতাম—মা, তুমি এত সুন্দর! আমার এই কথা শুনিয়া মা হাসিতেন এবং স্নেহের আবেগে আমার মুখচুম্বন করিয়া বলিতেন— "প্রিয় কন্যা, তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস। তোমার ভালবাসা পাইয়া আমি বড়ই সুখী।" আমি একটি স্থানে দাঁড়াইয়া

অনিমেষনয়নে মাতৃমূর্ত্তি দর্শন করিতাম। সেই মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে অসীম সুন্দরের অনুপম মাধুর্য্যের কথা আমার মনে জাগ্রত হইত। ঈশ্বর যে সুন্দর, তাহা জননীর রমণীয় মুখশ্রী দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

কুমারী কবের বয়স যখন একটু বেশি হইল, তখন তিনি স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। তাঁহাকে বোর্ডিংয়েই বাস করিতে হইত। তখনো সে দেশে স্কুল ও বোর্ডিংয়ের অবস্থা খুব ভাল হয় নাই। এজন্য কুমারী কব বোর্ডিংএ থাকিয়া এবং স্কুলে পড়িয়া সুখী হইতে পারেন নাই। তিনি ১৮৩৮ সালে স্কুল-বোর্ডিং ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তখন তাঁহার বয়স ষোল বৎসর। বালিকা গৃহে বাস করিয়া গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ইতিহাস এবং প্লেটোর দর্শন পড়িবার জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। এই সময়ে গৃহকার্য্যের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তেই অর্পিত হইল। বালিকার সুখের আর সীমা রহিল না। এখন তাঁহার মাতা বিশ্রাম করিতে পারিবেন, তাঁহার জনকজননীর ও ভাইদের সেবা করিবার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইল;—ইহার চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? কুমারী কবের গৃহকার্য্য বড়ই ভাল লাগিত। তিনি আপনার মার্জ্জিতবুদ্ধি ও স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সাহায্যে সুচারু-রূপে গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল। গৃহের প্রত্যেকটি সামগ্রী যথাস্থানে এমন সুন্দররূপে সাজাইয়া রাখিতেন যে, লোকেরা তাহা দেখিয়া সুখী হইত ও তৃপ্তিলাভ করিত। তাঁহাদের গৃহে অতিথিদিগের সমাগম হইত। তিনি তাঁহাদিগের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য পরিশ্রম করিতে ক্লান্তিবোধ করিতেন না।

কুমারী কব লিখিয়াছেন—"আমার ধর্ম্মের প্রথম শিক্ষা পিতামাতার নিকটে। বেশ মনে আছে যে, মাতার সঙ্গে প্রার্থনা করিতাম। পিতার কাছে ধর্ম্মসঙ্গীত আবৃত্তি করিতাম। রবিবার দিন আমাদের বাড়ীতে ধর্ম্মপুস্তক ছাড়া কাহাকেও অন্য কোন রকম বই পড়িতে দেওয়া হইত না। প্রত্যহ সকাল বেলায় আমাদের বাড়ীর লাইব্রেরী-গৃহে উপাসনা হইত। উপাসনান্তে ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ। তাহার পরে ধর্ম্মসম্বন্ধেই কথোপকথন হইত।

কুমারী কবের যে স্নেহময়ী মাতা আপনার চরিত্রসৌন্দর্য্যে ও হৃদয়মাধুর্য্যে গৃহখানি মধুময় করিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি আর অধিক দিন এই পৃথিবীতে বাস করিতে পারিলেন না; তাঁহার করুণাময় প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছেই ডাকিয়া লইলেন। মাতার মৃত্যুতে কন্যার হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিল। তিনি অতি কষ্টে শোক সংবরণ করিলেন।

কুমারী কবের পিতৃগৃহে একটি বড় লাইব্রেরী ছিল। উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলি তাঁহার মনের উপর মায়া বিস্তার করিয়াছিল। তিনি সর্ব্বাগ্রে নক্ষত্রসম্বন্ধীয় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ পড়িতে আরম্ভ করেন। উহা তাঁহার বড়ই ভাল লাগিত। তৎসঙ্গে তিনি কাব্যালোচনায় প্রবৃত্ত হন। চিন্তাশীল কবি শেলীর রহস্যময় কবিতাগুলিই তাঁহার হৃদয়কে আকৃষ্ট করিত এবং কেমন এক স্বপ্নরাজ্যে লইয়া যাইত, তিনি তাঁহার কবিতাগুলিই পড়িতে খুব ভালবাসিতেন। কবি ব্রাউনিং ও মিসেস্ ব্রাউনিংয়ের সঙ্গেও তাঁহার কাব্যালোচনা হইত। কুমারী কব স্বয়ং কবিতা ও ছোট গল্প লিখিতেন। কিন্তু সাহিত্যের হিসাবে তাহার মূল্য যে বড় বেশী, তা নয়। তিনি গদ্য রচনা লিখিয়াই যশস্বিনী হইয়াছিলেন।

আমরা অগ্রেই লিখিয়াছি, কুমারী কব স্কুল ত্যাগ করিয়া গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে ও ইতিহাস পড়িতে আরম্ভ করেন। গভীর মনোনিবেশপূর্ব্বক চারি বৎসর তিনি ইতিহাস পাঠ করিয়াছিলেন; তাহার পরে, পৃথিবীর বড় বড় লেখকদিগের যত রকম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার সংগ্রহ করিবার সুবিধা হইয়াছিল, সবই তিনি পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন, এই সময়েই বিশেষভাবে তাঁহার সাহিত্যচর্চ্চা আরম্ভ হইল। তিনি বড় বড় সভা সমিতিতে যোগ দিতেন। বড় বড় পণ্ডিত ও ধার্ম্মিক লোকের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইত। তিনি ইংলণ্ড ও এমেরিকার প্রসিদ্ধ দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রে রচনা লিখিতেন। ইহাতে তাঁহার বেশ অর্থ লাভ হইত। তিনি "একো" ও "ষ্ট্যাণ্ডার্ড" পত্রের একজন সম্পাদিকা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুমারী কব ইংলণ্ডে বাস করিবার সময়ে মহাত্মা থিওডোর পার্কারের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়। তিনি উহার সম্পাদন কার্য্য অতি উত্তমরূপে সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বরচিত কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদুষী নারী আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—"আমার সাহিত্য-জীবন আলোচনা করিয়া দেখি, আমি একজন প্রবন্ধ-লেখিকা। আমি দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ছিল সত্য প্রচার; তাহার লক্ষ্য ছিল—ধর্ম্মভাবে লোকের মনকে উদ্বুদ্ধ করা।"

কুমারী কব মেয়েদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য একখানি খুব ভাল বই লিখিয়াছিলেন। বইখানি পাঠ করিয়া মেয়েদের যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। তিনি ১৮৮১ সালে "নারীর কর্ত্তব্য" বিষয়ে কতকগুলি বক্তৃতা করিয়া-

ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মনীষী জনষ্টুয়ার্ট মিল এই বিদুষী নারীকে সাহিত্য বিষয়ে পত্রাদি লিখিতেন। তাঁহার ১৮৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারীর একখানি ছোট চিঠির মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি :—

"প্রিয় মিস্ কব, আমি এমেরিকার পুটনামের নিকট হইতে একখানা চিঠি পাইয়াছি। তিনি তাঁহাদের মাসিকপত্রে আমাকে লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। 'মেয়েদের বর্ত্তমান অবস্থা ও তাহার উন্নতি' বিষয়ে আপনি যদি ঐ কাগজে কিছু লিখেন, * * তাহা হইলে আমি এই কথা ভাবিয়াই অত্যন্ত সুখী হইব যে, আপনি আমারই অনুরোধে ইংলণ্ডের মেয়েদের অবস্থা এমেরিকার লোককে জানাইয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মজীবন

কুমারী কব তাঁহার প্রথমজীবন-সম্বন্ধে আত্মচরিতে লিখিয়াছেন— "আমি প্রকৃতির মধ্যে সুনির্ম্মল নৈতিক ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। ঈশ্বর সর্ব্বদর্শী ও বিচারক, আমার মন সর্ব্বদাই উহা অনুভব করিত। ঈশ্বর আমার নিভৃত মর্ম্মস্থানটি পর্য্যন্ত দেখিতেছেন;— এই বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করিয়াই আমি চলিতাম ও সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতাম। ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতায় মস্তক অবনত করা, আমার প্রকৃতির একটি বিশেষ ভাব ছিল। ঈশ্বর আমাকে অজস্র দয়া করিতেছেন, ইহাই আমার মনে হইত এবং অন্তরের কৃতজ্ঞতা ঈশ্বরের পানেই ছুটিয়া যাইত। আমি উচ্চ কণ্ঠেই এ কথা বলিতে পারি যে, যখন ছোট মেয়ে ছিলাম, তখন হইতেই ঈশ্বরকে অত্যন্ত ভাল-

বাসিতাম। * * আমি প্রাণে আনন্দ লাভ করিতাম, সেই জন্যই ঈশ্বরকে ডাকিতাম। আমার মনের মধ্যে কিরূপ আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত? মানুষ আপনার ভালবাসার পাত্রটির সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহার চিত্তে যেরূপ পুলকের সঞ্চার হয়, ঈশ্বরের কাছে উপনীত হইলে, আমার প্রাণেও সেইরূপ আনন্দের উদয় হইত। আমার মনে হইত, যেন একটা রহস্যপূর্ণ নূতন জীবন আমার মধ্যেই রহিয়াছে। আমার মনের ভাব মা অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।"

কুমারী কবের সর্ব্বপ্রথমে যে ঈশ্বরানুভূতি হইয়াছিল, সে বিষয়ে তিনি লিখিয়াছেন—"মাতার জন্মদিনে আমি উদ্যানে পুষ্প চয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তখন চতুর্দ্দিকে চমৎকার দৃশ্য। মনে হইল, যেন প্রত্যেকটি পদার্থ ঈশ্বরের আবির্ভাবে পরিপূর্ণ এবং আমার জীবনে আনন্দ—শুধুই আনন্দ! এই অনুভূতির জন্য আমি ঈশ্বরকে কতই ত ধন্যবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু বহুবার ধন্যবাদ করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি নাই।"

কুমারী কবের পিতা গোঁড়া খ্রীষ্টান। প্রথম জীবনে কবেরও প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু বিদুষী নারী সতের বৎসর বয়সের সময়ে পুরাতন ধর্ম্মের প্রতি আর পূর্ণ বিশ্বাস রক্ষা করিতে পারিলেন না। দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের গভীর তত্ত্ব আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মন নিরাকার অনন্তস্বরূপ, প্রেমময় ও মুক্তিদাতা ঈশ্বরের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল; প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্ম্মের অনেকগুলি মতসম্বন্ধেই তাঁহার অন্তরে সংশয় উৎপন্ন হইল। নদীর তীর যখন ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়, তখন কিছুতেই সেই ভাঙ্গার যেন আর শেষ হয় না। তেমনি মানুষের বিশ্বাসও যখন ভাঙ্গিতে থাকে, তখন কোথায় গিয়া যে তাহার শেষ হইবে, কিছুই বলা যায় না।

কুমারী কবের ধর্ম্মবিশ্বাস ভাঙ্গিতে লাগিল। ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে তাঁহার পরকালে সংশয় জন্মিল; ঈশ্বরের বাণী যে শুনা যায়, তাঁহাকে যে প্রাপ্ত হওয়া যায়—এই সকল বিষয়েও তাঁহার মনে সংশয় উৎপন্ন হইল। তিনি অজ্ঞেয়বাদী হইয়া পড়িলেন।

কুমারী কবের তরুণ বয়সে ভক্তির একটি সরল ও স্বাভাবিক ভাব তাঁহার মনোমধ্যে যদি বিকশিত না হইত, তিনি যদি ঈশ্বরের সৌন্দর্য্যের ও মাধুর্য্যের এবং উপাসনার মধুরতার স্বাদ না পাইতেন, তবে তিনি পৃথিবীর শত সহস্র নাস্তিকের মত আপনার পাণ্ডিত্যের নেশায় বিভোর হইয়া আনন্দে দিন যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রাণে আনন্দ কোথায়? শান্তি কোথায়? প্রথমজীবনের সুমধুর স্মৃতিই তাঁহাকে সুস্থির থাকিতে দিল না। এই বিপুল বিশ্বে একজন জ্ঞান, প্রেম ও শক্তিসম্পন্ন মহান্ পুরুষ বিরাজিত রহিয়াছেন; আমাদের পিতা, প্রভু, রাজা ও বন্ধু হইয়াই রহিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলহস্তেই এই জীবনের ভার। তিনিই আমাদের ভালবাসেন, আমাদের কল্যাণ চিন্তা করেন; আমাদের উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া তিনিই আমাদিগকে অনন্ত উন্নতির পথে লইয়া যাইতেছেন;—এই বিশ্বাসে মানুষের প্রাণে কি আনন্দ! কি শান্তি! হায়, এ সংসারে যে এই বিশ্বাস হইতে বঞ্চিত হয়, তাহার মত হতভাগ্য আর কে? কুমারী কব এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়া অন্তরে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাণের মধ্যে ঘোর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। অবশেষে তাঁহার বিংশবর্ষীয় জন্মদিনে এই সংগ্রামের অবসান হইল। স্বয়ং ঈশ্বরই কুমারী কবের সরলতা, ব্যাকুলতা ও সত্যানুরাগ দর্শন করিয়া, তাঁহার অন্তরে দিব্যালোক উদ্ভাসিত করিয়া তুলিলেন; ধর্ম্মশীলা নারীর হৃদয়ে বিশ্বাস ও ভক্তি বিকশিত হইয়া উঠিল। তিনি ব্রহ্মবাদিনী হইলেন; আপনাকে

একেশ্বরবাদীদিগের দলভুক্ত বলিয়া পরিচয় দিতেই তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। কুমারী কবের আত্মচরিতে এ বিষয়ে বিস্তর বর্ণনা আছে। বর্ণনাগুলি চিত্তাকর্ষক। উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই—

"আমার অবস্থা বর্ত্তমান সময়ের অজ্ঞেয়বাদীদিগের মতই হইয়াছিল। যখন ঐরূপ মনের ভাব, তখন একদিন আমাদের উদ্যানের একটি জায়গায় বেড়াইতেছিলাম। জায়গাটি বড়ই নির্জ্জন। সেখানে একটি কৃত্রিম পাহাড় ছিল। আমি তাহার পার্শ্বেই বসিয়াছিলাম। তখন মে মাস। গ্রীষ্মকাল। কি চমৎকার দিন! সূর্য্যের স্বর্ণালোক চারিদিকে বিচিত্র সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিয়াছে। তরুবৃন্তে প্রস্ফুটিত পুষ্পরাশি শোভা পাইতেছে। কুসুমের সুগন্ধে প্রাণ বিমোহিত হইয়া যাইতেছে। আমি এইমাত্র আমার প্রিয় কবি শেলীর কবিতা পড়িয়া উদ্যানে প্রবেশ করিয়াছি। সুগভীর ভাবে আমার হৃদয় যেন আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, আমার জীবনটা শূন্য ও অসার হইয়া গিয়াছে। উপাসনাতেও মন বসে না, ঈশ্বরের কথাও ভাল লাগে না; আমি কি করিব? আমার উপায় কি হইবে?

"এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলাম, তখন আপনাকেই প্রশ্ন করিলাম, আমি কি জাগ্রত হইতে পারি না? যাহা ন্যায় ও সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তদনুসারেই কি জীবন যাপন করিতে পারি না? যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে তিনি আমার সেই সুগঠিত জীবনকে গ্রহণ করিবেন—নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। আমি একটি সংকল্প গ্রহণ করিয়া, গৃহে গমন করিলাম। কি আশ্চর্য্য! কয়েকদিনের মধ্যেই আমার অন্তর হইতে প্রার্থনা উত্থিত হইল। আমি ঈশ্বরকে আমার বিবেকের প্রভু বলিয়া ডাকিতে লাগিলাম এবং তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম—তুমি আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমাকে

শক্তি দান কর। আমার সংকল্পের সহায় হও। তুমি আমার জীবনকে অসত্য হইতে মুক্ত করিয়া এরূপ স্থানে লইয়া যাও, যেখান হইতে কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে পারি।

"ঈশ্বরের আশ্চর্য্য করুণা! আমি জীবনের ঝড়ঝঞ্ঝা সমস্তই অতিক্রম করিলাম। ধীরে ধীরে একেশ্বরবাদের দিকেই অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমার জীবনপথে অনেকবার নৈতিক সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মবিদ্রোহ আর কখনই উপস্থিত হয় নাই—কখনই সংশয় আমার হৃদয়কে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই।

"আমি সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরকে মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিলাম। তাহার পরে বুঝিতে পারিলাম, তিনি প্রেমস্বরূপ। আমার এক এক দিন মনে হইত, জ্ঞানের চেয়ে প্রেম শ্রেষ্ঠ। উহা ভাবিতে ভাবিতে প্রেমে অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত। আমি হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিতাম। তখন মনে হইত, কিরূপে এই অন্তরের প্রেম বাহিরে প্রকাশ করিব? একদিন ভোরবেলায় একটি লোক আসিয়া বলিল, আমাদের ধোপার মুমূর্ষু অবস্থা। তৎক্ষণাৎ ধোপার গৃহাভিমুখে ছুটিয়া চলিলাম। তাহার সেবা করিয়া হৃদয়ের প্রেম চরিতার্থ করিব—উহাই আমার উদ্দেশ্য। মানুষটি জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে আমাকে একটি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিল। আমি তাহাই করিলাম।

"যে ধর্ম্মবিশ্বাসে আমার হৃদয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আমি সেই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিস্তর গ্রন্থ পাঠ করিলাম। আমি যতগুলি বই পড়িয়াছিলাম, তন্মধ্যে থিওডোর পার্কারের Discourse of Religion গ্রন্থখানিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ বইখানিই আমার জীবন পরিবর্ত্তনের পরম সহায়। উহা পাঠ করিয়া কতই যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আর কি বলিব? পার্কারের গ্রন্থ পড়িয়া উত্তমরূপেই বুঝিতে

পারিলাম, ঈশ্বর মঙ্গলময়, ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ স্বাভাবিক, তন্মধ্যে অলৌকিক ব্যাপার কিছুই নাই। এখন হইতে প্রকাশ্যভাবেই প্রচার করিতে লাগিলাম, আমি একেশ্বরবাদী।"

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপে পার্ব্বত্যনদীর জলধারাটি শুষ্ক হইয়া যায়, উহার বিশাল বক্ষ উত্তপ্ত বালুকারাশিতেই পূর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু গিরিপৃষ্ঠ হইতে যখন নব বর্ষার জলস্রোত নামিয়া আসে, তখন সেই নদী বারিরাশিতে পূর্ণ হয়, আবার তাহার সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে, তাহার বক্ষে তরঙ্গ উত্থিত হয়, তাহার স্রোতের উপর দিয়া কত তরণী চলিয়া যায়। অবিশ্বাসের প্রখর উত্তাপে কুমারী কবের জীবননদী একেবারেই শুষ্ক হইয়াছিল, তন্মধ্যে অশান্তির বালুকারাশিই ধূ ধূ করিত। কিন্তু এখন সেই জীবনতরঙ্গিণীতে স্বর্গ হইতে বিশ্বাসের স্রোত নামিয়া আসিয়াছে। সেখানে ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছে। সেই স্রোতস্বিনী প্রেমের শোভায় সুশোভিত হইয়াছে। কুমারী কব অনেক সংগ্রামের পরে, এখন তিনি ঈশ্বরের নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে সত্য লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত, বিশ্বাস লাভ করিয়া কৃতার্থ; আর তাঁহার অশান্তি কোথায়?

ধর্ম্মশীলা নারীর ভিতরের সংগ্রাম থামিয়া গেল এবং উত্তপ্ত হৃদয় জুড়াইল বটে; কিন্তু এইবার তাঁহার বাহিরের সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তাঁহার পিতা জানিতে পারিলেন, কন্যার আর পূর্ব্বের মত ধর্ম্ম বিশ্বাস নাই; এখন তিনি ব্রহ্মবাদিনী। একমাত্র জ্ঞানময়, প্রেমময়, অনন্ত-স্বরূপ ঈশ্বরই তাঁহার উপাস্য দেবতা। তখন পিতার মনে যে ক্লেশ, তাহা কে বর্ণনা করিবে? তিনি কন্যার ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন। কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হইল। তখন তিনি কন্যাকে স্পষ্টই বলিলেন—"তুমি পিতার ধর্ম্মমতের প্রতি বিশ্বাস রক্ষা করিতে

পারিতেছ না, কাজেই পিতৃগৃহেও তোমার স্থান হইবে না। তুমি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাও।”

কুমারী কব পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া, তাঁহার মেজভায়ের কাছে গিয়া আশ্রয় লাভ করিলেন। তৎপরে তিনি এমেরিকার ধার্ম্মিকপুরুষ মহাত্মা থিওডোর পার্কারের নিকট একখানি পত্র লিখিলেন। পার্কার সেই পত্রের উত্তরে যাহা লিখিয়া পাঠাইলেন, তাহা অতি চমৎকার, তাহা প্রাণস্পর্শী, তাহা গভীর ধর্ম্মভাবে পরিপূর্ণ। সেই চিঠির সঙ্গে পার্কারের একটি সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশ কবের হস্তগত হইল। বিদুষী নারী সেই চিঠি ও উপদেশ পড়িয়া ধর্ম্মজীবনের একটি উচ্চতর সোপানে পদক্ষেপ করিলেন। পূর্ব্বাকাশের লোহিত বর্ণ অরুণচ্ছটার ন্যায়, সহসা একটি আলোক তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইল। তিনি সেই দিব্যালোকে সত্য দর্শন করিলেন। কুমারী কব পরিষ্কার বুঝিতে পারিলেন, মৃত্যুতে দেহই ধ্বংস হয়, আত্মা ধ্বংস হয় না; আত্মা অমর। আত্মার অনন্ত উন্নতি হইবেই।

কুমারী কব নয় কি দশ মাস ভায়ের গৃহেই বাস করিলেন। তাহার পরে কন্যার জন্য পিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি কন্যাকে গৃহে আহ্বান করিলেন। কুমারী কব পুনর্ব্বার পিতৃভবনে ফিরিয়া আসিলেন। এখন তাঁহাকেই গৃহের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইতে হইল। তিনি নিরন্তর পিতৃসেবা করিয়া তাঁহার মনোবেদনা দূর করিতে যত্নবতী হইলেন। কিন্তু কুমারী কব আপনার বিশ্বাস কিছুতেই ত্যাগ করিলেন না। তাঁহার অটল সত্যনিষ্ঠা; তাঁহার ইচ্ছা সম্পূর্ণরূপে বিবেকের অনুগত; যাহা মিথ্যা, যাহা বিবেকবিরুদ্ধ, যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী; পৃথিবী উল্টিয়া গেলেও তিনি তাহা করিতে চাহিলেন না;—নারীর এমনই দুর্জ্জয় সংকল্প! এই সংকল্প ছিল বলিয়া তিনি কোন দিনই সত্য হইতে

ভ্রষ্ট হন নাই, নৈতিক আদর্শ হইতে স্খলিত হন নাই ; অন্যায় ও অসত্যের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন নাই এবং লোকের মন যোগাইতে গিয়া আপনার বিবেক শিথিল হইতে দেন নাই। তাই এখনো তিনি পিতার মনস্তুষ্টির জন্য একটি মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চলিতে পারিলেন না, বিবেকের বিরুদ্ধে একটি কাজও করিলেন না'।

মনস্বিনী নারী দীর্ঘকাল ধর্ম্মের রত্নৈশ্বর্য্যপূর্ণ সুদৃঢ় অট্টালিকায় নিরাপদে বাস করিয়া, গভীর ঈশ্বরানুভূতির মধ্য দিয়া যে সকল সত্য লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট তাহা অমূল্য। ঐ সকল সত্য এই রচনাটির মধ্যে সংগ্রহ করিতে পারিলে, ইটি যে চিত্তাকর্ষক হইত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। দুঃখের কথা এই যে, আমরা তাহা পারিলাম না। আমরা শুধু কুমারী কবের দু-চারিটি কথার মর্ম্মানুবাদ লিপিবদ্ধ করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন—

"বিজ্ঞান এই পৃথিবীকে যতই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখুক না কেন, সে আমাদিগকে এমন কোন শক্তিই দিতে পারে না, যে শক্তির দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে খুঁজিয়া পাইতে পারি। আমরা যদি ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম ও পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে চাই, তবে ঈশ্বরের সঙ্গেই আমাদের আত্মার যোগস্থাপন করিতে হইবে। সেই যোগের অবস্থাতেই ঈশ্বরকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব।

"আমরা জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে যখন একবার বিশ্বাসের আলোক প্রাপ্ত হই, তখনই বিশ্বাসকে অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া মনে করি। ঐ অবস্থার মধ্য দিয়া বিশ্বাস লাভ করিতে না পারিলে, উহার মূল্য যে কত অধিক, তাহা বুঝিতেই পারিতাম না। মানুষের অন্তরে বিশ্বাস নিশ্চয়ই আসিবে—তা এখনই আসুক, কি কিছুদিন পরেই আসুক। ঈশ্বর বর্ত্তমান আছেন, ইহা যেমন সত্য,

আমাদের জীবনে বিশ্বাস আসিবেই আসিবে—উহা তেমনই সত্য। আবার এ কথাও সত্য যে, ঈশ্বর মানবাত্মাকে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া উন্নতির পথেই লইয়া যাইতেছেন। তিনি কি মানুষকে সংশয়, নাস্তিকতা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির মধ্যে ফেলিয়া রাখিতে পারেন? কখনই নয়। যখন সময় হইবে, তখন নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার বিধি অনুসারে মানুষের আত্মার নিকট নূতন নূতন ভাব প্রকাশ করিবেন। উহা কিরূপে প্রকাশ করিবেন? ঈশ্বর অতীত যুগের মহাপুরুষদিগের ভিতর দিয়া যেরূপভাবে আপনাকে প্রকাশ করিতেন, তিনি সেই ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা তিনি অন্য কোন প্রকারেও আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন;—যে প্রকাশ এখনো কেহ অনুভব করিতে পারে নাই। ঈশ্বরই আমাদের উপরে আছেন এবং স্বর্গ আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। ইউরোপের বৈজ্ঞানিকেরা জোর করিয়া বলিতেছেন বটে যে, পৃথিবী শুধু জড় পদার্থে পরিপূর্ণ। কিন্তু আমরাও উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারি, ঈশ্বর আছেন, স্বর্গও আছে। নাস্তিকতা শুধুই একটি রাত্রির জন্য আমাদের মনের উপর মায়া বিস্তার করিতে পারে। তাহার পরের দিন প্রভাতকালে বিশ্বাস হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিবেই করিবে। একেশ্বরবাদ জয়যুক্ত হইবেই। আমরা যে ভাবে একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছি, সকল কালে সেই ভাবেই যে উহা জয়যুক্ত হইবে, এমন কথা বলিতে পারি না। কিন্তু একজন ঈশ্বর আছেন, তিনি প্রেমস্বরূপ ও ন্যায়বান; মৃত্যুর পরেও জীবন আছে; এই যে সত্যের ভিত্তিতে সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাস দণ্ডায়মান;—এই সত্য চিরদিনই থাকিবে।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেবা ও শেষ জীবন

কুমারী কব দেশ ভ্রমণ করিয়া সুস্থ শরীর ও প্রসন্ন মন লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। এখন তাঁহার বয়স ৩৬ বৎসর। পিতা তাঁহাকে বাৎসরিক দুই শত পাউণ্ড আয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মশীলা নারীর সেই টাকায় বেশ সুখেই দিন কাটিয়া যায়। এখন আর তাঁহার সংসারে কোনই বন্ধন নাই। মাতার ত আগেই মৃত্যু হইয়াছে, কিছুদিন হইল পিতাও পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাই কুমারী কবের ঈশ্বর চিন্তায়, ধর্ম্মালোচনায় ও সাহিত্য চর্চ্চাতেই সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়। কিন্তু নারী কি উহাতেই জীবন সার্থক মনে করিতে পারেন? তাহা ত নয়। কুমারী কবের হৃদয়ের প্রেমই তাঁহাকে পরসেবার জন্য ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীর কোন মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিব। কিন্তু আমার যেরূপ ধর্ম্মবিশ্বাস, আমাকে ত অনেকেই পছন্দ করিবে না; আমি কোথায় যাইব? কি রকম কার্য্যে হস্তার্পণ করিব?

তাহার পরে কুমারী কব ইংলণ্ডে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে, সুশিক্ষিতা, সুলেখিকা, পরসেবাই তাঁহার ব্রত; তাই বিস্তর কৃতবিদ্য ও যশস্বী লোকের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা জন্মিল। বড় বড় কাগজে তাঁহার সুচিন্তিত ও চিত্তাকর্ষক রচনা মুদ্রিত হইতে লাগিল। তখন ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদিগের অবস্থা বড়ই খারাপ ছিল। তাহারা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিত, অথচ তাহাদের দুর্গতি কিছুতেই

দূর হইত না। হতভাগ্যদের স্বাস্থ্য ভাল নয়, চরিত্র ভাল নয়—সকল বিষয়েই তাহাদের ক্লেশ ও যন্ত্রণা। অনেক জায়গায় ছোট ছোট মেয়েরা পেটের দায়ে কাজ করিত; কিন্তু পরিশ্রম করিয়া যে পয়সা পাইত, তাহাতে তাহাদের পেট ভরিত না। বালিকারা দুঃখের পেষণে পড়িয়া বাধ্য হইয়াই চুরি করিত। এই সকল দুঃখী ও দরিদ্রদিগের জন্য কুমারী কবের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের ফলেই ১৮৬৮ সালের ৩১শে জুলাই পার্লিয়ামেণ্ট-সভায় শ্রমজীবীদিগের জন্য একটি আইন পাশ হইল। উহাতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হইয়াছিল।

কুমারী কব শৈশবকাল হইতেই ইতর প্রাণীদিগকে অতিশয় ভালবাসিতেন। তাহাদের প্রতি মানুষের যে নির্ম্মম ব্যবহার, তাহা তিনি সহিতেই পারিতেন না। এ বিষয়ে তাঁহার ছেলেবেলার একটি ঘটনার উল্লেখ করিব। কুমারী কব যখন বালিকা, তখন পুকুরের মাছ ধরিতেন। একদিন তিনি দেখিলেন, জলের ভিতর কতকগুলি সুন্দর মাছ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। এই দৃশ্য দর্শন করিয়াই তাঁহার মনে হইল, ঈশ্বর যাহাদের এমন সুখে রাখিয়াছেন, তাহাদের প্রতি কি নিষ্ঠুর ব্যবহার করা উচিত? সেই দিন হইতে কুমারী কব আর কখনই মাছ ধরেন নাই। তাহার পরে তিনি বড় হইয়া পশুদের ক্লেশ ও যন্ত্রণা দেখিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। মানুষ প্রতিদিন স্বার্থের জন্য, আমোদের জন্য, আহারের জন্য, পশুদের ত কষ্ট দিতেছেই। তাহার উপরে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের পশুদের প্রতি কি নির্দ্দয় ব্যবহার! উহা স্মরণ করিলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা রোগতত্ত্ব নির্ণয়ের জন্য, দ্রব্যগুণ আবিষ্কারের জন্য, জীবন্ত পশুদিগের শরীরে বিষাক্ত কীটাণু প্রবেশ করাইয়া দিতে ও তাহাদের অঙ্গচ্ছেদ করিতে একটুকু

সঙ্কোচ বোধ করেন না। উহাতে সেই সকল অসহায় পশুদের যে কি ভীষণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়, তাহা স্বচক্ষে দর্শন না করিলে বুঝিবারও সাধ্য নাই। কুমারী কব বৈজ্ঞানিকদিগের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পশুদিগের ক্লেশ নিবারণের জন্য ইংলণ্ডে ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট সোসাইটি স্থাপন করিলেন। এইটিকে পশুক্লেশনিবারণীসভাই বলিতে হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগের নিষ্ঠুরাচরণের প্রতিবাদ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। তাহা ছাড়া এই সভা পশুদিগের সর্ব্বপ্রকার কেশ নিবারণের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনেক বড় বড় লোক এই সভার কার্য্যে যোগদান করিলেন। এই সভার জন্য কুমারী কবকে বিস্তর লোকের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। তিনি যখন দেখিলেন, এই সভার দ্বারা যথার্থ ই পশুদিগের ক্লেশ নিবারণ হইবার সম্ভাবনা; তখন তিনি উহার কার্য্যে প্রাণমন ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের কথা স্মরণ করিলে মনে হয়, কুমারী নারীর হৃদয়ের প্রেম যেন এই কার্য্যেই অর্পিত হইয়াছিল। তিনি আত্মচরিতে পরিষ্কার ভাষায় লিখিয়াছেন, পশুক্লেশনিবারণী সভার জন্য দুরন্ত পরিশ্রম করাতেই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এ কার্য্যে তিনি অনেক বড় বড় লোকের সহানুভূতি পাইয়াছিলেন।

কুমারী কবের আর একটি বড় কাজ, সর্ব্বশ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির চেষ্টা। তিনি যখন তরুণী নারী, তখনো ইংলণ্ডের সকল শ্রেণীর রমণীদিগের দুর্গতি দূর হয় নাই। কত স্ত্রীলোক সমস্ত জীবন নির্দ্দয় ও স্বার্থপর পুরুষের অত্যাচার সহ্য করিয়া, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে এই পৃথিবীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেন। কিন্তু কুমারী কব এই দৃশ্য আর দেখিতে পারিলেন না। নারীর সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগেরই

দুঃখ যাহাতে দূর হয়, তাঁহারা যাহাতে স্বাধীনতা ও উচ্চাধিকার প্রাপ্ত হন, সেজন্য কুমারী কব অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পরিশ্রম ও চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কোন কোন বিষয়ে কর্ম্মিষ্ঠা নারীর পরিশ্রম সার্থক হইল। তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিনীদের চেষ্টাতেই পার্লিয়ামেণ্ট হইতে একটি আইন পাশ হইল। উহাতে দুঃখিনী নারীদিগের দুঃখ কিয়ৎপরিমাণে দূর হইল। অৰ্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত অথবা ভদ্রনামধারী শিথিলবিবেক সুরামত্ত পুরুষেরা যে পত্নীদিগকে প্রহার করিবেন কিম্বা তাঁহাদের প্রতি অন্য কোনরূপ গুরুতর অত্যাচার করিবেন, সে পথ অনেকটা বন্ধ হইয়া গেল।

মেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় পাশ হন, অথচ উপাধি পান না। এই অন্যায় নিয়ম যাহাতে রহিত হয়, সেজন্য কুমারী কব বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকালের লণ্ডন ইউনিভারসিটির প্রেসিডেণ্ট লর্ড গ্রাণ্ডভিল তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন, এরূপ আশাও দিয়াছিলেন। পরহিতব্রতধারিণী তাঁহার ৭০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিন্দু বিন্দু করিয়া শরীরের রক্ত ক্ষয় করিয়া নরনারীর কল্যাণসাধন করিয়াছিলেন।

কুমারী কবের সেবার কাহিনী সংক্ষেপে কিছু বর্ণনা করা গেল। এখন তাঁহার দুই চারিটি পরিচিত লোকের বিষয়ে দুই একটি কথা বলিব।

এমেরিকার মহাত্মা থিওডোর পার্কারের প্রতি, কুমারী কবের অগাধ ভক্তি ছিল। ভক্তি থাকিবারই কথা। একেই ত তিনি সাধুপুরুষ; তাহা ছাড়া কুমারী কব তাঁহার গ্রন্থ পড়িয়া ধর্ম্মবিষয়ে যথেষ্ট আলোক লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬০ সালে এই সাধুপুরুষ রুগ্নাবস্থায় ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে বাস করিতেছিলেন। তখন কুমারী কব উক্ত সহরে

গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অনেক দিনের মনোভিলাষ পূর্ণ হইল। তিনি পার্কারকে দর্শন করিয়া জীবন সার্থক মনে করিলেন। কুমারী কব তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—

"জীবনে এই প্রথম পার্কারের সঙ্গে আমার দেখা হইল। তিনি বিছানায় শয়ন করিয়াছিলেন। মিসেস্ পার্কার আমাকে তাঁহার কাছে লইয়া গেলেন। পার্কারের কাছে যাইতেই, তিনি আগ্রহের সহিত আমার একখানি হস্ত ধারণ করিলেন। তখন তাঁহার মুমূর্ষু অবস্থা। তিনি মৃদু ও কোমলস্বরে কহিলেন—মিস্ কব, কত দিনের পরে আজ আশ্চর্য্যভাবে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হইল। পার্কারের মুখে একটি হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন—আমি মরিব, তাহাতে ভয় কি? কিন্তু সম্মুখে বিস্তর কাজ। তাহা ফেলিয়া যাইতেই ক্লেশ হয়। আমি বলিলাম, পূরাকালের সাধুরা যেরূপ ঈশ্বরের কার্য্যে জীবন অর্পণ করিতেন, আপনি ত ঠিক্ তেম্‌নি করিয়াই ঈশ্বরের সেবা ও সত্য প্রচারের জন্য শরীর ক্ষয় করিয়াছেন।

"পার্কার তাঁহার পত্নীকে বলিয়াছিলেন, আমি পুনঃ পুনঃ মিস্ কবের সঙ্গে দেখা করিব না। তাঁহাকে দেখিলেই আমার অন্তরে ভাবের তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। কিন্তু তুমি প্রত্যহ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবে। এই পৃথিবীতে মিস্ কবের মত একটি রমণী আছেন, তিনিই মিস্ কব।

ব্রহ্মবাদিনী কুমারী কবের মত ও বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মেরই অনুরূপ। ব্রাহ্মসমাজের মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন, মনস্বী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি যে সকল ধার্ম্মিক ব্যক্তি বিলাত গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের সঙ্গেই কুমারী কবের আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁহার গভীর ভক্তি ছিল।

ধর্ম্মে, কর্ম্মে ও জ্ঞানে ব্রহ্মবাদিনীর জীবন ধন্য হইয়াছিল, সেই জন্য বিস্তর লোক তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মানুষের কিরূপ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সে কথা পরিস্ফুট করিবার জন্য একটি অভিনন্দন পত্রের মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিব। কুমারী-কব যখন অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা, তখন ইংলণ্ডের ও এমেরিকার ইউনিটেরিয়ান সভার সভ্যগণ এবং তাঁহার বন্ধুগণ ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া তাঁহাকে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ এই :—

"আপনার এই আশী বৎসরের জন্মদিন। পরহিতই আপনার জীবনের ব্রত ছিল। আপনি অতি পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। এই জন্যই প্রাণের গভীর ভক্তির সহিত আমরা আপনাকে এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছি। মহিলাগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারা যাহাতে পুরুষদিগের সমান অধিকার পান, সেজন্য আপনিই সকলের অগ্রণী হইয়া চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রমজীবীদিগের উন্নতির জন্য আপনারই শক্তি ক্ষয় হইয়াছে। আপনিই তাহাদের জন্য নৈশবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আপনি আপনার ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধীয় পুস্তকের দ্বারা লোকের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের তত্ত্ববিদ্যার উন্নতির দ্বারাও আপনি লোকের কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পশুপক্ষীদিগের সম্বন্ধে আমাদের যে সকল অন্যায় ধারণা ছিল, তাহাও আপনি দূর করিয়াছেন। আমরা যে আজ আপনার প্রতি এই ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহা আপনার হৃদয়কে একটুকু সান্ত্বনা দান করিবে।"

কুমারী কব ১৯০৪ সালের ৫ই এপ্রিল পরলোকযাত্রা করিলেন। তাঁহার আত্মা প্রেমময় ঈশ্বরের কাছেই চলিয়া গেল। আমরা এ স্থানে

শুধু তাঁহার আত্মচরিতের ভূমিকা হইতে গুটিকয়েক কথা উদ্ধৃত করিয়াই রচনাটি সমাপ্ত করিব।

"Whether my readers will think at the end of these volumes that such a life as mine was worth recording I cannot foretell; but that it has been a 'Life worth Living' I distinctly affirm; so well worth it, that, though I entirely believe in a higher existence hereafter, both for myself and for those whose less happy lives on earth entitle them far more to expect it from eternal love and justice,—I would gladly accept the permission to run my earthly race once more from beginning to end, taking sunshine and shade just as they have flickered over the long vista of my seventy years. Even the retrospect of my life in these volumes has been a pleasure; a chewing of the end of memories, —mostly sweet none very bitter,—while I lie still a little while in the sunshine, ere the soon-closing night."

ভাবার্থ—পাঠকেরা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া, আমার জীবনবৃত্তান্ত যে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিবেন, এরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারি না। কিন্তু এ কথা আমি জোরের সহিতই বলিতে পারি, আমার এ জীবন সুখের। আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি, ইহার পরে যে জীবন আসিতেছে, তাহা উচ্চতর। সে জীবন যেমন আমারই জন্য, তেমনি সকলেরই জন্য। যাহাদের পার্থিব জীবন তত সুখের নহে; তাহারাও অনন্ত প্রেমের আধার ও ন্যায়বান ঈশ্বরের নিকট সেই

জীবন পাইবার অধিকারী। তবুও আমার জীবন এমনই মূল্যবান, যদি আমি অনুমতি পাইতাম, তবে আমার এই যে পৃথিবীর জীবন— যাহা ৭০ বৎসব পর্য্যন্ত আলো ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে; আবার প্রভাত হইতে শেষ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আনন্দের সহিত সেই জীবনের ভিতর দিয়া চলিতে পারিতাম। এমন কি, আমি এই গ্রন্থ লিখিতে গিয়া যে অতীত জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি এবং আমার যে পূর্ব্বস্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিতেছে, তাহাও আমার পক্ষে আনন্দদায়ক।

সমাপ্ত